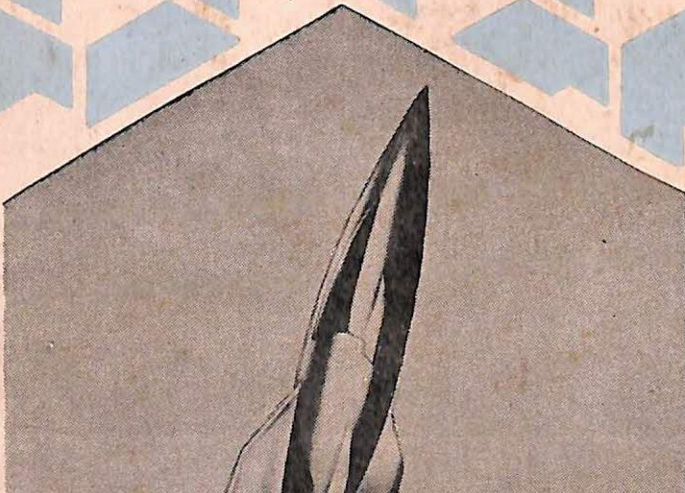
# নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপনাস্ত্র

সুশীল চন্দ্র ঘোষ



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

# নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র

শ্রীসুশীল ঘোষ



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

**NIYANTRITA KSHEPANASTRA**

(Guided Missile)

**Shri Sushil Ghosh**



প্রকাশকাল : মার্চ, ১৯৮৫

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা )
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রক :
শ্রীপ্রবীরকুমার পান
লক্ষ্মী সরস্বতী প্রেস
২০৯বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬



চিত্রাঙ্কন : শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার
প্রচ্ছদ : শ্রীবিমল দাস

মূল্য : বারো টাকা

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

## উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয়

**শ্রীসঞ্জীব কুমার বসু-কে**

যিনি বারো বছর অন্ধকারের
তলা থেকে এই প্রবন্ধ পত্রস্থ করেছেন—

# ভূমিকা

**আদিযুগ :—**

রকেট কবে কখন কোথায় প্রথম আবিষ্কৃত এবং ব্যবহৃত হয়েছে তার সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ না থাকলেও বারুদ আবিষ্কারের সাথে এর সম্বন্ধ নিশ্চিত। ৮০০/৯০০ বছর বা ভিন্নমতে ২০০০ বছর বা তারও আগে বারুদ প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীনদেশে। মুসলমান রাজত্বকালে এবং তার আগে ও পালদের রাজত্বকালে বারুদের জন্য $KNO_3$ ( পটাশিয়াম নাইট্রেট )-এর বাজার ছিল প্রধানতঃ চীনদেশ এবং তখনকার বাংলাদেশের অন্তর্গত বিহার। তখন অবশ্য বারুদটা ব্যবহার হতো আতসবাজিরূপে,—আনন্দ-উৎসবের অঙ্গ হিসাবে। ১২৩২ সনে মোগলরা যখন Honan প্রদেশের রাজধানী কাইফেন শহর ঘিরে ফেলে তখন শহরের মধ্য থেকে চীনারা শত্রুর বিরুদ্ধে রকেট ছুড়তে আরম্ভ করে। যার নাম দেওয়া হয় 'আগুনের তীর', এই রকেটের সাহায্যে শত্রুর দুর্গে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হতো।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে মালবদেশের গুপ্তরা বারুদের ব্যবহার জানতেন এবং তা দিয়ে রকেটও তৈরী করতেন। তবে তা আতসবাজিরূপেই ব্যবহৃত হতো। আতস কথাটা পারস্যের, অর্থাৎ প্রাচীন আর্যভাষা। যার মানে হচ্ছে আগুন। অথর্ব বেদ বা আত্রীমুনির নামের পেছনে লুকিয়ে আছে এই 'আতস' কথাটির অর্থ।

১২৮৮ সনে মঙ্গোলরা ভ্যালেনসিয়া শহর আক্রমণ করে রকেট দিয়ে। তার আগে ২৪৯ সনে ইবেরিয়ান উপদ্বীপ ডায়েতেও রকেটের ব্যবহার হয়।

১৬৩২ সনে জারমানরা ১৩২ পাউণ্ড ওজনের রকেট তৈরী করেন। কাঠের তৈরী এই রকেটে ৭ কেজি বারুদ ব্যবহৃত হতো। কামানের প্রতাপে রকেটের দিন চলে গেছে বলে যখন লোকেদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল তখন হঠাৎ-ই মহীশূরের রাজা হায়দর আলীর তৈরী রকেটের কার্যকারিতা দেখে ইংরেজরা অবাক হয়ে যায়। হায়দর আলীর পুত্র টিপু সুলতান রকেটের আরও উন্নতি করেন। তার সময়কার রকেটগুলি তৈরী হতো ধাতুর তৈরী নল দিয়ে। শুধু পেতল নয় পেটাই লোহা দিয়েও ভাল রকেট তৈরী করা হতো। এই রকেটগুলোর তিনটে অংশ ছিল।—(১) দিক বা নিশানা নির্ণয় ব্যবস্থা, (২) গতি সঞ্চার-ব্যবস্থা, (৩) মাথার কাছে মহাবিস্ফোরক ব্যবস্থা। হায়দর আলির রকেটবাহী সৈন্য সংখ্যা ছিল ১২০০। কিন্তু তার পুত্র টিপু সুলতানের সময় শুধু রকেটের উন্নতিই হয়নি, রকেটবাহী সৈন্যসংখ্যা বেড়ে হয় ৫০০০। ১৭৯২

এবং ১৭৯৯ সনের শ্রীরঙ্গপত্তনমের যুদ্ধে টিপুর হাতে বিশেষ কিছু না থাকা সত্ত্বেও ব্যাপকভাবে এই রকেট ব্যবহার ক'রে ইংরেজদের অবিশ্বাস্য ক্ষতি করেন টিপু। ঊনবিংশ শতাব্দীতে টিপুর পতনের পরে তাঁর রকেট নির্মাণের কৌশল এসে যায় ইংরেজদের হাতে। **Royal Arsenal of Woolwich**-এর **Controller**-এর পুত্র **William Congreve** এই রকেটের আরও উন্নতি করেন। ১৮০৬ সনে ইংরেজরা এই রকেটের সাহায্যে ফরাসী বন্দর বোলোনের ওপরে বম্বার্ড করে। পরের বছর ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বন্দরকে এই রকেটের সাহায্যে জ্বালিয়ে দেয়। ১৮১২ সনে ইংরেজ আমেরিকার যুদ্ধে ইংরেজরা শত শত রকেট ব্যবহার করে। ১৮১৪ সনের ২৪শে আগষ্ট ব্ল্যানডেনবার্গ-এর যুদ্ধে ইংরেজরা রকেটের সাহায্যে আমেরিকার সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করে। এবং ঐ সনেরই সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার রাজধানী ওয়াসিংটন ইংরেজের হাতে চলে আসে। তারপরেই যদিও ইংরেজদের আমেরিকা ছেড়ে চলে যেতে হয় কিন্তু আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীতে চিরদিনের জন্য খচিত হয়ে যায়

"The rocket red glare……"

**মধ্যযুগ :—**

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই **short wave Radio** যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। **Short wave** বহিরাকাশে প্রতিফলিত হয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। তাই সব দেশেই বহিরাকাশ সম্বন্ধে গবেষণা চলতে থাকে। সৃষ্টি হয় 'রকেট ক্লাব'। ১৯৩১ সন থেকে হিটলারের জার্মানী, ১৯৩৬ সন থেকে রাশিয়া, জার্মানী, আমেরিকা ছাড়া আরও কয়েকটি দেশ যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য রকেটের গবেষণা চালাতে থাকে। এরই ফলস্বরূপ জার্মানীতে $V_1$ $V_2$ রকেটের সৃষ্টি। যা মূলতঃ লণ্ডন তথা ইংল্যাণ্ডে ভীতির সঞ্চার করে। হিটলারের পরাজয়ের পর বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক ভারতে এসে সম্মান মর্যাদা এবং গবেষণার সুযোগ না পেয়ে ভারত ছেড়ে চলে যান আমেরিকায়। তার মধ্যে অন্যতম হের মেডার, যিনি ভারতীয় অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে মাত্র ৮০০ টাকা মাইনের চাকুরী করতে আসেন, পরে তিনি হন আমেরিকার **Head of the material division of space research Center**। এই সূত্রে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিমান পরিকল্পনা বিশারদ "মেসার্স স্মিট" কিছুদিন ভারতে থেকে পরে ফ্রান্স এবং

আমেরিকার হয়ে কাজ করেন। $V_1$ $V_2$-র কল্যাণে আবিষ্কৃত হয় জেট পরিচালিত এ্যারোপ্লেন। $V_1$ $V_2$-র দান হচ্ছে মানুষের সৃষ্ট উপগ্রহ। যার সহায়তায় একদেশের TV অন্য দেশ থেকে দেখা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার সহায়ক, আবহাওয়ার পরিবেক্ষণ ও নির্ণয়ও সম্ভব $V_1$ $V_2$-র কল্যাণে।

নিয়ন্ত্রিত রকেটের সাহায্যে পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদে অবতরণ সম্ভব হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত রকেট গ্রহান্তরের বহু তথ্য এবং ছবি সংগ্রহ করতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ এবং রকেট থেকে ছবি পাঠানো অবশ্য সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের এক নতুন আবিষ্কার 'সলিড ষ্টেট ইলেকট্রনিক্স ফিজিক্সে'-র সাহায্যে। ইলেকট্রনিক্স-এর উন্নতির জন্যই কমপিউটারের অদ্ভুত উন্নতি হয়। যার সাহায্য ছাড়া দ্রুতগামী রকেটের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব ছিল না। রকেটের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে যে ধরনের চিন্তা এবং প্রতিক্রিয়া দরকার তা মানুষের সাধ্যের বাইরে। অসাধ্য সাধন করলো কমপিউটার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অ্যাটম বা হাইড্রোজেন বম্ববাহী নিয়ন্ত্রিত মিসাইল-ই হলো ব্রহ্মাস্ত্র, যা ছোড়া যায় আকাশ, মাটি, জল এবং জলের তলা থেকে। যার সাহায্যে সীমিত সংখ্যক রকেট ছেড়ে পুরো শত্রু দেশই ধ্বংশ করে দেওয়া যায়।

## বর্তমান যুগ :—নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের বিবিধ ব্যবহার :—

১। **যুদ্ধাস্ত্র :—**

এখন স্বয়ংক্রিয় ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে।

(ক) ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী স্বনিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র।

(খ) মাটি থেকে ছুঁড়ে আকাশের যুদ্ধবিমান ধ্বংস করতে পারে এমন ক্ষেপণাস্ত্র যাকে ইংরেজীতে বলে (SAM) Surface to Air Missile.

(গ) জাহাজ থেকে জাহাজ ধ্বংসী। ১৯৬৭-তে ৬ দিনের যুদ্ধে আরব দেশগুলো ইস্রাইলের হাতে অদ্ভুতভাবে হেরে যায়। কিন্তু মিশরে রাশিয়ার তৈয়ারী ছোট একটা মোটর বোট থেকে নিক্ষেপিত স্বয়ংক্রিয় ক্ষেপণাস্ত্র ইস্রাইলের প্রধান যুদ্ধ জাহাজ "ক্রুজার"-কে ডুবিয়ে দিয়ে পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দেয়। ইস্রাইল অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে জাহাজ ধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র বের করে, যার নাম "জেব্রাইল"। যা পাবার জন্য আমেরিকার মত দেশকে ইস্রাইলের দ্বারস্থ হতে হয়। ইস্রাইল ফ্রান্সের ১১টা টরপেডো বোট প্রায় বোম্বেটেগিরি ক'রে দখল ক'রে নেয়।

এবং তাতেই এই জেব্রাইল রকেট লাগানো হয়। ফ্রান্সের এই মোটর বোটগুলি অবশ্য ইস্রাইল নগদ টাকা দিয়েই কিনেছিল। কিন্তু ফ্রান্স মোটর বোটগুলি দিতে না চাওয়ায় ইস্রাইল ফ্রান্সের বন্দর থেকে মোটর বোটগুলি চুরি করে। ১৯৭১ ডিসেম্বরে ভারতের কাছে ছিল মিশরের মত রাশিয়ার তৈরী মোটর বোট। যা থেকে নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া যায়। এই ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে ভারত শুধু পাকিস্তানের ক্রুজার ডুবিয়ে দেয় তাই নয়, করাচীতে হামলা ক'রে সমুদ্রপারে তৈল ভাণ্ডার ও তৈল শোধনাগারে আগুন লাগিয়ে দেয়।

(ঘ) আণবিক বোমাবাহিত মধ্যপাল্লার এবং দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র :—

রাশিয়া এবং আমেরিকা সামনে পাল্লা দিয়ে এই রকেট তৈরী করছে। এর মাথায় থাকে লক্ষ লক্ষ টন TNT সমপরিমাণ ধ্বংসাত্মক অ্যাটম বা হাইড্রোজেন বম্ব ( ফিসন বম্ব এবং ফিউসন এবং কিসন বম্ব )। এই সব বোমার কাছে আমেরিকা জাপানের ওপরে যে বোমা ফেলেছিল তা অতি শিশু, এ রকম ধরনের আণবিক বোমা তৈরী করছে শুধু আমেরিকা বা রাশিয়া নয়, আরও অনেক দেশ। যথা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, কানাডা, চায়না, ইসরাইল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত ঘোষণা করেছে যে তারা "অণুবিভাজন শক্তি" শুধু শান্তিপ্রিয় কাজেই লাগাবে। কিন্তু ভারত স্বনিয়ন্ত্রিত অতি শক্তিশালী দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বানাবার প্রচেষ্টায় আছে, মহাবিশ্ব গবেষণার জন্য। যা পরে লেখা হচ্ছে।

## ২। যোগাযোগ ব্যবস্থা :—

যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য দরকার পৃথিবীর চারপাশে ঘূর্ণ্যমান "মানুষের তৈরী উপগ্রহ"। বা পৃথিবীর গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আনুপাতিক স্থির উপগ্রহ। এই উপগ্রহের সাহায্যে দেশ-দেশান্তরে রেডিয়োর খবর ও TV প্রচার আশ্চর্য্যজনকভাবে সফল হয়েছে।

## ৩। গুপ্তচর বৃত্তি :—

এই উপগ্রহের সাহায্যে শত্রুর দেশের সব গোপন সংবাদ জানা যায় এবং যুদ্ধকালীন ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষে পৌছুতে সাহায্য করে।

## ৪। উপগ্রহের সাহায্যে বিবিধ গবেষণা :—

পৃথিবীর নভোমণ্ডল, পৃষ্ঠ এবং অন্তর্ভাগের বিবিধ গবেষণা চলছে মানুষের সৃষ্ট উপগ্রহের সাহায্যে। এর সাহায্যে আজকাল আবহাওয়া নিরূপণ এবং

ভবিষ্যত নির্ণয় করা হয়। মাটির তলার জলজ সম্পদ, তৈল সম্পদ, এবং অন্যান্য ধাতুর প্রস্তর ভাণ্ডার অনুমান করতে সাহায্য কর্বে।

৫। **বহিরাকাশ :—**

বহিরাকাশের প্রথম পদক্ষেপ পৃথিবীর চারপাশের আকাশকে জানা, পরীক্ষা করা। চাঁদ সম্বন্ধে এখনও আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহ যথা—বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি সম্বন্ধে পরীক্ষা করা। তাছাড়া সৌর-মণ্ডলের রাজা সূর্য্য সম্বন্ধে পরীক্ষা তো আছেই। অসীম অনন্ত বহিরাকাশে কত যে সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ আছে, কত রকমের যে তাদের শ্রেণী, তা বলে শেষ করা যায় না। মানুষ অনেক জানার পর বুঝেছে তার জ্ঞান সীমিত। চাঁদে বা বহির্বিশ্বে মানুষ যে উপগ্রহ পাঠাচ্ছে নিয়ন্ত্রিত রকেটের সাহায্যে, তারা কিছু মনুষ্যবাহী, কিছু মনুষ্যহীন। অন্যান্য গ্রহে প্রেরিত সব রকেটই মনুষ্যহীন। কারণ সেখান থেকে ঘুরে আসতে বহুদিন সময় লাগে। এখন তাই গবেষণা চলছে মানুষ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিহীন মহাকাশে কত বেশী দিন থাকতে পারে। আর গবেষণা চলছে পৃথিবীর বহির্বিশ্বে মনুষ্য সৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করা যায় কিনা।

**ভারতে স্বয়ংক্রিয় রকেট নির্মাণ :—**

ভারতে স্বনিয়ন্ত্রিত রকেট নির্মাণের দুটি প্রধান প্রতিষ্ঠান আছে।

১। ভারত ডাইনামিকস—স্থান হায়দ্রাবাদ। এরা খুবই অল্প পাল্লার রকেট তৈয়ারী করে মূলতঃ শত্রুর ট্যাঙ্ক ধ্বংসের জন্যে। এখন অবশ্য এই প্রতিষ্ঠান বিমানধ্বংসী ও অন্যান্য রকেট তৈয়ারীর কাজে হাত দিয়েছে। তবে মূল প্রতিষ্ঠান যারা দূরপাল্লার রকেট তৈরী করছে তার নাম ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র (ISRO)। এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কেন্দ্র হচ্ছে থুম্বা, শ্রীহরিকোটা, বাঙ্গালোর এবং আমেদাবাদ। এদের Solid এবং Liquid fuel জোগান-র ভার ভারতীয় Ordnance Factory-র হাতে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ যেমন দ্রুত সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে অনুমান হয় ভারত নিজেই সাফল্যের সাথে উৎক্ষেপণ করতে পারবে। প্রথমটায় অবশ্য ভারতীয় উপগ্রহতে মানুষ না-ও থাকতে পারে, কালক্রমে ভারত প্রেরিত উপগ্রহে অবশ্যই মানুষের স্থান হবেই। যেমন হয়েছে শ্রীরাকেশ শর্মার স্থান রাশিয়া প্রেরিত উপগ্রহে।

আমার স্থির বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে সৌরমণ্ডলের বাইরে না হোক সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রহের আশে পাশে মনুষ্যবাহী রকেট নিশ্চয়ই ঘুরে আসবে।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ দত্ত

# লেখকের নিবেদন

এ বই কোনদিন প্রকাশিত হবে, এ-আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

বইখানি লেখা হয় মূলতঃ ১৯৭১-৭২ সালে। তার পরে প্রতিনিয়তই শেষতম আধুনিকতম তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য গত তেরো চৌদ্দ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অবিশ্বাস্য রকম এগিয়ে গেছে। দিনের পর দিন প্রযুক্তিগত যেমন যেমন অগ্রগতি বা উন্নতি হয়েছে সেই সবই 'নোট' করেছি। এবং এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করতে চেষ্টা করেছি।

বইয়ের প্রথম আটটি অধ্যায় বিখ্যাত ত্রৈমাসিক "সাহিত্য ও সংস্কৃতি"তে জানুয়ারি-মার্চ ১৯৮৩ সংখ্যায় প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়। পাণ্ডুলিপি দিয়ে এসেছিলাম সম্ভবত ১৯৮০ সালে। অর্থাৎ প্রথম আটটি অধ্যায়ের বক্তব্য '৭৯ সাল পর্যন্ত পরিশোধিত ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল "স্বনিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র" শিরোনামে। কারণ, ক্ষেপণাস্ত্র তখন স্বনিয়ন্ত্রিত ছিল। একবার উৎক্ষেপ করা হ'লে মাটির সঙ্গে, তথা উৎক্ষেপণকারীর সঙ্গে তার আর সংযোগ থাকতো না। মিসাইলের ভিতরের যন্ত্রপাতিই মিসাইলকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে লক্ষ্যস্থল বা নিশানায় পৌঁছে দিত।

নবম অধ্যায় সংযোজনের ফলে বইয়ের নাম পরিবর্তন করে 'নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র' করা হলো। চাঁদে বা মঙ্গলগ্রহে অভিযাত্রী মহাকাশযান যেমন প্রতিমুহূর্তে খবর বা ছবি পৌঁছে দিতে দিতে এবং গ্রাউণ্ড স্টেশনের নির্দেশ নিয়ে সেই মতো কাজ করতে করতে অগ্রসর হয়, মিসাইলও আজ তেমনি। ১ অক্টোবর ১৯৮৪ ক্যালিফর্ণিয়ার একটি উৎক্ষেপ মঞ্চ থেকে MX মিসাইল নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা শুরু করতে পারলো না **when the guidance system had shut down after a photo diode in the ground support system malfunctioned**—( পৃথিবীতে স্থাপিত ) প্রতিপোষক উৎক্ষেপ মঞ্চের একটি ফটো ডায়োড কাজ না করায় মিসাইলের গাইডেন্স ( পরিচালন ) ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অর্থাৎ, কমপিউটারের সাহায্যে মাটির বুকে বসে মিসাইল উৎক্ষেপণ তো হচ্ছেই, মিসাইল যতোদূর যাচ্ছে তার বলগা ধরে আছে কমপিউটার। ছোট্ট একটি ( কমপিউটার এর ) চিপ, ধরুন এক ইঞ্চি বাই ওআন ফোর্থ ইঞ্চ বাই

ওয়ান এইটথ ইঞ্চ এই মাপের—এতে হাজারটা ট্রানজিস্টার আঁটতে পারে। এই হাজারটা ট্রানজিস্টারের পরিবর্তে যা আছে সেগুলি আপনার হাজারটা আলাদীন। এক একটা দিয়ে এক একটা কাজ করান না! রোল পিচ ইঅ ভুল করলে অলটিট্যুড ভুল করলে বা যে কোন ভুল করলে মাটির বুকে খবর পাঠাচ্ছে। আর এক সেট-মাটি থেকে হুকুম নিচ্ছে। আর এক সেট হুকুম তামিল করছে নির্দিষ্ট প্রত্যঙ্গকে শুধরে দিচ্ছে। মিসাইলটি এঞ্জিন কখন বন্ধ করবে, সে-নির্দেশ তো দেওয়াই আছে।...আপনারা দেখেছেন, কমপিউটার টাইপরাইটার কী বোর্ডের চাবি টিপে টিপে চলন্ত ছবি তৈরি করা যায়। উড়ন্ত প্যাচা কেমন ডানা ঝাপটে, চোখ পিট পিট করতে করতে এগিয়ে আসে।...কী বোর্ডের চাবি টিপে চিপ তৈরি করে দেখানো যায় মঙ্গল গ্রহ কক্ষচ্যুত হ'য়ে উল্কাবেগে ছুটে চলেছে। শনির অভিকর্ষের এক্তিয়ারে পড়ে শনির বলয় তিনটে ভেদ করলো। করে শনির পেটে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।...নকল উপগ্রহের টিভি ক্যামেরার দৌলতে পৃথিবীর সর্বত্রের ছবি তো পাওয়াই গেছে। যে জায়গাটায় মিসাইলটি ফেলতে হবে তার ছবিও আছে।... সেই ছবি দেখে কমপিউটার সেই জায়গাটার ছবি তৈরি করে, কমপিউটারের ব্রেন-এ পুরে দিল। আর একটা অংশকে হুকুম দিল আসল জায়গাটার সঙ্গে কমপিউটারে রাখা ( আগে থেকে তৈরি ) ছবিটি মিলে গেলে মিসাইলকে ঝাঁপ দিতে হবে।

কমপিউটার-এর একটি চিপ আপনাকে 'ফুল প্রুফ' ও ভুল 'প্রুফ' করে দিচ্ছে। মিসাইল আজ লক্ষে নির্ভুল—এই কমপিউটারের দৌলতেই।

প্রযুক্তি বিদ্যা এতো দ্রুত এগিয়ে চলেছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারিনি এই বইয়ে।

কিছু কিছু অংশ দীর্ঘদিনের ব্যবধানে লেখা। সামান্য সামান্য অসঙ্গতি চোখে পড়তে পারে। তার জন্য মার্জনা চাইছি।

রেখাচিত্রগুলি লেখকের। কয়েকটি পরিস্ফুটনে সাহায্য করেছেন, গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের স্নাতক, কমার্শিয়াল আর্টিস্ট, স্নেহভাজন শ্রীমান সুশীলকুমার মজুমদার

স্বনামধন্য সদ্য প্রয়াত সন্তোষদা ( সন্তোষকুমার ঘোষ ) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দয়া করে এই পুস্তকের প্রশস্তি লিখে দিয়েছিলেন। আমার মতো সামান্য লোক তাদের ধন্যবাদ জানাবার স্পর্ধা রাখি না।

ভারতের অস্ত্রনির্মাণ কারখানা **Ordnance Factories** সমূহের প্রাক্তন অতিরিক্ত ডাইরেক্টর জেনারেল শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ দত্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়ে অনেক মূল্যবান উপদেশ নির্দেশ দিয়েছেন। অনেক স্থানে বিপুল পরিবর্তন করেছি তাঁরই নির্দেশে। তাঁকে সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জানানো ছাড়া আমার আর কীই বা আছে। একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই কারখানা সমূহে যে মিসাইল উৎপাদিত হয় তারও খবরদারি করতেন শ্রীযুক্ত দত্ত। বর্তমান লেখকও দীর্ঘদিন এই বিভাগের অন্যতম কারখানায় কাজ করেছেন।

পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসন অধিকারিক অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যিনি এই নিরস বস্তুকে পুস্তকাকারে প্রকাশের দুঃসাহস দেখিয়েছেন।

১১৫ এস এন ব্যানার্জি রোড
ব্যারাকপুর (৭৪৩১০১)

নিবেদন ইতি
**সুশীল ঘোষ**
১২ মার্চ ১৯৮৫

# সূচীপত্র

# নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র

## প্রথম অধ্যায়

## মিসাইল বিজ্ঞানে জারমানীর অবদান

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মূর্তিমান বিভীষিকা জার্মান ভি-১, ভি-২ রকেট। ভি-১'কে বোঁ বোঁ বোমা বলা হতো। ওড়া কালে তার বিশেষ আওয়াজের জন্যই ঐ আখ্যা পেয়েছিল। আর ভি-২'কে আমরা ভি-২ বললেও নির্মাতা এ-৪ বলতেন। এই ফন ব্রাউনই এ-১, এ-২, এ-৩, এ-৪ এবং আরো দশ রকমের মোট চৌদ্দ রকমের গাইডেড মিসাইল তৈরী করার মূলে। তৈরী করা থেকে পরীক্ষা করা সবই।

ভি-২ ছিল ফন ব্রাউনের চূড়ান্ত লক্ষ্যের সিঁড়ির প্রথম ধাপ মাত্র। তার লক্ষ্য ছিল অনেক উঁচুতে। মানুষের তৈরী কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করবেন মহাকাশে, যাকে আমরা স্পেস স্টেশন বলে জানি।

'ভি-২' বা 'এ'-এর পর ফন ব্রাউনের উল্লেখযোগ্য সংযোজন 'এ-৯'। ভি-২-এর মতনই এটাও। ডানাগুলো বিরাট এবং পেছনে মোড়া। তৃতীয় পদক্ষেপ এ-১০। এ-৯-এর পিছনে ( স্টার্ন-এ ) ৮৫ টন বুস্টার রকেট। তিন ধাপ রকেটের এই 'এ-১০'-এর পাল্লা হতো ৩৫০০ মাইল। যুদ্ধ শেষ হবার আগে ভি-১, ভি-২ ছাড়া আর কোনোটাই হাজারে হাজারে তৈরী হয়নি যদিও।

এই ভি-২ সম্বন্ধে বেশ মজার সব তথ্য জানতে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ স্থরু থেকে শেষের মধ্যে অর্থাৎ জার্মানীর সামগ্রিক বিলুপ্তি পর্যন্ত জার্মানীর অতো চমৎকার রকেট তৈরীর উৎকর্ষতা বারে বারে মার খেয়েছে, বাধা পেয়েছে। নিজের সাবললীতায় মহীরুহে পরিণত হতে দেন নি হিটলার স্বয়ং। অবশ্য মিত্রশক্তির বোমারুরাও অন্যতম কারণ। হিটলার হাত গুনে দেখলেন—ও তোমাদের রকেট মকেট ভালো করে জন্মাবার আগেই আমি বাজীমাত করব।

এই অন্তরায় বা বিপর্যয় সত্ত্বেও তা বলা যেতে পারে, ১৯৪২-এর শুরুতে জার্মান সেনাবিভাগের কর্তারা হিটলারকে মতলব দিলেন ইংলণ্ডে বছরে ৫০০

ভি-২ পৌঁছে দিতে পারি। হিটলার বিদ্রূপ করে বললেন — একসঙ্গে—৫০০০ ছুঁড়তে পারবে? রফা হলো। চব্বিশ ঘণ্টায় ১০০০। অবশ্য এ স্বপ্নও বাস্তবে রূপ পায়নি।

মিত্রশক্তি কর্তৃক মিসাইল ছোঁড়ার সমস্ত ঘাঁটি দখল হবার আগে সর্বমোট ৪০০০ মতন ভি-২ ছোঁড়া হয়েছিল ইংলণ্ডের ওপর। মিত্রশক্তি ইয়োরোপ আক্রমণের সুযোগ পাওয়ার আগেই জার্মানী স্থির করল আমাদেরই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মিত্রপক্ষের বোমবাজীর এই সময়টা ছিল ১৯৪৩-এর মাঝামাঝি। সেই বছরই মার্চ মাসে জার্মানীর রকেট তৈরীর কেন্দ্রের বিলিব্যবস্থা এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। হিটলার স্বপ্ন দেখলেন—ও তোমার ভি-২ মি-ঃ কোনোদিনই ইংলণ্ডে ভূমিষ্ঠ হবে না। এই না ভেবে তিনি গোটা কর্মসূচীটাই বন্ধ করে দিলেন। দু'মাস সময় লাগল তার মনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তৈরী করতে। জার্মানীর দিক থেকে, যুদ্ধের দিক থেকে, যুদ্ধে জার্মানীর সার্বিক পরাজয়ের দিক থেকে হিটলারের এই গোঁয়ার্তুমি বৃহত্তম নিমিত্ত হয়ে আছে।

জার্মানীর নিরীক্ষা কেন্দ্র ছিল দু'টি।

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ সুরু। তারও ছ'ছটি বছর আগে ১৯৩৩ সালে জার্মানী রকেট ও গাইডেড মিসাইল নিরীক্ষা কেন্দ্র খুলল লোকলোচনের অন্তরালে, লোক গোচরের অন্তরালে। জার্মানীর নিভৃত প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়ায় সুদূর বাল্‌টিক সাগরের তীরে পীনেমুণ্ডি-তে ( Peenemunde )।

জার্মানীতে বিমান বাহিনীর অধিনায়ক হারমান গোরিং নিরপেক্ষ একটি নিরীক্ষা কেন্দ্র খুললেন ট্রইয়েন ( Trauen )-এ। সন ১৯৩৫ সাল। নিরপেক্ষ বললাম এই কারণে যে, পীনেমুণ্ডিতে যা হতো ট্রউয়েন তা টের পেত না। এবং বিপরীত। এ যেন, 'তোমার বাঁ হাত যা করে ডান হাতকে তা জানতে দিও না'—গোছের ব্যাপার। অনেকে, প্রবল পরাক্রমশালী জার্মানীর পতনের কারণ হিসেবে এই ব্যাপারটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

তবেই দেখুন, জার্মানীর প্রাথমিক সাফল্য—যা তা সাফল্য নয়—সেই চমকপ্রদ সাফল্যের পিছনে জার্মান বৈজ্ঞানিক ও এঞ্জিনীয়ারদের ও ক্ষমতার অলৌকিকতা, আরোপ করার দরকার নেই। যেটা আমরা এতাবৎ ভেবে এসেছি। তার চেয়ে বেশী, অনেক বেশী সাফল্যের কৃতিত্ব দিতে হবে অনুশীলনকে। যুদ্ধ বাধাবার ছটি বছর আগে থেকে একটি, চার বছর থেকে দ্বিতীয়টি নিরীক্ষা ও অনুশীলন

কেন্দ্র স্থাপন করেছিল যুদ্ধবাজ শ্যেন পাখী এই জার্মান জাত। তাই বা কেন? ছ'বছর, চার বছর নয়। আট বছর আগে বলা যেতে পারে। জার্মানীর রকেট চর্চা শুরু হয় ১৯৩১ সালে।

উরস্টার ( মাসাচুসেটস্ )-এর ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট এইচ গডার্ড রকেট গবেষণার সূত্রপাত করেন। তিনি নিরেট জ্বালানী দিয়ে রকেট ছোঁড়েন। সনটা ১৯১৫ সাল। আজকের কথা নয়। তার এই গবেষণার ফলশ্রুতি "এ মেথড অব রীচিং এক্স্ট্রীম অলটিচ্যুড" প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। ১৯২৬ সালে গডার্ডই তরল জ্বালানী দিয়ে রকেট ছুঁড়তে সফল হন। ১৯৩০ সালে তার তৈরী রকেট ঘণ্টায় ৫০০ মাইল বেগে ২০০০ ফুট উঁচুতে উঠতে সক্ষম হয়। গডার্ডই জাইরোস্কোপ বসিয়ে মিসাইলের গতিপথে সুস্থিতি ( স্টেবিলিটি ) এনে দেন। তিনিই ব্যয়িত গ্যাসের নির্গম পথে কামরাঙা ফলের শিরার মতন শিরার ব্যবস্থা করেন। গডার্ডই প্রথম শব্দাগ্রগামী স্পীড-এ রকেট নিক্ষেপে সফল হন। ......তিনি রকেট চর্চায় অনেকগুলি 'প্রথম'।

গডার্ড তার গবেষণার ফলাফল সমস্ত বিশ্বকে বিলিয়ে দিলেন। কিন্তু আর কেউ না-নিলেও, আর কোন জাত না নিলেও জার্মানী এই সুযোগ নিল পূর্ণমাত্রায়। তা সত্ত্বেও তারা ১৯৩১-এর আগে তরল জ্বালানীর রকেট ছুঁড়তে সক্ষম হয় নি।

১৯১৯ সালের গডার্ডের নিরীক্ষার ফলাফলের পুস্তক পাঠান্তে জার্মান অধ্যাপক হারমান ওবার্থ নিজের পরীক্ষা সম্বলিত পুস্তক "বাই রকেট টু প্ল্যানেটারি স্পেস" প্রকাশ করেন ১৯২৩ সালে।

আর একখানি অতি-মাত্রায় উল্লেখ্য সংযোজন অস্ট্রীয় এরোনটিকাল এঞ্জিনীয়ার ইউজেন সীনজার ( Eugen Saenger )-এর পুস্তক "রকেট ফ্লাইট টেকনিক"। প্রকাশকাল ১৯৩৩ সাল।

সে যাইহোক, হিটলারের জার্মানী,—হিটলারের জার্মানী কেন, হিটলার স্বয়ং —প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগে জার্মানীর বোমাকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টার কথা ভোলেন নি। উপরন্তু ব্যক্তি বিশেষের বা ক্লাব বিশেষের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা হিসেবে রকেট চর্চা নিষিদ্ধ করে রকেট বিদ্যা গবেষণাকে হিটলার রাষ্ট্রায়ত্ত ঘোষণা করেন। ১৯৩১ সালে। তাই বলছিলাম, যুদ্ধ শুরুর আট বছর আগে থেকেই জার্মানী রকেট চর্চাকে পরিপূর্ণ গুরুত্ব অর্পণ করেছিল।

এবং তাঁরই ফলে, রকেট-বলে অতুলনীয় বলবান হতে পেরেছিল জারমানী।

এবং সেটা ১৯৩৯-এই। জার্মান এঞ্জিনীয়াররা জাদু জানতেন না। জানতেন অনুশীলন আর অনুশীলন।

১৯৪৩ সালে ১৭ই আগস্ট মিত্রশক্তির বোমারুরা পীনেমুণ্ডিকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। সমস্ত রকেট চর্চা ও নির্মাণকার্য কেন্দ্রীভূত ছিল পীনেমুণ্ডিতে। পীনেমুণ্ডি ধ্বংস হবার পর রকেট চর্চা বিকেন্দ্রিত ক'রে ছোট ছোট কেন্দ্র স্থাপিত হল। কিন্তু দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত কেন্দ্রে গুছিয়ে বসতে জার্মানীর সময় লেগেছিল যথেষ্ট।

এতো মারাত্মক বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি 'ভি-২'র কেরামতিটা কতোদূর দেখা যাক একবার।

আজকের নিরিখেও ভি-২ অত্যন্ত শক্তিশালী রকেট। বিস্ফোরক—৮ টন। পাল্লা ২০০ মাইল অতিক্রম করতে সময় লাগত ৫ মিনিট। তার মানে মিনিটে ৪০ মাইল। গতিবেগ গড়পড়তায় সেকেণ্ডে মাইল থেকে খুব বেশী মন্থর নয়। এই ১৪ টনী দৈত্যটি লম্বায় ৪৬ ফুট, ব্যাসে ছিল ৫ ফুট। অতিমাত্রায় শক্তিশালী জ্বালানী পাম্প দ্বারা পরিচালিত ভি-১'র এঞ্জিন, এক মিনিটে ৯ টন অ্যালকোহল ও তরল অক্সিজেন খেয়ে ফেলত। প্রথম মিনিট অন্তে তার গতিবেগ সেকেণ্ডে এক মাইল হতো।

দূরের নিশানায় তাগ করলে ভি-২ চার সেকেণ্ড ধরে খাড়া উপরে উঠত। উঠে নিশানার দিকে উল্লম্বের সঙ্গে ৪৭° ডিগ্রী বেঁকে যেত। বেঁকানোই থাকত যতোক্ষণ না মোটর বন্ধ হতো বা জ্বালানী ফুরোত। রকেটের পাল্লা তাই মোটর চালু থাকার সময়কালের ওপর নির্ভর করত।

৪০০০ 'ভি-২' ছোঁড়া হয়েছিল। এর মধ্যে অনেকগুলিই নিশানায় পৌছত না। যন্ত্রপাতির ত্রুটির জন্যই ভি-২ এ-পাড়ায়-বেপাড়ায় খানাখন্দে অহেতুক প্রাণ বিসর্জন দিত। যন্ত্রপাতি নিখুঁত হতো যে-কটার, তাদের অর্ধেক সংখ্যা, নিশানার ৮ মাইলের মধ্যেও পড়ত না। বাইরে পড়ত। কিন্তু লণ্ডন শহর বিশাল। তার সেখানেই পড়ুক না কেন, শত্রুর ক্ষতি তো হলোই। অ্যান্টওয়ার্প আর লণ্ডনের প্রচুর ক্ষতি সাধন করেছে ভি-২। মাঝ আকাশে বাধা দিয়ে ধ্বংস করার পাল্টা অস্ত্র তখন বেরোয় নি। ভি-২ ছোঁড়ার মঞ্চ ছোট হতো। ছোট বলেই গুপ্ত থাকতে পারত। ছোঁড়ার মঞ্চ ঘন ঘন পাল্টানো হতো বলেই মিত্রপক্ষের বোমারু খুঁজে পেতো না তাদের। কাজেই সবগুলো ছোঁড়ার ঘাঁটি মিত্রশক্তির দখলে না আসা পর্যন্ত প্রচুর ক্ষতি করেছে ৪০০০ 'ভি-২'।

আর 'ভি-১' ?

তৈরীর পন্থা সহজ, ছুঁড়তে সোজা। জার্মানী ভি-১ ছেড়েছে হাজারে হাজারে। ভি-১'-এর জন্ম হলো কেন? সে-ও এক মজার ব্যাপার। ভি-২ জার্মানীর স্থল সৈন্যের অস্ত্র, আর ভি-১ জার্মানীর বিমান বাহিনীর। এ যেন যুদ্ধের দুই বাহিনীর রেষারেষির ফল।

একদিন বিমান বাহিনীর অধিনায়ক গোরিং 'ভি-২'র কর্মক্ষমতা পরীক্ষা দেখছিলেন। তিনি আগে থেকে স্থল বাহিনীর অস্ত্র নির্মাণ নৈপুণ্যে ঈর্ষাকাতর হয়েই ছিলেন। ভি-২ স্থল বাহিনীর অস্ত্র। ভি-২ ছুঁড়ে দেখানো হচ্ছিল গোরিংকে। হা হতোঽস্মি। প্রথমটা মঞ্চ ছেড়ে নড়লই না। যেখানে ছিল, সেখানে বসেই পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। হায়! হায়! দ্বিতীয়, তৃতীয়টি! তারা যদিও ফায়ার হলো, কয়েক গজ গিয়ে ছোঁড়ার মঞ্চ ত্যাগ না করে, মঞ্চ ছাড়বার ঠিক আগের পয়েণ্টে দুর্দান্ত শব্দে ফেটে বিদীর্ণ হলো মাত্র। এ তিনটিই গোরিং-এর বিদ্রূপকে যথার্থ প্রমাণ করতেই যেন ব্যর্থ বিফল বয়ে গেল। গোরিং বিদ্রূপ করে বললেন—খুব নিকট পাল্লার জন্য ভি-২ তো ভালো-ই। মন্দ কি! এর পরই গোরিং ট্রউয়েনে তার নিজের প্রতিষ্ঠিত রকেট ও মিসাইল গবেষণাগার বন্ধ করে দেন। তখন পীনেমুণ্ডি একাই রইল। এই পীনেমুণ্ডি ধ্বংস হয় ১৯৪৩ সালেই ১৭ই আগস্ট।

'ভি-২'র এই গগনচুম্বী অসাফল্যের পর বিমান বাহিনী ভি-২'র ওপর স্বভাবতই নির্ভর করতে বা আস্থা রাখতে পারে নি।

'ভি-১'-এর অভ্যুদয় এই কারণেই—

মাঝখানে পাখা। স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত। পালস জেট এঞ্জিন পরিচালিত মনো প্লেন এই 'ভি-১', 'ভি-২' জটিল, ব্যয়সাধ্য। 'ভি-১' হাতের কাছে প্রাপ্তব্য জিনিস দিয়ে, সহজ, কম খরচে তৈরী সম্ভব হতো। ৭০০০ থেকে ৪০০০ ফুট উঁচু দিয়ে অনুভূমিক ছিল এর গতি। স্মর্তব্য—ভি-২ চার সেকেণ্ড খাড়া উঠে ১৭° ডিগ্রী কোণে বেঁকে গোত্তা খেয়ে পড়ত। চার সেকেণ্ড পর বাকি ৪ মিনিট ৫৬ সেকেণ্ড প্রায় রাস্তাটা ৪৭° কোণে যেত। ভি-১ যেতো ১০০০ ফুট (বা ৪০০০ ফুট পর্যন্ত যে কোন উচ্চতায়) উঠে তারপর যেতে যেতে অনুভূমিক নিশানায়, পৌঁছে তবে ঝাঁপ দিত।

'ভি-১'-এর বিস্ফোরক ১ টন। 'ভি-২'-এরও তাই। ভি-২ এর পাল্লা

১৬০ মাইল। 'ভি-১'-এর ১০০ মাইল। গতিবেগ, ভি-১ এর ঘণ্টায় ৪০০ মাইল। 'ভি-২ এর অনেক বেশী। ঘণ্টায় ২৪০০ মাইল। 'ভি-২'র সামগ্রিক ওজন ১৪ টনের স্থলে 'ভি-১'এর মাত্র ২½ টন। সামগ্রিক ওজন ছ'ভাগের এক ভাগ—বিস্ফোরক কিন্তু সেই একই। এক টন। ওজনে হাল্কা বলেই 'ভি-১' বারস্টের দিক থেকে অনেক বেশী কার্যকরী। ভারী বলে ভি-২ মাটিতে পড়বার সময় গতিবেগ থাকত সেকেণ্ডে ১৭০০ থেকে ২৫০০ ফুট। তাতে গর্তটি গভীর হতো মাত্র। গর্তের গভীরে ঢুকে ফাটত বলে তার ধ্বংসক্ষমতা অনেক কম হতো। ভি-১ অতো গভীর গর্তই করত না। ভি-১'এর ক্ষতির ক্ষমতা অনেক গুণ বেশী।

ভি-১ ছাড়া হয়েছিল হাজারে হাজারে। লণ্ডনকে লক্ষ্য করেই অন্তত ৫০০০। যদিও তার অর্ধেকই লক্ষ্যে পৌছয়নি। মৃত্যুর সংখ্যা ৫৫০০। সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ বাড়ীর সংখ্যা ২৩০০০। 'ভি-১'কে গুলী করে ভূপাতিত করা খুব সহজ হলেও ভি-১ খুব শক্তিশালী এবং কার্যকরী বোমা। মৌমাছির গুনগুনানির মতো আওয়াজ হতো 'ভি-১'এর। নাম ছিল তাই গুঞ্জন বোমা। এর প্রতিষেধক দিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে অর্ধেকের বেশী বোমাকে গন্তব্যে পৌছবার আগেই নষ্ট করা হয়েছিল। এর পাল্টা ব্যবস্থাটি ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। দুপক্ষের ক্ষতির খতিয়ান করলে দেখা যাবেঃ মিত্রশক্তির ক্ষতি : এক, এই পাল্টা ব্যবস্থা তৈরী করতে যতো শ্রম ঘণ্টা লেগেছে তার দাম। দুই, বম-ভীত ত্রস্ত কারিগরের কামাই দরুণ ক্ষতি। তিন, ঘর বাড়ী কারখানা ক্ষতি মেরামতের খরচা। চার, ভি-১ বোমা ছোড়ার ঘাঁটি আক্রমণ করতে গিয়ে ১৫০০ বৈমানিকের অমূল্য প্রাণ।

এই দাঁড়িপাল্লায় ওজন করলে দেখা যাবে জার্মানীর অর্থব্যয় ও ক্ষতি মিত্রশক্তির ব্যয়ের মাত্র চার ভাগের এক ভাগ। সমস্ত নিক্ষেপ মঞ্চ মিত্রশক্তির দখলে না যাওয়া পর্যন্ত 'ভি-১' এর আক্রমণ বন্ধ হয়নি। হয়েই চলেছিল।

জার্মানীর অন্দরমহলে অনবরত বোমারু আক্রমণের ফলে মাঝপথে বোমারু-গুলিকে ভূপাতিত করবার ব্যবস্থার কথা গুরুতরভাবে চিন্তা করতে হলো। সবগুলিই স্যাম (SAM)-মাটি থেকে আকাশ-সারফেস টু এয়ার শ্রেণীর এই গবেষণার ফলে কিছু-না-হোক চল্লিশ রকমের কার্যকরী নকশা উপস্থাপিত করা হলো। ধোপে টিকল মাত্র চার রকমের।

ইংরিজী নামগুলো ব্যবহার করছি।

(১) জেনাশিয়ান (Gentian) বেতার নিয়ন্ত্রিত, আধ টন বিস্ফোরক বাহী রকেট। মিত্রশক্তির বোমারু ঝাঁকের উদ্দেশে তৈরী।

(২) বাটারফ্লাই ( Butterfly ) যুদ্ধ শেষ হবার প্রাক্কালে হাজারে হাজারে হাজারে তৈরী হচ্ছিল। এটিও বেতার-নিয়ন্ত্রিত।

(৩) ডটার অব দি রাইন ( Daughter of the Rhine ) ঘণ্টায় ১০০০ মাইল গতি বেগের রকেট। ৪৮০০০ ফুট ওপর দিয়ে যাবে, ৩৩০ পাউণ্ড বিস্ফোরক বয়ে। নিশানার কাছে পৌছোলে স্বয়ংক্রিয় ফিউজ জলে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাবে।

(৪) ওয়াটারফল ( Waterfall )—মিত্রশক্তির বোমারু ধ্বংসের জন্য তৈরী মিসাইল। ২৬ ফুট লম্বা রকেটটি হাজারে হাজারে তৈরী হতে সুরু হয়েছিল। এইটি তৈরীর জন্য জার্মানীর ব্যস্ততার অন্ত ছিল না।

কিন্তু, সব কিছুই বড়ো দেরী হয়ে গেল। এই চার রকম যখন ভালোভাবে তৈরী হবার ব্যবস্থা পাকা, আয়োজন সম্পূর্ণ, তার আগেই জার্মানীর পতন। জার্মানীর পতন আর দুটো মাস বিলম্বিত হলে আজকের পৃথিবীর চেহারাই হয়তো অন্যরূপ হতো।

এতদ্ব্যতীত আকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠ এআর টু সারফেস শ্রেণীর কয়েক রকমের মিসাইল জার্মানী শুধু তৈরীই করল না, যুদ্ধ শেষ হবার আগে কাজেও লাগাল। এগুলির নিশানা ছিল মিত্রশক্তির যুদ্ধ জাহাজ। হেনসকেল ২৯৩, ফ্রিৎস ১০। সালের্নোতে মিত্রশক্তির জাহাজের উপর ফ্রিৎস ১০ খেল দেখিয়ে দিল। বেতার নিয়ন্ত্রিত, বর্মভেদী বোমা এই ফ্রিৎস ১০।

এই সময় আকাশ থেকে আকাশ—এআর টু এআর—মিসাইলও তৈরী হয়েছিল হেনসকেল ২৯৪।

'নেসেসিটি ইজ দি মাদার অব ইনভেনশান'।

মিত্রশক্তির তুলনায় জার্মানীর বিমানবহর ছিল অনেক কম। নগণ্য। তাই জার্মানীকে সর্বশক্তি নিয়োগ করে গাইডেড মিসাইল উদ্ভাবন ও তৈরীতে সমর্পিত মন হতে হয়েছিল।

আমেরিকাকে এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়তে হয়নি। কারণ তার ভূখণ্ডে অর্থাৎ পশ্চিম গোলার্ধে একটি গোলাও বর্ষিত হয়নি। দূর থেকে সে

রং তামাসা দেখেছে। মিত্রশক্তিকে মদত দিয়েছে। তার উপচে পড়া টাকা পূর্ব গোলার্ধে এসে উড়িয়ে দিয়ে গেছে।

প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে না পড়লেও, নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যেতে পারেনি আমেরিকা।

প্রাণের দায়ে না হলেও আমেরিকা অবসর মতন মিসাইল চর্চা করছিল। ১৯৪০ সালে আমেরিকার তৈরী Azon, Razon বার্মা যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। কম-প্রসারী নদীর সেতু ধ্বংসে এগুলো ছিল অমোঘ। দুটিই দূর নিয়ন্ত্রিত। Azon কথাটা azimuth বা গতি নিয়ন্ত্রণে সমর্থ। Razon অর্থে, range বা পাল্লা, এবং azimuth বা গতি, দুইই নিয়ন্ত্রণে সমর্থ। এ দুটিই আকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠ ( ASM ) শ্রেণীর।

আমেরিকার তৈরী আকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠ ( ASM ) শ্রেণীর জি বি-১ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জি-বি বোধ হয় 'গ্লাইড বম' এর আদ্যক্ষর। গ্লাইডার হলো এঞ্জিনবিহীন বিমান। গ্লাইডার কমপিটিশন আপনারা বেহালায়, কলকাতা ময়দানে মাঠে অনেক দেখেছেন। ১২ ফুট ডালার বোমা বহনকারী এই এঞ্জিনবিহীন বিমান, 'চালক-এরোপ্লেন' থেকে ছাড়া হতো। ২০ মাইল আগের নিরাপদ দূরত্ব থেকে এরোপ্লেন জি, বি-১ ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ত। ২০ মাইল পর্যন্ত এই গ্লাইড বম তার মর্জি ( attitude ) বজায় রাখতে পারত। ছোঁড়ার পর ২০ মাইল আপনিই গিয়ে নিশানায় ঝাঁপিয়ে পড়ত।

আমেরিকার 'জি-বি ১' এর একটি সুন্দর উদাহরণ আছে—

১৯৪৩ এর মাঝামাঝি—

জার্মানীর কোলোন এ ৫৪ খানা আমেরিকার বি-১৭ বোমারু ১০৮টি জি-বি ১ 'বম' ছেড়ে এল। বলা বাহুল্য এই ৫৪ খানা বি ১৭-বোমারু কোলোন-এর ২০ মাইল দূরে থেকে অপকর্মটি সেরে নির্বিঘ্নে ফিরে এল। বিমানগুলিকে স্বভাবতই কোলোন-এর বিমানধ্বংসী কামানের আওতায় আসতে হয় নি। জার্মানীর সংবাদ সংস্থা লিখল—

কোলোনের ওপর অনেক উঁচু থেকে আমেরিকার বোমারু আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করা হয়েছে। আমাদের বিমানধ্বংসী কামান অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। বোমারুদের সাহায্যকারী এবং রক্ষক জঙ্গী বিমান ছিল অসংখ্য। অতি

দ্রুতগতি এই জঙ্গী বিমানগুলি অনেক নীচুতে নেমে আসে। কিন্তু বাছাধনদের একটিও প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দেওয়া হয়নি। ভূপাতিত হবার পর এই জঙ্গী বিমানগুলি বিস্ফোরিত হয়।—বলা বাহুল্য, ওগুলি জঙ্গী বিমান ছিল না। অনেক নিচুতে নেমে এসে বিস্ফোরকবাহী 'গ্লাইড বম'গুলি বিমানধ্বংসী কামানের নির্ভুল ও সহজ স্বীকার হয়েছিল। তার কারণ, এগুলি এঞ্জিনবিহীন তো বটেই, চালক-বিহীন তাই দৃষ্টিহীনও। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ, পক্ষী সমান নিজ নীড়ে ফিরে যাবার কথা তাদের ছিল না। যায়ও নি। যাদের ফিরে যাবার দরকার, সেই বোমারুরা ২০ মাইল দূরের নিরাপত্তা থেকেই পিঠ দেখিয়ে নীড়ে ফিরে গেছে।

১০৮টি জি বি-র প্রত্যেকটিতে ২০০০ পাউণ্ড করে গুরু বিস্ফোরক ছিল। বিমানধ্বংসী কামানের গুলি বিদ্ধ হয়ে সেগুলি অর্থাৎ ২,১৬,০০০ পাউণ্ড কোলোনেই বিস্ফোরিত হয়েছিল, তার জন্য ক্ষতিও কম হয়নি কোলোনের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটা আর মাস দুই চলল না। চললে আজকের পৃথিবী রূপান্তরে দেখতাম। একশো চল্লিশ রকমের মিসাইল জার্মানী তৈরী করেছিল। সেগুলি কাজে লাগাবার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। জার্মানী, পরাজিত পর্যুদস্ত হলো।

যুদ্ধ শেষে তাই দেখা গেল, জার্মানীর ল্যাবরেটরীতে ল্যাবরেটরীতে এ কোণে ও কোণে গাইডেড মিসাইল সম্পর্কে জ্ঞান-বিজ্ঞান পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাপ্ত অর্ধসমাপ্ত অসমাপ্ত একশো চল্লিশ রকমের মিসাইল সারা জার্মানীর কোণে কোণে ছড়িয়ে আছে।

যুদ্ধোত্তর মিসাইল নির্মাণ কর্মসূচীর একটা উল্লেখযোগ্য দিক হলো জার্মানীর এই সুপ্রচুর জ্ঞান-সম্ভারের সুযোগ নেওয়া। এই কর্মসূচী অনুসারে জার্মানী থেকে শ'য়ে শ'য়ে বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদ্ স্বেচ্ছায় আমেরিকায় চলে গেলেন। প্রথম দফায় ছ'মাসের শিক্ষানবীশী চুক্তিতে। চুক্তি অন্তে ফিরে না গিয়ে অনেকেই আমেরিকার নাগরিক হয়ে আমেরিকাতেই টিকে গেলেন।

আমেরিকার ভি-২ তৈরী দিয়েই হাতেখড়ি দিল। জার্মানদের কাছ থেকে ধার করা এই ভি-২'এর অভিজ্ঞতা আমেরিকাকে ৮ বছরের কাজ এগিয়ে দিল।

তা সত্ত্বেও এক মজার কাণ্ড হলো। ১৯৪৮ সালে নতুন শেখার পর তৈরী 'ভি-২', নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যাণ্ডস্ মিসাইল রেঞ্জ থেকে ছাড়া হলো। সেটি উত্তরে না গিয়ে দক্ষিণে পাড়ি জমাল এবং মেক্সিকোর জুয়ারেজ-এ গিয়ে জমে গেল। অর্থাৎ সুইসাইড।

এই সমস্ত বিজ্ঞানী ও বিশারদদের ধার্য মাইনের অধিক দৈনিক পঞ্চাশ টাকা মতন অতিরিক্ত দেওয়া হতো।

১৯৪৫-এর গ্রীষ্মকাল মিউনিকে একটি সম্মেলনের আয়োজন করল আমেরিকা। হাজির হলেন বিরাশীজন ভি-২ অভিজ্ঞ, কুশলী বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রবিদ ও প্রযুক্তিবিদ। এরই মধ্যে একজন এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন, ভি-২ আবিষ্কারক ও নির্মাতা, স্বনামধন্য ওয়ার্নহার ফন ব্রাউন। তৈরী ভি-২, তৈরী করে রাখা ভি-২-এর অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ, ভি-২'এর নকশা ইত্যাদি ও অন্যান্য হিসাবের কাগজপত্র কী কী নিয়ে যাওয়া হবে এই মিউনিকে বসেই স্থির হলো। ৮২ জন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদের পরিবারবর্গ আসবে পরে। বৈজ্ঞানিকেরা রওনা হলেন আগে। গন্তব্য টেক্সাস-এর কোটি ব্লিস। একটি জরাজীর্ণ কাঠের বাড়ী, এককালে হাসপাতাল ছিল। এই ধূলি-মলিন আধ-ভাঙ্গা বাড়ীটিই দেওয়া হলো তাদের।

এইখানেই ভি-২'এর ৬৯টি ছাড়া হয়। মিসাইল ছোঁড়ার মঞ্চ—নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যাণ্ডস—এর খুব কাছেই। এইখানেই মিসাইল দুনিয়ার অনেকগুলি 'প্রথম' অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে বহনকারী ক্যারিয়ার বিমান 'মিডও এ' থেকে ভি-২'তে করে একটি বানরকে অন্তরীক্ষে উৎক্ষেপ করা হলো। ১৯৪৯ সালে ২৪শে ফেব্রুয়ারী, দুই ধাপওলা ভি-২ রকেট ২৫০ মাইল উঁচুতে উঠতে সক্ষম হলো। এর নাকের ডগার ক্ষুদ্রতর মিসাইল 'ওয়াক করপোরাল'-নির্দিষ্ট উঁচুতে উঠে মূলাধার থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল। 'ওয়াক করপোরাল'-এর গতিবেগ তখন ঘণ্টায় ৫০০০ মাইল। একাধিক মাত্রার রকেট এ-ই প্রথম।...এমনি আরো অনেক 'প্রথম' এর জন্ম ও সূত্রপাত এই ভাঙা হাসপাতাল বাড়িতেই হয়েছে।

যুদ্ধোত্তর বছরগুলি রাশিয়াও ঘুমিয়ে কাটায়নি।

বস্তুতঃ এর বহু আগে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই রাশিয়ার এই বিষয়ের ধ্যান ধারণার ও পারঙ্গমতার পরিচয় দিল। সম্ভবত ১৯০০ সালেই রাশিয়ার গণিতজ্ঞ কনস্টানটিন ৎসিওলকোভস্কি "প্রিন্সিপ্‌লস্ অব রকেট ফ্লাইট" এবং ১৯০৩ সালে "ইনভেস্টিগেশন অব ইউনিভার্সাল স্পেস, বাই মিনস্ অব রকেট ফ্লাইট" প্রকাশ করেন।

রাশিয়ার—শুধু রাশিয়ার কেন, সকলেরই—নজর পড়েছিল ঐ মোক্ষম ভি-২'র ওপর। ও যে বহু সম্ভাবনাপূর্ণ। চাঁদে যেতে গেলে-ও ওর শরণ, অন্তর্মহাদেশ ক্ষেপণাস্ত্র পাঠাতেও ওরই শরণ নিতে হবে।

জার্মান এঞ্জিনীয়ার যন্ত্রবিদদের আমেরিকা নিয়ে গেল বলে কয়ে। ভুলিয়ে লোভ দেখিয়ে, আর বেঁচে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

আর রাশিয়ানরা জার্মাণ এঞ্জিনীয়ারদের রাতারাতি চুরি করে গায়েব করে দিল। ১৯৪৬-এর এক অক্টোবর রাত্রিতে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তোলা হলো ২০০০ জার্মান যন্ত্রবিদকে। স্বপরিবার ট্রাকে তুলে দেয়া হলো। লটবহর সমেত পরদিন প্রাতে তারা আবিষ্কার করলো তারা রাশিয়াগামী ট্রেনে বসে।

দেশে দেশে দ্বেষে দ্বেষে মিসাইল চর্চা বেড়েই চলল।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল। সবাইকে তাক লাগিয়ে ইউ. কে-র ডিফেন্স সেক্রেটারি ডানকান স্যাণ্ডিস একটি ঘোষণা করলেন। ঘোষণাটি হ'লো—আমরা এখন থেকে বিমান বহরকে ক্রমে ক্রমে বর্জন করবো। করে তার জায়গায় মিসাইল ব্যবহার স্বরু করবো।

কয়েকমাস বাদে সোভিয়েট ঘোষণা করলো,—আমরাও।

১৯৫৭ সালের আগস্ট মাসে রাশিয়া সদম্ভে ঘোষণা করল—বিশ্বের প্রথম আই-সি-বি-এম, আন্তর্মহাদেশ ক্ষেপণাস্ত্র আমরাই ছেড়েছি। 'টাস' লিখল—বিশ্বের কোনো অংশই আমাদের কাছে অগম্য রইল না।

১৯৬১ সালের আমেরিকার সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ঘোষণা করলেন ইউ-এস এর 'এটলাস' ( আই-সি-বি-এম ) ৯০০০ মাইল পাল্লায় যেতে পারে। তার অল্প আগেই রাশিয়া 'টি-৩-এ' আই-সি-বি-এম সাফল্যের সঙ্গে ৯০০০ মাইল পাড়ি দিয়েছে। ৯০০০ মাইল মানে পৃথিবীর বেড় এর এক তৃতীয়াংশ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# ওড়ার বিজ্ঞান

মিসাইলের গতি বিজ্ঞানে ( aerodynamics )-এর মোটামুটি চারটি শাখা —গতিবিজ্ঞান, নিয়ন্ত্রণ (guidance), চালনা (propulsion) পে লোড ( যে বিস্ফোরকটুকু পৌঁছে দেবার জন্য মিসাইলের জন্ম, জীবন ও মৃত্যু )।

প্রথমেই বিচার্য বিষয় হলো সেই মাধ্যমের, যার মধ্যে দিয়ে মিসাইলকে গতিশীল থাকতে হবে। সেই মাধ্যম কিছুক্ষণ হাওয়া কিছুক্ষণ আবহাওয়া। আমি অতো নিখুঁত সূক্ষ্ম ভেদ না করে air-কে হাওয়া বা বাতাস আর atmosphere-কে আবহাওয়া বলব। বাংলায় দুটিকেই বায়ুমণ্ডল বলা হয়, জানিনা কেন? দুজনের চরিত্র সবিশেষ আলাদা।

### হাওয়ার ধর্ম

বাতাস এবং জল দুটিই তরল (fluid)। তরল মাধ্যমের বিশেষ ধর্ম (property) তিনটি—ঘনত্ব (density), সংকোচনশীলতা (compressibiltty) সান্দ্রতা মানে আঠালো বা চটচটে ভাব (viscosity)।

বাতাসের ঘনতা বলতে বাতাসের একক পরিমাণ আয়তনে ( unit volume-এ ) যতটা ভর (mass) বা পদার্থ আছে। সাধারণ অবস্থায় সমুদ্রপৃষ্ঠে বাতাসের ঘনতা হয় প্রতি ঘনফুটে ০·০৭৭ পাউণ্ড। সেই ক্ষেত্রে সেই একক পরিমাণ আয়তনের জলের ঘনতা প্রতি ঘনফুটে ৬২·৫ পাউণ্ড। তার মানে ৮০০ গুণ বেশী। বাতাসের ঘনতা প্রগলভভাবে তাপ ও চাপের উপর নির্ভরশীল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যরকমভাবে দ্রুত কমতে থাকে। বাতাসের ঘনতা মিসাইলের ক্রিয়াকলাপে বিশেষভাবে বাগড়া দেয়। তার কারণও আছে। গতিশীল মিসাইল, নিকটের বাতাসকে বিপুলভাবে আলোড়িত ও চঞ্চল করে তোলে। বাতাসও অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে। স্বভাবতই বাতাসের ঘনতা যত বেশী, নিষ্ক্রিয়তা (inertia)ও তত বেশী। এবং মিসাইলকে তাই ততো বেশী শক্তি (energy) ব্যয় করতে হয়। বাতাসের ঘনতা জলের ঘনতার চেয়ে বহুল পরিমাণ কম। স্বভাবতই জলের চেয়ে বাতাসের মধ্যে মিসাইলের স্পীড অনেক বেশী তোলা সম্ভব।

চাপ খেলে আয়তন বদলানোকে সংকোচনশীলতা ( compressibility ) বলে। বোঝা যায় বাতাসের সংকোচনশীলতা যে বেশী। এক ঘর হাওয়াকে একটা ছোট্ট কৌটায় পুরে ফেলা যায়। তুলনায় জলের সংকোচনশীলতা অনেক কম। নেই বললেই চলে। গতি বিজ্ঞানে প্রায়শ ব্যবহৃত ও উল্লেখিত স্থিতি-স্থাপকতার মান নির্ধারক। **Bulk modulus of elasticity** ব্যাপারটি সংকোচনশীলতার ঠিক বিপরীত। বস্তুত সংকোচনের ব্যাপারে বাতাসের চেয়ে জল ১৪০০ গুণের চেয়েও বেশী সংকোচন বা সংনমন-অযোগ্য।

বুঝবার সুবিধার জন্য কম গতিবেগের ও কম উচ্চতার বাতাসকে সংকোচনের ( compression ) অযোগ্য ধরে নিচ্ছে। প্রক্ষেপণের সামান্য সময়টুকু বাদ দিলে, নিয়ন্ত্রিত মিসাইল তো অনেক উঁচু দিয়েই এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ওড়ে। সেই অনেক উঁচুতে এবং সেই অনেক গতিতে সংকোচনের রীতি প্রকৃতি ধর্ম অবশ্য বিবেচ্য ও গ্রাহ্য। পক্ষান্তরে জল কার্যত, সংকোচনের অযোগ্য। জলের মধ্যে দিয়ে যে কোন যান যে স্পীডেই যাক না কেন জল সংকুচিত ( compressed ) হবে না একটুও। যেতে হয়, ঠেলে ঠুলে যাও। আমি তোমার দাপটে কুঁচকে, আকারে ছোট হতে পারব না। জল বুক চিতিয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। জল যেহেতু সংকুচিত হয় না সেই হেতুই শ্যক ওয়েভ ( shock wave ) ব্যাপারটি জলের রাজ্যে অজানা। শ্যক ওয়েভ ব্যাপারটা বাতাসের রাজ্যের। কোন মাধ্যমের আওয়াজ পাচার করার ক্ষমতার চেয়ে দ্রুত যদি কোন পদার্থ যায়, সেই পদার্থের সামনে, কাপড় গিলে বা চুনট করার মতো, আওয়াজের ঢেউগুলো কুঁচকে জড়ো হয়ে যায়। এই কোঁচকানো তরঙ্গের নাম শ্যক ওয়েভ। এর আলোচনা পরে আসছে।

এরপরে আসছে সান্দ্রতা (viscosity)। কোনো বস্তুর মাধ্যমে এক স্তরের গতি, তার পরের স্তরে পৌছতে দিতে বাধা দেয় এই চটচটে সান্দ্রতা। উচ্চমানের সান্দ্রতা ( Viscosity ) মানে, এক স্তরের গতি পরের স্তরে পৌছতে দিতে দুস্তর বাধা। পিছনের স্তরগুলি যদি স্থির অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার গোঁ ধরে! এক পাত্র থেকে চিটেগুড়কে পাত্রান্তরে ঢালতে গেলে চিটগুড় পড়তে চায় না। মাটির টানে নিতান্তই যখন পড়তে বাধ্য হয় আঠালুত্ব অনবরত বাধা দিতে থাকে। মাটির টান ও সান্দ্রতার দোটানায় পড়ে পিছনের স্তরগুলি কুঁচকে যায়। জলের মতো হড়হড় করে পিছু পিছু অবলীলায় আসতে পারে না। মিসাইলের বেলায়ও

মাধ্যমের সান্দ্রতা যতো বেশী, স্পীডও সেই পরিমাণে কমে যেতে বাধ্য। বাতাসের থেকে ৬২ গুণ চটচটে হলো জল। আগেকার দুই ধর্মের বেলায়, যথা ঘনতা এবং সংকোচনপ্রবণতা, জলে বাতাসে বিশেষ তফাত হয়তো নেই। সান্দ্রতার নিরিখে, মিসাইলের পক্ষে জলের মাধ্যমের চেয়ে হাওয়ার মাধ্যম হাজার গুণ কাম্য। স্থল হিসেবে হাওয়ার সান্দ্রতা নেই। মিসাইল যখন খুব উঁচু দিয়ে যায় তার যাওয়ার রাস্তার উচ্চতা, আর মিসাইলের গতিবেগ বিচার করলে, হাওয়ার আঠালুত্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

## আবহাওয়া

আবহবিদদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে হাওয়ার ভাব-চরিত্তির চাল-চলন, মর্জি মেজাজ আগেই বলে দেয়া যেতে পারে। বোঝা কঠিন নয়।

কিন্তু আবহমণ্ডল ( atmosphere ) যদি শান্ত চুপচাপ কম্বলের-মতো-নিরীহ ভালোমানুষটি হয়ে পৃথিবীর গায়ে জড়িয়ে থাকত, তাহলে তো ল্যাঠা থাকত না। আবহাওয়ায় মিসাইলের গতিবিজ্ঞান জটিল হ'তো না। কিন্তু হায়, আবহাওয়ার চরিত্র অতীব জটিল। অতীব দুর্জ্ঞেয়। আবহাওয়ার মেজাজের অন্ত পাওয়াই ভার। উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে ঘনতা, সংকুচিত হবার ক্ষমতা, আঠালুত্ব ( সান্দ্রতা ) এবং সর্বোপরি তাপের—ভীষণ তারতম্য হয় তাই নয়, এগুলি প্রতিনিয়ত অবিরাম বদলাতে থাকে। বস্তুত, সংকোচন যোগ্যতা এবং ঘনতার রদবদল হয় উত্তাপের হাত ধরে। ট্রোপোস্ফিয়ারের মধ্যে—সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ছ মাইল—তাপমাত্রা থাকে ৬০°-৬৭° ডিগ্রী ফারেনহাইট। সেই গড় থেকে সুরু করে উচ্চতা যতো বাড়বে, উত্তাপ ততো কমবে। এই নিম্নতম তাপের এলাকায়ই আবহাওয়ার উপদ্রবটা অত্যন্ত প্রকট।

অথচ মজা দেখুন, স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ছয় থেকে বিশ এই চৌদ্দ মাইলে আবহাওয়ার গরম ঐ ৬৭° ডিগ্রীতেই থাকে। বলতে গেলে হেরফের নেইই। এই স্ট্রাটোস্ফিয়ারে তাপাঙ্ক অবিচল। তাপ-নির্ভর বলেই এখানকার হাওয়ার চাল চলনও সহজ হিসেবে বলে দেয়া যায়। একদল নরওয়ের পর্যবেক্ষক নাকি এই স্ট্রাটোস্ফিয়ারেও ক্ষেপে ক্ষেপে ঘণ্টায় আড়াই শো মাইল বেগের উল্লম্ব গতিবেগ আবিষ্কার করেছেন।

আরও ওপরে চলুন। স্ট্রাটোস্ফিয়ার আস্তে আস্তে এক স্তরে এসে অপর

একটি বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সেখানে অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন অক্সিজেন যাও বা অবশিষ্ট আছে, তাতে আর ৮০ : ২০ ভাগাভাগি খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে উত্তাপের উত্থান পতন আবার অতি দ্রুত। নিয়মানুগ হাওয়া বহতার সূত্র এখানে অচল। আড়াই শো মাইল ব্যাপী এই এলাকার নাম আয়নোস্ফিয়ার (Ionosphere)। এই নামকরণের হেতু—এখানে অণু ভেঙে আয়ন এবং বাধাবন্ধহীন ইলেকট্রনে পরিণত হয়।

এই আয়নোস্ফিয়ার নামটি যোগাযোগে নামের মান রেখেছে। কার্যে এটি আয়নাস্ফিয়ার। এই, আয়নাটি না থাকলে দূর পাল্লার প্রেমালাপ চলতো না। এই আয়নোস্ফিয়ারের আয়নায় বাড়ি খেয়ে আমাদের পাঠানো রেডিও সিগনাল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসে। পুনর্ভূমিষ্ঠ হয়। প্রথমবার পরীক্ষায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের ছুঁড়ে দেওয়া বাণী বেশ কিছুক্ষণ পর নহুষের প্রেতাত্মার কণ্ঠে শুনতে পেয়েছিলেন। এই আয়নোস্ফিয়ারে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছিল—বলাই বাহুল্য।

এই আয়নোস্ফিয়ারের তলার দিককার বিশ থেকে ষাট মাইলকে আরো একটা নামে ডাকা হয়—কেমোস্ফিয়ার। তার মানে আছে। এই এলাকাতেই সূর্যি ঠাকুরের শক্তি ( এনার্জি ) নিরবয়ব না থেকে কিছু কার্যকরী আকারে রূপান্তরিত হয়। কৃত্রিম উপগ্রহকে তাই কেমোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বেই থাকতে হয়। কারণ এখানকার আবহাওয়া, উপগ্রহকে মন্থরই শুধু নয়, ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে দেবার মতো যথেষ্ট ঘন।

২৫০ মাইল থেকে ৬০০ মাইল পর্যন্ত অন্তরীক্ষের জমিদারীর নাম মেসোস্ফিয়ার। নামকরণের কারণ এখানে মেসন (meson) ও অন্যান্য মহাজাগতিক অণু পরমাণু থাকে।

তারও ওপরে, মেসোস্ফিয়ার পার হলে, এক্সোস্ফিয়ার। আবহমণ্ডলের পেঁয়াজের বাইরের খোসাটা।

তারও ওপাশে—স্পেস। শূন্য শূন্য আর শূন্য। অপার শূন্য। কার্যত কৃত্রিম উপগ্রহের ন্যূনতম যে-নিচুতে আসার ক্ষমতা আছে অর্থাৎ মাটি থেকে ৯০ মাইল ওপরে—এর ওপর থেকেই স্পেস বলা হয়।

সূক্ষ্ম ভাগগুলি : ০ থেকে ৬০ মাইল—এয়ারস্পেস, ৬০ থেকে ৯০ মাইল এয়ারোপোজ, ৯০ থেকে ৪০০০ মাইল—নিয়ার স্পেস, ৪০০০ মাইলের ওপর—আউটার স্পেস ; চাঁদ মুখের এ পাশটা—সিসলুনার Cislunar স্পেস, সর্বদা

ওপাশে ফেরানো মুখের দিকটা—ট্রান্সলুনার Translunar স্পেস। এ সব সূক্ষ্ম বাছবিচার বিশেষ কাজে লাগে না। অনেক কিছুই জানতে পারা যায় নি—চারহাজার মাইলের ওপরের খবর। সেই তালুকের একটা খবরই জানা যায়। সেখানে রাজত্ব করে তিন গুণ্ডা। অতিমাত্রায় উঁচু তাপ, মহাজাগতিক রশ্মি, আর বিনি নোটিসে উল্কা বেগে ঝাঁপিয়ে পড়া উল্কা—এই, তিন ঠ্যাঙাড়ে থাকে সেখানে—

তাপমাত্রার ব্যাপারে, চার হাজার ৪০০০° ডিগ্রী ফারেনহীট তো missile-এর মধ্যেই জন্মাতে পারত। যদি অন্তরীক্ষেই বিকিরণ ( radiation ) হয়ে সেই তাপ নষ্ট না-হতো। কেলেঙ্কারীই হতো তা হলে।

এইখানে রং-এর রঙ্গ। রং-এয় বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা আছে। বর্ণ-বিদ্বেষের ব্যাপার। মিসাইল বা কৃত্রিম উপগ্রহ কখনও কালো রং-এর দেখেছেন? মিসাইলটির বাইরের গায়ে কালো রং করা হলে, তাপ বিকীর্ণ হতে পারে না। ফলে, মিসাইলটি ৪৫০° ডিগ্রী ফারেনহাইট অবধি গরম হয়ে যাবে। আর সাদা রং করা হলে? মিসাইলটির তাপ চলে যাবে জিরোর ১০০° ডিগ্রী তলায়। তার মানে আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যের মতো, সাদা কালো রং-য়ে উত্তাপের তারতম্য সাড়ে পাঁচশো ডিগ্রী। বাইরের গাত্র বর্ণের যদি অতি বেগনী ( Ultraviolet ) আলো সহ্য করার শক্তি থাকে, তাহলে মানুষ বওয়া মিসাইলের তাপাঙ্ক, মানুষের গায়ের চামড়ার সহ্য শক্তির আওতায় এনে ফেলা যায়। শুধু বাইরের রং-এর কারচুপি দ্বারাই এটা সম্ভব করা যায়। গায়ের রং সাদা কালোয় ভিতরের তাপ ৫৫০° ফাঃ তফাত করা যায়। সাদা হলে মাইনাস ১০০°, কালো হলে প্লাস ৪৫০° ফারেনহাইট।

মহাজাগতক বিকিরণ কিন্তু মিসাইলকে ভীষণ বিপদে ফেলে দেবে। পৃথিবীতে এমন কোন ধাতু বা পদার্থ নেই যা দিয়ে উড়ুকুটিকে তৈরী করলে মহাজাগতিক বিকিরণ তাকে জ্বালিয়ে, গালিয়ে, পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারবে না। বিকিরণের কাছে সব পদার্থই ভস্মযোগ্য।

আর সাবধান, উল্কাকে। আকাশে নিজের নিজের অদৃশ্য উপবৃত্তাকার রেলে সব গ্রহনক্ষত্রের গাড়ী নিজের পথে নির্ভুল চলেছে। লাইনচ্যুত হয় না। এ ওর ঘাড়ে বা ঘরে ঢুকে পড়ে না। টক্কর লাগে না। ডিরেলমেণ্ট নেই। কলিশন নেই। কিন্তু পাষণ্ড উল্কার তাল কাঁকুড় জ্ঞান নেই।

কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞানও নেই, যার তার পথে ঢুকে পড়ে মাতালের মতো। উল্কা আসে যেন অতি-দ্রুতগতি বুলেট। যদি ৩৫ থেকে ৫০ মাইল উঁচুতে বাতাসের ঘষা লেগে উল্কারা যেত, তা হলেই বিপদ হত। মিসাইল তো আরো অনেক উঁচু দিয়েই যাবে। ঐ ৩৫ থেকে ৫০ মাইল পার হবার সামান্য সময়টুকুতে উল্কার সাক্ষাৎকার খুব স্বাভাবিক নয়—এই যা।

## উচ্চমার্গে বিহার

নিয়ন্ত্রিত মিসাইলরা জন্মেছে অতি দ্রুত স্পীডের জন্মশর্ত নিয়ে। শত্রুরা টের পাবার আগেই সরে পড়া চাই। টের পেয়ে গেলেও তার পাল্টা ব্যবস্থা নেবার আগেই কেটে পড়া চাই। সেই জন্যই মিসাইলকে দ্রুতগতি হতেই হয়। কিন্তু অতি দ্রুতগতি মিসাইলের ওড়ার বিষয় আলোচনা করতে গেলে কতোগুলি শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। শব্দগুলি—শব্দ বিষয়ে। এক, শব্দের গতিওলা, দুই, শব্দাগ্রগামী গতিওলা, তিন, ম্যাক ( Mach ) সংখ্যা, চার, ধাক্কার চুনট ঢেউ ( Shock wave )।

শব্দ বা আওয়াজ—জিনিসটা কি? গ্যাস বা অনুরূপ তরল মাধ্যম যথা জলের ভিতর দিয়ে চাপের তারতম্য। যদি ক্ষুদ্র আলোড়ন জনিত চাপ-তারতম্য ঘটে তা হলে, সেই চাপ-তারতম্য জনিত ঢেউ, এক মাত্রায়ই থাকবে। এবং তার রীত চরিত্তির জানা বোঝা যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠে আওয়াজের গতি সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট। বলুন তো জলের মধ্যে শব্দের গতি কি রকম হবে? বাতাসের মধ্যের চেয়ে কম হবে, না, বেশী হবে? জলের মাধ্যমে শব্দের গতি সেকেণ্ডে ৪৭২০ ফুট। শব্দের গতি তো নির্ভর করবে মাধ্যমের সঙ্কোচন ক্ষমতা আর ঘনতার ওপর। হাওয়ার বেলায় শব্দের গতি তাপের ওপর নির্ভর করে। তাপ এই দুটি ধর্মকে সঙ্কোচন ক্ষমতা ও ঘনতাকে অতি মাত্রায় বদলে দেয়। কাজেই তাপের সঙ্গে শব্দের গতি অঙ্গাঙ্গী জড়িত। খুলে বলতে গেলে, য়্যাবসলিউট তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক ( Proportional ) হলো শব্দের গতি।

কোন গ্যাসকে শূন্য ডিগ্রীর নীচে সেন্টিগ্রেডে '−২৭৩°', ফরেনহীটে '−৪৫৯°' ঠাণ্ডায় নিয়ে গেলে গ্যাসটি নিরাবয়ব হয়ে যায়। এটিকেই য়্যাবসলিউট জিরো তাপমাত্রা বলা হয়।

এই হেতুই, খুব উঁচুতে যেখানে তাপমাত্রা খুব শীতল, সেখানে শব্দের গতিও কম।

এতে আমাদের দু'রকমের বিপদ বৃদ্ধি। যান্ত্রিক কানে আওয়াজ ধরা পড়তে পড়তে উড়ুক্কু বোমা অনেক এগিয়ে গেছে। আবার, ঐ উচ্চতায় বাধা বন্ধনহীন হওয়ায় মিসাইল এগিয়েও চলেছে দারুণ দ্রুত! ডবল বিপদ। একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব তার দোসর।

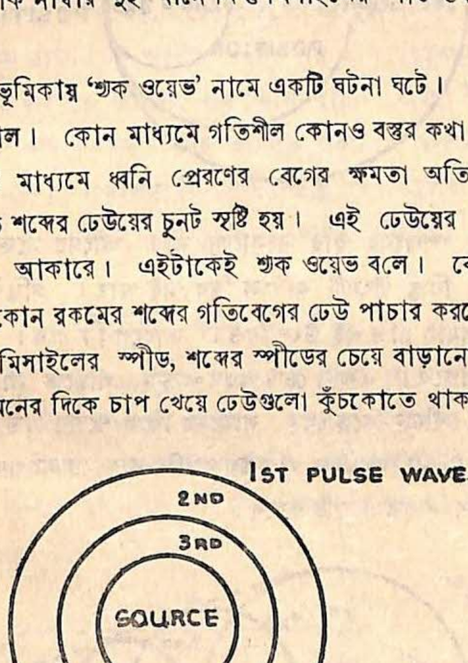
শব্দাগ্রগামী বা শব্দাতিগ ( **Supersonic** ) গতিবেগ, শব্দকে পিছনে ফেলে আগে দৌড়ায়। মানুষের শ্রবণ ক্ষমতা, সেকেণ্ডে ২০০০০ কম্পাঙ্কের শব্দ পর্যন্ত। শব্দাতিগ ( **Supersonic** ) শব্দের কম্পাঙ্ক এর অনেক বেশী, মানুষ শুনতে পায় না। শব্দাতিগ শব্দের গতিবেগ, হাওয়ার মাধ্যমে শব্দের গতিবেগের পাঁচগুণ পর্যন্ত হতে পারে। শব্দের পিছনে পড়া গতিওলা বা শব্দানুগ Subsonic speed-এর মিসাইলের, আর শব্দাগ্রগামী গতিবেগের মিসাইলের চারপাশের বায়ু চলাচলে আকাশ পাতাল ফারাক। শব্দের গতির চেয়ে ছয় থেকে দশগুণ বেশী স্পীডকে **হাইপারসোনিক** স্পীডও বলে। শব্দের গতিওলা বা শব্দসম অথবা কিছু বেশী গতি মিসাইলকে অনেক সময় **ট্রানসোনিক** স্পীড বলা হয়। অস্থার্থ যদিও মিসাইল নিজে হয়তো শব্দের গতির অল্প কিছু বেশী স্পীডে যাচ্ছে, কিন্তু মিসাইলের গায়ের চতুষ্পার্শ্বের গতি শব্দসম, শব্দানুগ বা শব্দাতিগ হয়ে আছে। এটি খুব বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এবং এই ট্রানসোনিক বা শব্দসম গতির অবস্থাটা শীগগীর কাটিয়ে উঠতে পারা চাই। ব্রিটিশ টেষ্ট পাইলট জন ডেরী এই ট্রানসোনিক গতিবেগের বিপদ কী, তা নিজের প্রাণ দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। একখানি 'ডি হ্যাভিল্যাণ্ড—১০০' জেট জঙ্গী বিমানে সওয়ারী ছিলেন তিনি। সোনিক স্পীডে বা, শব্দসম স্পীডে যাচ্ছিলেন। সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছিতে ঘণ্টায় ৭৬০ মাইল মতন হয় সোনিক স্পীড। লেজের এলিভেটার ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে ডানা ভেঙে পড়লেন। নামলেন নিরাপদেই। সে যাত্রা, ১৯৫২ সালের যাত্রায় তো বেঁচে গেলেন। আর একবার হাওয়াই খেল দেখাতে গিয়ে বেশ নিচু দিয়ে যেতে যেতে গোঁত্তা খেয়ে নামতে চাইলেন শব্দাগ্রগামী স্পডে। কিন্তু হায় শব্দসম স্পীড ছিল লেজের দিকে।* প্লেনের লেজ আর মুল বডি দু'টুকরো হয়ে ডেরী মারা গেলেন তৎক্ষণাৎ।

উড়ন্ত মিসাইলের জীবনযাত্রায় চলার পথে ম্যাক সংখ্যা **(mack number)** একটি অতি প্রয়োজনীয় তথ্য। যেই মাধ্যমে উড়ছে সেই মাধ্যমের তাৎক্ষণিক

* ডগায় ছিল শব্দাতিগ supersonicl লেজে ছিল শব্দানুগ subsonic speed।

তৎস্থানীয় শব্দের গতির সঙ্গে, মিসাইলের স্পীডের অনুপোত হলো তখনকার ম্যাক নাম্বার। আগেই বলেছি, স্থানীয় তাপমাত্রার সঙ্গে শব্দের গতির সম্পর্ক অতি আত্মীয়। মিসাইলকে কল্পনা করা যাক সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতায়। এবং সেখানকার উষ্ণ হাওয়ার মাধ্যমে, মিসাইলের ম্যাক নাম্বার ঘোষণা করা হলো 'দুই'। অর্থাৎ সেখানকার শব্দের স্পীড এর দুগুণ। এই ম্যাক নাম্বার দিয়েই মিসাইলের স্পীড বলা হয়। তার মানে মিসাইলের স্পীড তখন? ১৫২০ মাইল ঘণ্টায়! এই মিসাইল যখন উঁচুতে সঞ্চরণশীল, ধরুণ ৫০০০০ ফুট, সেখানে তাপমাত্রা অনেক কম, সেখানে ম্যাক নাম্বার 'দুই' মানে কিন্তু মিসাইলের স্পীড তখন ঘণ্টায় ১৩২০ মাইল মাত্র।

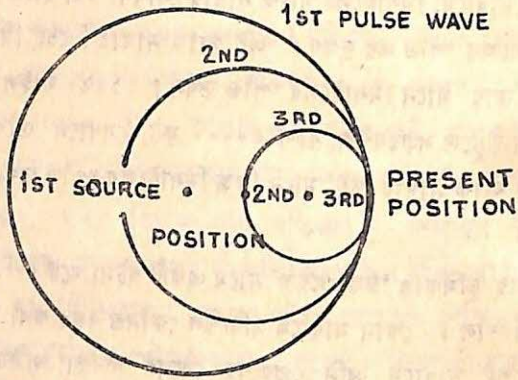
মিসাইলের ভূমিকায় 'শুক ওয়েভ' নামে একটি ঘটনা ঘটে। এর ধর্মের সঙ্গে পরিচয় থাকা ভাল। কোন মাধ্যমে গতিশীল কোনও বস্তুর কথা ভাবুন। তার বেগ যখন সেই মাধ্যমে ধ্বনি প্রেরণের বেগের ক্ষমতা অতিক্রম করে তখন সংকোচন জনিত শব্দের ঢেউয়ের চুনট সৃষ্টি হয়। এই ঢেউয়ের চুনট পাঞ্জাবীর হাতায় গিলের আকারে। এইটাকেই শুক ওয়েভ বলে। বোঝা কঠিন নয়। বেচারা মাধ্যম কোন রকমের শব্দের গতিবেগের ঢেউ পাচার করতে পারে। যদি তার মাধ্যমে মিসাইলের স্পীড, শব্দের স্পীডের চেয়ে বাড়ানো হয়। তাহলে কি হবে? সামনের দিকে চাপ খেয়ে ঢেউগুলো কুঁচকোতে থাকবে।* ধরা যাক



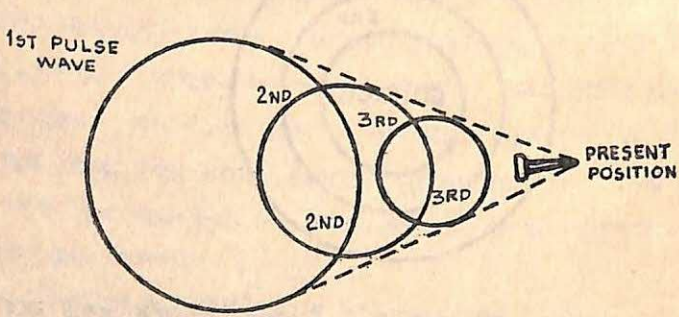

মাধ্যম হাওয়ার ছোট্ট একটি উৎস, নিয়মিত, সেকেণ্ডে একটি করে স্পন্দন উৎসারিত করে চলেছে। ধরুণ এই উৎসটি অবিচল অর্থাৎ অবস্থান পাল্টাচ্ছে

* সামনের ঢেউ সরে যাবার আগেই পরের ঢেউ তার ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়বে।

না। তা'হলে এর শব্দতরঙ্গ চতুর্দিকে চড়িয়ে পড়বে। এবং বর্তুলাকার হবে এর শব্দ তরঙ্গের চেহারা। একটির সঙ্গে পরের ঢেউটির দূরত্ব হবে ১১২০ ফুট, অর্থাৎ সেই হারে যে-হারে এক সেকেণ্ডে আওয়াজ যতোটা দূর পাড়ি দেয়।




ধরা যাক, স্পন্দনের হার বদলালো না। আগের মতো সেকেণ্ডে একটি করেই রইল। কিন্তু উৎসটি অবিচল স্থির নেই আর। গতিশীল। ডানদিকে যাচ্ছে, শব্দের সমান গতি এই উৎসটিরও। তাহলে কি হবে। ঢেউয়ের চেহারা বর্তুলাকারই থাকবে। একটা ঢেউ ১১২০ ফুট পৌঁছতে না পৌঁছতে বস্তুটি নিজেই সেখানে পৌঁছে গেছে যে! সামনের দিকে শব্দের ঢেউ জড়ো হয়ে যাবে, জড়িয়েও যাবে। ঐ বিন্দুটিতে গতিশীল বস্তুটির সামনের বহুগুণ বলীয়ান তরঙ্গ খুব জোর চাপের তারতম্য সৃষ্টি করবে।




এইবার মনে করুন উৎসটি শব্দের গতিবেগের চেয়ে দ্রুততর। বস্তুটির স্বসৃষ্ট প্রত্যেকটি শব্দ তরঙ্গ ছেদ করে করে যেতে হচ্ছে তাকে। এই ধ্বনি তরঙ্গগুলির

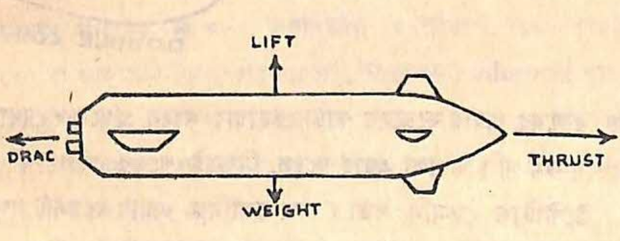
যুগ্মফল, একটি অগ্রগামী পুরোভাগের সৃষ্টি করবে। ছবিতে, ভাঙা লাইনে দেখানো হলো।

একটি মিসাইলের অগ্রগমন যে-হারে স্পন্দন সৃষ্টি করে তা সীমাহীন। আর মিসাইলের গতিপথ আওয়াজের যে আগাম বাজার খুলে বসে তাকেই শ্যক ওয়েভ বলে।

শ্যক শব্দটির প্রয়োগ এতো মানানসই যে একে অন্য শব্দ দিয়ে বদলানোই চলে না। কারণ মিসাইল চলাকালে হাওয়ার গতিবেগ ( Velocity ) ঘনতা, চাপ এবং তাপে এতো আকস্মিক, এতো দ্রুত, এতো হঠাৎ হঠাৎ পরিবর্তন ঘটতে থাকে, যেটাকে শ্যক ছাড়া কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। হাওয়া-সুড়ঙ্গ (wind tunnel) পরীক্ষায় এই শ্যক ওয়েভের ছবি তোলা যায়। অবস্থা বৈষম্য চোখেও দেখা যায়। এই শ্যক ওয়েভ এমনই প্রগলভ প্রকট। আসলে মিসাইল সৃষ্ট শ্যক ওয়েভ ত্রিমাত্রিক। শব্দাগ্রগামী মিসাইলের ছুঁচলো নাকের ডগাটি যে শ্যক ওয়েভের সৃষ্টি করে, তা পরিপূর্ণ মোচাকৃতি। মোটেই ত্রিভুজের মতো নয়।

## মিসাইল ওড়ে কি করে

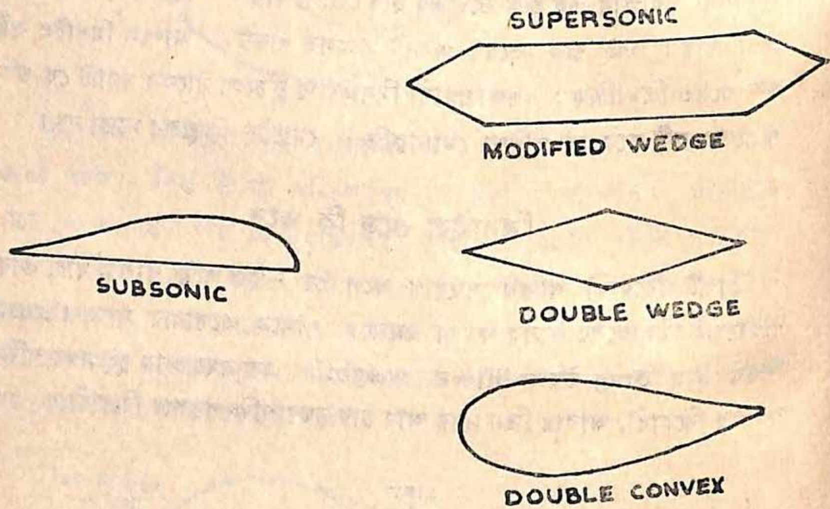
চারটি বিরোধী শক্তির সংযোগ ফলে যে সংহত শক্তি পাওয়া যায়, তার সাহায্যেই মিসাইলের ওড়ার ক্ষমতা জন্মায়। সামনে এগোবার ঘাত thrust পিছন টান drag উন্নয়ন lift ওজন weight। এক নম্বর আর দুই নম্বর শক্তি পরস্পর বিরোধী, আবার তিন নম্বর আর চার নম্বর শক্তি পরস্পর বিরোধী।




মিসাইলের ভিতরকার শক্তি উৎপাদক যন্ত্রের জোর যদি পিছু টানের চেয়ে বেশী হয়, মিসাইলের অগ্রগমনে বাধা কি? তেমনি উন্নয়নের জোর, ওজনের চেয়ে বেশী হলে উঁচুতে উঠবে। ভিতরের শক্তিউৎপাদকের ক্ষমতা নিচু টানের চেয়ে বেশী হলে উঁচুতে উঠবে। ভিতরের শক্তি-উৎপাদকের ক্ষমতা, পিছু টানের

চেয়ে জোরদার করা কঠিন হবে না। দেখা যাক ওপরে ওঠার ব্যাপারটা কি রকম?

এরোপ্লেনের ডানাকে এয়ার ফয়েল (airfoil) বলে। (চারপাশের হাওয়ার ওপর প্রতিক্রিয়ায় সক্ষম, বিশেষ গঠনে তৈরী এগুলি।) এয়ারফয়েলের সম্মুখ-ভাগের মুখ উঁচুর দিকে ভাঁজ করা থাকে (angle of attack—আক্রমণের কোণ, বলা হয়) হাওয়া তাহলে এয়ার ফয়েলের তলার চেয়েও ওপর দিয়ে বেশী জোরে বইবে। আবার গতিবেগ **Velocity** বেড়ে যাওয়ার মানেই ওপরের চাপ কমা, নিচের চাপ বৃদ্ধি। নিচের চাপ বৃদ্ধি পাওয়া মানেই মিসাইলটিকে ওপরে ঠেলে তোলার সাহায্য করা।




চার রকমের এয়ার ফয়েলের কাটা চেহারার আদল প্রস্থচ্ছেদ দেখানো হ'ল। শব্দের চেয়ে কম গতি ওয়ালা এয়ার ফয়েল, নিশ্চয়ই শব্দের অগ্রগামী মিসাইলে অচল। উল্টোটাও তেমনি সত্য। সাবসোনিক এয়ার ফয়েলটি লক্ষ্য করুন। লম্বালম্বি কাটা আধখানা লাউয়ের আকার, বোঁটার দিকটা পিছনে। মুখটা ভোঁতা, সামনের প্রান্তটি গোল করা। চেহারাটা দেখলেই অনুমান করা কঠিন হয় না, এর জন্ম হয়েছে ওপর দিকে হাওয়ার বেগ বৃদ্ধি করার জন্যই। এতে পিছুটানই বৃদ্ধি পাবে। সুপারসোনিক মিসাইলে সেই হেতু এই এয়ারফয়েল অচল।

সুপারসোনিক মিসাইলের এয়ারফয়েলের বৈশিষ্ট্যই হলো, প্রান্তগুলো তীক্ষ্ণ, পাতলা। তীক্ষ্ণ হবে, পাতলা হবে আবার এতোখানি হাওয়া ঠেলে যাবার মতন কঠিনও হবে—এমন ধাতু খুঁজে বের করাই তো এক সমস্যা। সামান্য পরিবর্তিত দুমুখো কীলক আকৃতিটি সুপারসোনিক-এর পক্ষে বেশী উপযোগী। এতে পিছু টান কম। কঠিনতার কমতি হয় না। তৈরী করাও সোজা।

বাহ্যিক আকারে এয়ারফয়েলের চেহারার বিস্তর তারতম্য হতে পারে। আয়তাকার ( rectangular ), ব-দ্বীপাকার ( Delta shaped ) পেছনে মোড়া ( swept back ) গোলাকার ( circular )। ইত্যাকার ইত্যাদি।

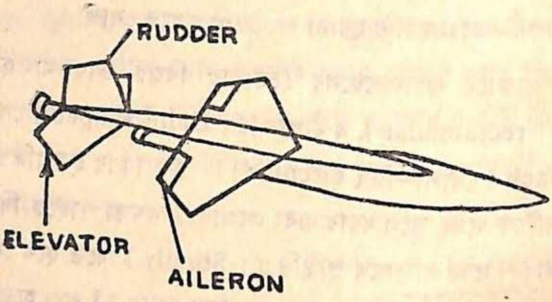
মিসাইলটিকে যথেষ্ট তুলে ধরার এবং এগোবার ক্ষমতা পাইয়ে দিলেই কর্তব্য শেষ হলো না। তার গতিপথে সুস্থিতিও ( Stabily ) দিতে হবে বৈকি ! কোন কারণে ভারসাম্য আপনি নষ্ট হলে, বা, প্রয়োজন বোধে নষ্ট করা হলে মিসাইলকে আবার সুস্থিতি ফিরে পেতে হবে। সে ব্যবস্থাও অবশ্য করণীয়। মিসাইলের যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে মিসাইল নিজেই গতিপথের সুস্থিতি নষ্ট করে ফেলতে পারে। অথবা অন্য কোন অদৃষ্টপূর্ব বা অপ্রতিরোধ্য কারণে এই সাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাকে "পিচ", "ইঅ", "রোল" এই তিন সম্ভাব্য ব্যাধি মুক্ত রাখতে হবে। হঠাৎ এই ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিলে মিসাইলের মধ্যে এমন কারিকুরি থাকা চাই, যাতে পুনরায় সে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারে। আবার, এমনও না-হয়, প্রয়োজন হলেও তাকে শুয়োরের গোঁ ছাড়ানো যাচ্ছে না। "মাথায় লাঠি মারলেও বেঁকে না, রয় খাড়া"—এও চাইনা।

ডানার বাইরের আকার, উপরিভাগ ও পৃষ্ঠদেশ—যথা, রাডার rudder ( নৌকো বা জাহাজের হাল ) elevator ( উত্তোলক ) aileron ( পার্শ্ব পরিবর্তক ) এই তিনটি প্রত্যঙ্গ মিসাইলকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। রাডারের ডান বা বাঁ-মোড় মিসাইলকে ডান-দিকে বা বাঁ-দিকে ঘোরাপ। এলিভেটারকে তুললে, নামালে মিসাইল উঠবে নামবে।

লক্ষ্য করুন এইলিরন হ'ল ডানার মধ্যে কব্জাওয়ালা ছোট ডানা। এইলিরনের এই ছোট ডানাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

এইলিরনের প্রধান ব্যবহার মিসাইলকে গড়াগড়ি খাওয়ানো। দুপাশের দুটিকে উল্টো দিকে ঘোরালে ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। আর তাতেই মিসাইল মাতালের মতো আকাশের ধুলোয় গড়াগড়ি খায়। এই রকম নানা আকার

প্রকারের সমন্বয় সম্ভব। কিন্তু অতো জটিলতায় না গিয়ে যতোটা বাহুল্যবর্জিত রাখা যায়। খরচ কমের দিক থেকে, পরিচালনার সৌকর্যের দিক থেকে, জটিলতা ও বাহুল্য বর্জিত রাখাই বাঞ্ছনীয়। হয়েও থাকে তাই।




মিসাইলের গতিবিজ্ঞান আলোচনা তার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ অঙ্কশাস্ত্রের অতি উঁচু তলার ব্যাপার। আর কাগজে হিসেব কখনও, কোনদিন নির্ভুল হয় না। যতোদিন না তার পাশাপাশি হাতে কলমে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। হাতে কলমে পরীক্ষা না হলে বস্তুজগতে চলাকালে বাস্তবিক অসুবিধা, অন্তরায়, অসম্ভাব্যতা ধরা পড়ে না। নির্মাণের প্রক্রিয়ায় অসুবিধা বা অসম্ভাব্যতাও ধরা পড়ে না। একমাত্র অনুশীলন দ্বারাই তা সম্ভব। সাড়ে পাঁচ ফুট মানুষকে বামন হয়ে আড়াই লক্ষ মাইল দূরের চাঁদে হাত দিতে গেলে ১১ তলা থেকে ২০ তলা প্রমাণ উঁচু রকেট দরকার। এটাকে বানাতে হবে তো। হিসেব করে বলা সম্ভব। ছবি এঁকে গঠন, আকার, মাপ জোকও বলে দেওয়া গেল। কিন্তু এই ঢাউস ব্যাপারটাকে তৈরী করা কি মুখের কথা? শুধুই কি দাঁড় করানো আর তৈরী করা! নাড়াচাড়া করা! তার ভুল ভ্রান্তি—একমাত্র হাতে কলমে পরীক্ষায়ই ধরা পড়তে পারে। কাগজের হিসেবই যদি অকাট্য হতো, তাহলে ব্রিটিশ টেস্ট পাইলট জন ডেরীর ডি-হ্যাভিল্যাণ্ডের মতো নাম করা প্লেন, কাগজেরই মতন ছিঁড়ে দু টুকরো হয় কেন? এতোবার সাফল্যের পরও, এতো অভিজ্ঞতা জমা হবার পরও লেঃ কঃ জর্জি টিমোফেইয়েভিচ জেব্রোভেশিস্কি, ভল্ডিস্লাভ নিকোলায়েভিচ ভোলকোভ, ভিক্টর ওভানোভিচ পাৎসাইয়েভ ৩০শে জুন '৭১ তারিখে ধমনী শিরার রক্ত জমাট বেঁধে আকাশের নীলিমার

কোল থেকে 'স্টিল বর্ণ' হয়ে মৃত ভূমিষ্ঠ হ'তেন না। কাগজের হিসেবের লোহার বাসর ঘরে, কোথাও না কোথাও ছিদ্র থেকে যায়।

কিন্তু মিসাইলের বেলায় হাতে নাতের পরীক্ষার সুযোগও নেই।

মিসাইল নির্জন। নির্মানব। মানুষের হাত পা নাক মুখ চোখ হৃদপিণ্ড, ব্রেন কিচ্ছু উপস্থিত নেই সেখানে। "শেষ কথা কে বলবে?" কি হলো, কি হলো না—কি হওয়া উচিত ছিল, মিসাইল বোবা। মিসাইল ফিরে আসে না। হাত ছাড়া হয়ে গেলে "চলে সে যায় আর, আসে না ফিরে।" মৃত্যুকালে, কিম্বা জীবন যাত্রা কালে, তার যন্ত্র হৃদয়, যন্ত্র ফুসফুস, ফিসফিস করে মৃত্যুকালীর জবানবন্দী কিছু পাঠিয়ে যায় পৃথিবীতে। সয়ুজ-১১ সে-সুযোগও পায় নি। এতো আকস্মিক সে নিদারুণ মৃত্যু।

মিসাইলের জন্মই মৃত্যুর জন্য। অবশ্য মানুষ পশু কীটপতঙ্গেরও তা-ই। তবু অন্য সকলের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই পথটা—যাকে জীবন বলে, তার একটু স্থিতি আছে। কিন্তু মিসাইলের জীবন কয়েক মিনিট মাত্র। এরই মধ্যে তার যন্ত্র হৃদয় থেকে রেডিও মাধ্যমে (একে টেলিমিটারিং বলে) কিছু কারিগরি খবর—এবং মৃত্যুর মুহূর্তে প্যারাস্যুট যোগে ক্যামেরার চোখে, ও অন্যান্য যন্ত্রযোগেও কিছু জবানবন্দী পাওয়া যায়। অনেক সময় কিছু যন্ত্র, মিসাইলের মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়েও ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। কঠিন কূর্ম পৃষ্ঠ আবরণে পুরে দেওয়া হয় এগুলিকে। মিসাইল ধ্বংস হলেও এই সব লগ, রেকর্ড, চার্ট ধ্বংস হয় না। ফেরত পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে সাবধান হবার রাস্তা বাতলে দেয়—

মিসাইলে পঞ্চেন্দ্রিয় সম্পন্ন মানুষ থাকে না। চক্ষু কর্ণ এই দু'টি ইন্দ্রিয়ের কাজ চালায় যন্ত্র নির্মিত ইন্দ্রিয়েরা—

"হাওয়া-সুড়ঙ্গ টেস্টেও মিসাইল সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান খানিকটা সম্ভব। তাতে একটি মিসাইলকে পাঠিয়ে খরচের খাতায় ফেলার দরকার করে না। কিন্তু এই পরীক্ষাতে এতো উঁচু ম্যাক সংখ্যা দরকার এবং সেই ম্যাক সংখ্যা তৈরীর যা ঝঞ্ঝাট ও খরচ তা কিছুতেই পোষায় না।

মিসাইল একবারই মাত্র ওড়ে।

# তৃতীয় অধ্যায়

## সুপরিচালিত ও পথভ্রষ্ট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নতুন করে রকেট এনে ফেলল রণাঙ্গনে। এগুলি অবশ্যই পরিচালিত বা guided ছিল না। কামানের গোলার মতন ছুড়ে ফেলা হতো। কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য ছিল অনেক। রকেটগুলি গোলার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি, অনেক কম মেহনতে ছোঁড়া যেত। পিছু ধাক্কা recoil ছিল না, কামানের গোলার যেটা ছিল প্রচুর। প্রক্ষেপ্যটির ওজন যতো বেশী, পিছু ধাক্কা বা রিকয়েলও তো ততো বেশী হবে। সামান্য রাইফেলেও রিকয়েল বা এই পিছু ধাক্কার ঠেলা সামান্য নয়। রাইফেল ছুঁড়তে গিয়ে বেকায়দা লেগে 'কলার বোন', বা কণ্ঠার হাড় দু টুকরো হয়ে গেছে কতো লোকের। সামান্য মরটার, বা ছোট কামানের তলাকার প্লেট না থাকলে! রিকয়েলের পিছু ধাক্কা লেগে মরটার নিজেই মাটিতে পুঁতে যায় কয়েক ইঞ্চি। তাহলে ভিক্টোরিয়া যুদ্ধ জাহাজের ১১০½ টন—৩০০০ মন—ওজনের কামানের ১৮০০ পাউণ্ড সাড়ে বাইশ মণ ওজনের গোলা ফায়ার করার রিকয়েল কতো ফুট হওয়া দরকার। রকেট সম পরিমাণ বিস্ফোরকবাহী গোলার চেয়ে অনেক হাল্কা, তার রিকয়েলও তাই গোলার তুলনায় নাম মাত্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রকেট ফিরে এল, কিন্তু কলকে পেল না। কারণ, গোলার তুলনায় তার নির্ভুল লক্ষ্যে পৌছনর ক্ষমতা বা accuracy অনেক কম। কামানের গোলা ছুঁড়তে নলের মুখে যে চরম গতিবেগ maximum muzzle velocity এবং যে সুস্থিতি বা stability পাওয়া যায়, রকেটে তা অনুপস্থিত। গতিপথ এবং গতিবেগ গোলার ক্ষেত্রে হিসেবের জিনিস। সঠিক বলে দেওয়া যায় গোলাটি কোথায় গিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে, বা জমবে। পক্ষান্তরে জেট চালিত প্রাস (projectile) যাত্রা সুরুই করে সামান্য গতিবেগ নিয়ে। লক্ষ্যে পৌছনর নির্ভুলতা প্রায় নেই-ই। আর গতিপথের গ্যারান্টি? নেই-ই। কাজেই ব্যবহারকারীর পক্ষে অপদার্থই নয় রকেট, বিপজ্জনকও ছিল। গতিপথের লক্ষ্য হারিয়ে এঁকে বেঁকে নিজের এলাকাতেই পড়েছে। নিজের সৈন্য ছাউনির ওপর পড়ে দু একবার সেম সাইড করার পর, রকেট ব্যবহার বন্ধ হ'ল। অন্তত, ঐ আকারে ঐ প্রকারে।

জেট পরিচালিত মিসাইলকে সুপরিচালিত হতেই হবে। ধরুন, লক্ষ্যবস্তু স্থির না হয়ে চলমান। মিসাইলটি ছাড়ার পরও নিশানা গতিশীল। চলছে। চলমান নিশানাকে ধরে ফেলার জন্য মিসাইলকে আকাশপথেই গতি পরিবর্তন করে নিতে হবে। তা ছাড়া, হাওয়া, মহাশূন্য, জল যে মাধ্যমেই মিসাইল চলুক, অদৃষ্টপূর্ব উটকো প্রাকৃতিক বাধা এসে জোটা কিছু আশ্চর্য নয়। এইসব বাধা, মিসাইলকে তার বেঁধে-দেওয়া গতি পথ থেকে বিচ্যুত করতে সর্বদাই আগ্রহী। এই প্রাকৃতিক উটকো, হঠাৎ-এসে-জোটা, দুর্যোগও মিসাইলকে নিজগুণে চলতে থাকা কালেই কাটিয়ে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এরোপ্লেনের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

ওরে যন্ত্রের পাখী ওরে রে আগুনখাকী  
এ-কী ডানা মেলি, আকাশেতে এলি  
কোন নামে তোরে ডাকি ?

কিন্তু রকেট, মিসাইলকে ইংরিজিতে ইস্পাত পালকের অগ্নি বিহঙ্গও ( Steel feathered fire birds ) বলা হয়।

এদের নিয়মন করা যাবে কি করে। ওরা ওড়ে উড়ুক ক্ষতি নেই। না দেখা লাগাম পরাতে হবে, বলগা লাগাতে হবে, জিন পরাতে হবে, রেকাব চাই না-দেখা ঘোড় সওয়ারের জন্য। এ আবার অশ্বরাজ নয়, রূপকথার পক্ষীরাজ। মাটিতে ঘোড়ার ডাইনে বাঁয়ে চললেই হলো। কদমে বা দুলকি চালে বা অন্য কোন চালে চলতে, বেচাল না-হলেই হলো। কিন্তু আকাশেব নভশ্চর পক্ষীরাজের এপাশে ওপাশে, ডাইনে বাঁয়ে তো আছে-ই। সব চেয়ে বড়ো কথা, ওপর নিচে আছে। বরং সেইটেই আসল।

তিনটে সমতলে বা 'প্লেন'-এ এয়ারপ্লেন, রকেট, মিসাইলের গতিবিধি। সেইজন্যেই দুটি অতি জটিল কর্তব্য তার সম্পর্কে আমাদের রয়েছে।

প্রথম, মিসাইলটিকে আমাদের পথ নির্দেশ দিতে হবে। তার বিক্ষেপ মার্গ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। বিক্ষেপ মার্গে বাধা বন্ধ থাকলে সেগুলো উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা দিয়ে, তাকে তার সাধনোচিত ধামে পৌছতে দিতে হবে। সওয়ারী থাকবে না। সওয়ারী যা থাকবে, সে কতোগুলি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। মিসাইলটিকে আদর্শ পথে পাঠাতে হবে। নিশানার থেকে দূরত্ব, ওড়ার পথ, ওড়ার গতি ঠিক দিতে হবে। কোন দিকে কতটা গিয়ে কোন বিদিক ধরে আবার কতোটা

পশ্চিম। এই তো গেল দিগদিশারী হুকুম। গতিবেগটা বদলের বিশেষ প্রয়োজন পড়ে না। ওটা ঘাড়ভাঙা স্পীডেই চলতে থাকে। স্পীড কমাবার বাড়াবার প্রয়োজন কমই হয়।

দ্বিতীয়, মিসাইলটির মর্জি মেজাজ বা য়্যাটিটিউড রাখতে হবে যন্ত্রের মুঠোয়। সেটি যেন নিশানা মুখো থাকে সর্বদা। পুচ্ছটি যেন উল্লম্ব থাকে। উর্ধ্বাধ বজায় রাখে সত্যি সত্যি। এবং মিসাইলের ডান বাঁ জ্ঞান, উঁচু নিচু ভেদ-এর জ্ঞানের নাড়ি যেন টনটনে থাকে।…মজা কি জানেন, ধরুন ভুল করে মিসাইলটি কোন কারণে ডান দিকে গড়িয়ে আছে। সেই সময়, ভিতরকার যন্ত্র তাকে হুকুম দিল "রাইঠ ঠা-র-র-ন"। দারুণ বিপত্তি হবে কিন্তু' সে খাড়া নাকটি মাটি মুখী করে, সোজা ডুব মারবে। সে মনে করবে, তার শত্রুর মৃত্যুর তথা তার নিজেরও শিয়রে শমন এসে গেছে। এইবার মারো ঝাঁপ!

নিক্ষেপ মার্গ নিয়ন্ত্রণ (**Trajectory Control**) দুরকমের সম্ভব। এক স্বয়ম্ভব অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, দুই পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম প্রণালী ( **preset system** )।

আকাশে উড়িয়ে দেবার আগে মিসাইলের বিভাগীয় বিভিন্ন যন্ত্রের কানে মন্ত্র পড়ে দেওয়া হয়। যেমন দেঁয়া হয় জলের তলার টর্পেডোকে। বায়ুমণ্ডলে এতো হাজার ফুট ওপরে উঠবে—এলিভেটরকে দেয়া হলো এই গুপ্ত মন্ত্র শিখিয়ে। প্লেনের পিছনে দুপাশে-মেলা সঞ্চালনযোগ্য, কব্জা আঁটা ডানা। এগুলি খেলিয়ে প্লেন ওপরে ওঠে, নিচে নামে। এরা এলিভেটর। আমার দরকার ধরুন ৪০০০০ ফুট দিয়ে যাওয়া। তার ওপর না যাওয়া। অল্টিমীটার নির্দেশ দিল এলিভেটরকে। আর ওপরে উঠো না। এই ধরনের মন্ত্রের মন্ত্রণা।

এই ধরনের প্রোগ্রাম কণ্ট্রোল বড়ো বড়ো কল কারখানাতেও আছে। স্বয়ংক্রিয় মেশিন, জটিল মেশিন, অপারেটার ছাড়া আপনিই দশ বারো পনেরো রকমের ক্রিয়া সম্পন্ন করে। অপারেটার থাকে না।

প্রোগ্রাম কনট্রোল না হলেও এই ধরনের ছোটখাটো ব্যাপার তো আমাদের বাড়িতেই আছে। এলার্ম ঘড়ি। রিষ্টওয়াচের তারিখ এবং বার বদলানো। দেয়াল ঘড়ির ঘণ্টা বাজা।

এক্সিলারোমিটার হুকুম করবে মোটরকে। দশ মাইল পঞ্চাশ গজ গিয়ে মোটর বন্ধ হয়ে যাবে। রোশেনারার মতো বুকে মাইন তো বাঁধাই আছে। হুকুম হবে এইবার ঝাঁপ খাও। ইত্যাদি।

আবহাওয়া, বায়ুর গতি, বায়ুচাপ, তাপ ইত্যাদি জেনে নিয়ে হিসেব করে প্রোগ্রাম তৈরী করা হয়।

এই হলো প্রিসেট সিস্টেম।

ইলেকট্রনিক্স তথা কমপিউটারের প্রসার হওয়ার আগে পর্যন্ত মিসাইল ছিল স্বনিয়ন্ত্রিত। মিসাইলের ভিতরের যন্ত্রপাতি প্রোগ্রাম কনট্রোলে বেঁধে দেয়া হ'ত। মিসাইলের চাল চলন ভিতরের সেই যন্ত্রপাতিই কনট্রোল করত। ওড়ার আগে যে প্রোগ্রাম পুরে দেওয়া হ'ত, মিসাইলের তার বাইরে যাবার উপায় ছিল না।

একবার ছেড়ে দেওয়া হলে সে আর কারো ভৃত্য নয়। তখন সে অন্ধ। বোবা। কালা। আর কারো হাত নেই তার ওপর। সেটিকে আর বাইরে থেকে আমরা হুকুম করতে পারবো না।

মাটি থেকে বা মিসাইলের বাইরে থেকে কোনো হুকুম মানার ব্যবস্থা, প্রি-সেট সিস্টেমে ছিল না।

জারমানীর ভি-২ রকেটে, সময়-নির্দেশক নিয়ন্তা যন্ত্র ছিল। প্রথম চার সেকেণ্ড খাড়া ওপরে ওঠার যন্ত্র চালু থাকবে। তারপর ৪৭ ডিগ্রী কোনাকুনি এতোটা রাস্তা গিয়ে মোটর বন্ধ হবে। অগ্রগমন বন্ধ। তারপর, ধপাস। অদৃষ্টপূর্ব জোর হাওয়া পিছন থেকে ঠেলে খানিকটা এগিয়ে দিলে। তার ওপর ভি-২'র কোন হাত ছিল না। সেটুকু শুধরে নিতে পারতো না। নিশানা ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতো। গিয়ে বেজায়গায় মুখ থুবড়ে পড়তো।

জলের টর্পেডোও ছিল এই রকম পূর্ব নির্দিষ্ট পথ-বেঁধে-দেয়া মিসাইল। ছাড়ার আগে পঞ্চাশবার হিসেব করুন। হাত ছাড়া করে হায় হায় করবেন না। টর্পেডোর ছিল শুয়োরের গোঁ। টিউব থেকে ছোঁড়ো। যতোদূর যেতে বলো যাবে। অবশ্য তার 'দম' অফুরন্ত নয় নিশ্চয়ই।

কুমীর অনেক দূর থেকে তাক করে। দুটি চোখের পেরিস্কোপ দুটি, জলের ওপরে তুলে শিকারের দূরত্ব মেপে নেয়। তারপর ডুব মারে। একেবারে নির্ভুল লক্ষ্য। ঠিক জায়গার পৌছে খিলেন দাঁতে শিকারের পা-টি কামড়ে ধরে।

কিন্তু ইত্যবসরে শিকার যদি ন'ড়ে চ'ড়ে সরে গিয়ে থাকে, কুমীর সেটুকু শুধরে নিতে পারে না।

টর্পেডোও পারতো না। বেঁধে দেয়া দূরত্বে পৌছে এক নম্বর সেফটি-পাখাটি খুলে যাবে। ঘোড়াকলটি অনাবৃত করে দেবে। লক্ষ্যে ধাক্কা লাগা

মাত্র দু নম্বর সেফটি-পিনটি ভেঙে যাবে। পিন ভেঙে গেলে এক নম্বর চার্জ-এ বিস্ফোরণ। চোখের পলকে দ্বিতীয় এবং আসল-দু নম্বর বিস্ফোরণ।

হুকুম-পুরে-দেওয়া পূর্ব নির্ধারিত প্রণালী অনাড়ম্বর, সরল। কম খরচের ব্যবস্থা, অতি মাত্রায় বশংবদ।

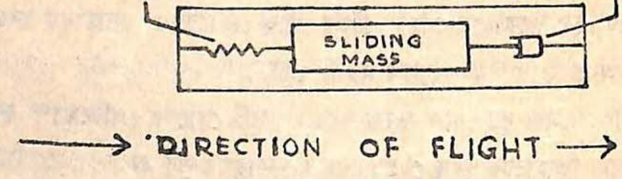
কিন্তু সব সময় তো লক্ষ্য বস্তু অচল নয়, অচল থাকে না। তখন এই সিস্টেমই অচল যে!

নিয়ন্ত্রিত বা গাইডেড মিসাইলকে আজ মাটি থেকে বসে কনট্রোল করা হয়। ইলেকট্রনিক্স, কমপিউটার, টিভি ট্রান্সমিটারে তার "মগজ" বোঝাই। গ্রাউণ্ড কনট্রোল থেকে তার পথ পরিবর্তন করানো যায়, ঝুল কাটানো যায় তাকে দিয়ে। গ্রাউণ্ড কনট্রোলে টি ভি স্ক্রিনে তার চলা, অগ্রগমনের মাত্রা, প্রতিনিয়ত ধরা পড়ছে যে।

## ইনারশিয়াল গাইডেন্স

এরোপ্লেনে এক রকমের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে, যার স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি এরোপ্লেনের মধ্যেই থাকে। এবং তদবস্থ নীতি মেনে ( inertia )। জড়তা বা ইনার্শিয়া কী ?

কোন জিনিস যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থা বজায় রাখা। চলতে থাকলে গতিশীলতা অবিচল থাকলে অচলাবস্থা বজায় রাখা। বস্তুপিণ্ডের যে ধর্ম তত্তৎ অবস্থা বজায় রাখতে চায়—তাকে ইনারশিয়া বলে।




মনে করুন, আকস্মিক, অকল্পিত একটি জোর বাতাস পিছন থেকে ধাক্কা দিল মিসাইলটিকে। এটি, এই জোর বাতাসের ধাক্কাটি, ছিল হিসেবের বাইরে। তাহলে নিশানার দিকে সেই পরিমাণই মিসাইলটি এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারে। তা তাকে দেয়া হবে না।

ইনারশিয়াল গাইডেন্স ধরুন একটা বিশুদ্ধ যান্ত্রিক উপায়। যা আগু পিছু হতে পারে। এতে কমপিউটার বা ইলেকট্রনিকসের ব্যাপার নেই। ইনারশিয়া মানে জাড্য। চলতে থাকলে চলতে থাকা থেমে থাকলে থেমে থাকা—এর পরিবর্তন চায় না ইনারশিয়া। ইনারশিয়াল গাইডেন্স-এর মূলনীতি এই রকম: একটি আয়তাকার ওজনদার লোহার তাল, দুপাশে দুটি 'ইউ' শেপ লোহার মধ্যে ধরা আছে। লোহার তালটি অবলীলায় লোহার নালীর মধ্যে যাতায়াত করতে পারে। দুদিকে সমান টেনশনের জাঁদরেল দুটি স্প্রিং লোহার তালটিকে ঠিক মধ্যিখানে ধরে রেখেছে। সামনে থেকে জোর বাতাসের ধাক্কা খেলে, লোহার তালটি সাময়িকভাবে পিছনে সরে আসবে। সামনের স্প্রিং প্রসারিত এবং পিছনের স্প্রিং সঙ্কুচিত হবে। এবং স্প্রিং-এর ধর্ম অনুযায়ী তখনই দুটি স্প্রিংই নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। সাময়িকভাবে যতোটা সরে এসেছিল ততোটাই পিছনকারী স্প্রিংয়ে চাপ পড়েছিল। এই চাপটি মিসাইলের অকস্মাৎ অগ্রগমনের ত্বরণের ( acceleration ) সমানুপাতিক। এই ত্বরণের পরিমাণটি অঙ্কের সাহায্যে, ( মিসাইলটি এই ধাক্কার চোটে কতোটা এগুলো, ঐ ত্বরণের পরিমাণ থেকে স্বয়ংক্রিয় অঙ্ক কষে তা ) সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়বে। এই অতিরিক্ত এগিয়ে যাওয়ার ক্ষতি পূরণ সম্ভব। মিসাইলটির চলা আপনি আস্তে করে দেবে। কিম্বা, ঐ পরিমাণ সময় আগে, চলা থামিয়ে দেবে এবং ঝাঁপ দেবে। কিম্বা ঐ পরিমাণ সময় লাগবে। মোটরটি বন্ধ করে দেবে।

য়্যাক্সিলারোমিটার, য়্যাক্সিলারেশন বা ত্বরণ তো মাপে-ই। মাপে, তিনটি আলাদা দিকে তিনটি য়্যাক্সিলারোমিটারের সমন্বয় সাধন ক'রে। উপরন্তু ঐ একই যন্ত্র মিসাইলের গমন পথের দূরত্ব, বা নিশানার পথে কতো দূর এগোল সেই দূরত্বও বলে দেয়। য়্যাক্সিলারোমিটার আরও বলে দেয়, গমন পথের লাইন থেকে বে-লাইনে পাশাপাশি বা ওপরে নিচে সরে গেছে কিনা। গেলে কতোটা গেছে, তাও বলে দেয়।

মিসাইলের মধ্যে রাখা ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে মনুষ্যহীন মিসাইল এই খবরগুলির সমন্বয় ঘটিয়ে, নিয়ন্ত্রণকারী স্টেশনকে পাঠাবে। এই পদ্ধতিটিও, পূর্ব নির্দিষ্ট ( প্রি-সেট ) পদ্ধতিটির মতনই মিসাইলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এই পর্যন্ত বাইরের কোন সিগনাল বা ইঙ্গিতের প্রয়োজন হয় না। সে ধারও সে ধারে না। এর পরিপন্থী কোন উপায় অবলম্বনের সুযোগও কারো নেই।

কিন্তু এই সিস্টেম বড় জটিল, খরচ এতে প্রচুর। এর কর্মসম্পাদনও ত্রুটি সাপেক্ষ। এতে মিসাইলের কম্পন তাড়াতাড়ি লাঘব করে ফেলতে, কম্পন-হ্রাসকারী ডাম্পার ব্যবহার করতে হয়। পক্ষান্তরে ডাম্পারের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে য়্যাক্সিলারোমিটারকে ঘন ঘন দিক পরিবর্তন করতে হয়। ফলে সংবেদনগ্রাহিতা ( sensitivity ) ক্ষুণ্ণ হয়।

**প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু—( Natural phenomenon-এর ) নিরিখে।**

আমরা যদি নিশানার অবস্থান, স্থলের বা অন্তরীক্ষের কোন পটভূমিতে ধরতে পারি, তাহলে মিসাইলকেও দূর-হুকুমে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারব।

জার্মান ভি-১ মিসাইল, এর উদাহরণ। এই মিসাইল (১) চৌম্বক ক্ষেত্রের (২) উচ্চতার (৩) দূরত্বের পরিমাণের সমন্বয় কাজে লাগিয়েছিল। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের নিরিখে আমরা মিসাইলের মধ্যে চুম্বক শলাকা নির্দেশককে কাজে লাগাতে পারি। পৃথিবীর প্রতি চুম্বক নির্দেশকের আকর্ষণের পরিমাণ কাজে লাগাতে পারি।

প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর নিরিখে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি খুব কার্যকরী হয়নি।

উচ্চতার ওপর বায়ুর চাপ নির্ভর করে। একই উচ্চতায় দুরকম বায়ুর চাপ হয় না।

উচ্চতা বৃদ্ধিতে বা হ্রাসে বায়ুর চাপের তারতম্য ঘটে। এই মৌলিক তথ্য কাজে লাগিয়ে মিসাইলকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় রেখে পরিচালিত করা হয়। অনুরূপ, জলের চাপ। জলের চাপ জলের গভীরতা নির্দেশ করে। চাপের মাপই নির্দিষ্ট গভীরতায় মিসাইলকে চালিয়ে নেবে। সামান্য একটি (.) উচ্চতা মাপার অলটিমিটার এবং (২) একটি বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্র—নিয়ামক যন্ত্রপাতিতে যুক্ত করলেই হলো। জারমানরা তাদের ভি-১'কে ৩০০০ থেকে ৫০০০ ফুটের মধ্যে ওড়াতে এই উচ্চতা বনাম বায়ুর চাপকে কাজে লাগিয়েছিল।

নিশানার দিকে কতোটা এগোল, সেই দূরত্ব হাওয়া চালিত পাখার সাহায্যেও করা হয়ে থাকে। পাখার পাকের সংখ্যা দিয়ে দূরত্ব নিরূপণ তো যেমন সহজ তেমনি পুরনো। জলের বেলায়ও ঐ একই উপায়। অভিপ্রেত

দূরত্বে পৌঁছবার পর মিসাইলটিকে ঝাঁপ দেওয়ানো, পাশে ঘোরানো, বিস্ফোরণ ঘটানো, আরো অন্য কাজ করানো যেতে পারে। ভি-১ কে স্ক্রুয়ের প্যাঁচের মতো পাক মারতে মারতে লক্ষ্য বস্তুর ওপর ফেলা হয়েছিল।

## আকাশের ঠিকানা

জলের জাহাজে যেমন, উড়ো জাহাজেও তেমনই। নক্ষত্র বা তারার অবস্থান দেখে নিজের অবস্থান বোঝা যায়। মিসাইল সেটি পারে আপনা আপনি। মিসাইলের মধ্যে কোন বিশেষ নক্ষত্রকে লক্ষ্য রাখে দূরবীণ। অন্য নক্ষত্রের নিরিখে নিজের অবস্থান আপনি বুঝে নেয়। মিসাইলের বুকের ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এই তারকামণ্ডলের অবস্থানের প্রয়োজনীয় ভাষ্য নিজেই তৈরী করে নিতে পারে। এবং নিয়ন্ত্রণকারীকে তদনুরূপ সিগনাল বা সঙ্কেতও পাঠাতে পারে। যাতে মিসাইল দিঙমূঢ় হয়ে না যায়।

সবটাই কম্পিউটারের ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক করে কম্মে দেয়। নিশানা পৌঁছল, ঝাঁপ দাও—ইত্যাদি ইত্যাদি।

## তড়িৎ চৌম্বক নিয়ন্ত্রণ

চার রকমের তড়িৎ চুম্বককে কাজে লাগানো হয়ঃ

এক, দূর নিয়ন্ত্রণ ( remote control ), দুই, বেতার-নৌবাহ বিজ্ঞান ( radio navigation ), তিন, তেজ-রশ্মির হুকুমত ( energy beam slave ) এবং চার, নিশানা সন্ধানী ( target seeking )।

## দূরাগত নিয়ন্ত্রণ ( রিমোট কনট্রোল )

নিয়ামক হুকুম, বাইরের কোন জায়গা থেকে আসতে পারে। মিসাইলটি ছোঁড়া হয়েছে, ধরুন, কোন এরোপ্লেন, কোন জাহাজ বা স্থলস্থ কোন নিয়ন্ত্রক ষ্টেশন থেকে। সেখান থেকে মিসাইলের সঙ্গে বেতার যোগাযোগে হুকুম পাঠানো যেতে পারে।

প্রাচীনতম ও আদিতম দূর নিয়ন্ত্রণ ছিল মজার। হয়তো হাস্যকরও। খোলা চোখেই হোক, দূরবীণের দূর চোখেই হোক, দৃষ্টির আওতায় থাকলে তবেই কার্যকরী। নমুনা ও খেলনা এরোপ্লেনগুলিকে মাটি থেকে চোখে দেখে, বেতার তরঙ্গের ইঙ্গিত সাহায্যে, ডাইনে ঘোরো, ওপরে ওঠো, সিধে হয়ে যাও, নাক নিচে ডুব মারো ইত্যাদি করানো হতো।

আর এক প্রকার দূর নিয়ন্ত্রণ হতো বেতার তরঙ্গ দিয়ে। নিশানার অবস্থান চোখে দেখেই হোক, রাডারের মাধ্যমে জেনেই হোক, ম্যাপ থেকে বের করেই হোক—মিসাইলের বিভিন্ন যন্ত্রে বেতার তরঙ্গের নির্দেশ পাঠিয়ে পাঠিয়ে কাজ হাসিল করতেন নিয়ন্তা। নিশানা অবধি চালিয়ে নেবার নির্দেশ নিজেই দিতেন। এই সব ক্ষেত্রে রাডারের সাহায্যে মিসাইলের অবস্থান, অগ্রগমন ইত্যাদি সবই পরিচালন কর্মী নখদর্পণে দেখতে পেতেন। মিসাইলের নিজের নিশানা খুঁজে নেবার, অনুভব করবার বা নিজের চোখে দেখবার দরকার নেই। বেতার তরঙ্গ দ্বারা তাকে পাঠানো নির্দেশ, মিসাইল অন্ধের মতোই কাজে রূপায়িত করত মাত্র। শব্দাগ্রগামী বা শব্দাতিগ মিসাইলের ক্ষেত্রে অবশ্যই এই পরিচালন কর্মী রক্তমাংসের মানুষ নয়। স্বয়ংক্রিয়, হিসেব সক্ষম ও, হিসেবে পাওয়া দোষ-ত্রুটি শোধনের ক্ষমতা-সম্পন্ন ইলেকট্রনিক কম্পিউটার।

আর একটি উপায়, টেলিভিশনে নিশানা দেখে দেওয়া। একটি টি-ভি ক্যামেরা এবং একটি প্রেরক যন্ত্র থাকে মিসাইলের মধ্যে। এবং টি-ভি তার অগ্রভাগে ও দু'দিকে কি দেখতে পাচ্ছে সেই দৃশ্য, পরিচালককে পাঠাতে থাকে। পরিচালক, সংশোধনী ইঙ্গিত (বা সিগনাল) মিসাইলকেই অর্থাৎ তার যন্ত্রবলীকে পাঠায়। মিসাইলে থাকে যন্ত্রহৃদয় যন্ত্রমানব। যান্ত্রিক মস্তিষ্ক। রক্তমাংসের মানুষ সেখানে নেই। মানুষ থাকে মাটিতে। একপ্রান্তে যন্ত্র, অপরপ্রান্তে মানুষ। যন্ত্রে মানুষে আলাপ চলতে থাকে, আলোচনা হয়, উপদেশ নির্দেশ পরামর্শ। তারপর একদা লক্ষ্যবস্তুকে দেখা যায়, মিসাইল নিশ্চিত ডানায় উড়ে যায়। দূরস্থিত পরিচালক কয়েক শ' মাইল পিছনে নিরাপদ জায়গায় থাকতে পারে। থাকতে পারে নিজের এলাকায়। যেখানে তাকে কোন শত্রু তাড়া করতে পারবে না। শুধু টেলিভিশন মারফত লক্ষ্যবস্তুটিকে দেখতে পেলেই যথেষ্ট। কোরিয়াতে অকেজো এরোপ্লেনকে মিসাইল করে ব্যবহার করা হয়েছিল।

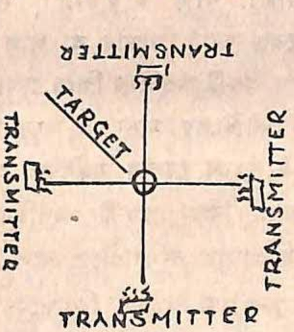
আর-এক প্রকার ছিল—মিসাইলে রাখা কনট্রোল-বক্সের সঙ্গে সরাসরি তারের যোগ। লম্বা তার ঝুলতে থাকত মিসাইল থেকে পিছনকার নিয়ন্ত্রণকারী চলন্ত এরোপ্লেন পর্যন্ত। এরোপ্লেন চলত পিছু পিছু। ইলেকট্রিক দ্বারা নিয়ন্ত্রণ চলত। বেতারে নয়, তারে। এ তো সম্ভব হত খুব নিকট পাল্লার ব্যাপারে। এবম্প্রকারে য়্যান্টি এয়ারক্রাফট বা বিমানধ্বংসী কামান পরিচালনার অনুশীলন, বা বড়

জোর নিকট পাল্লার, আকাশ-থেকে-আকাশ মিসাইল চালানো সম্ভব ছিল। পশ্চাদ্বর্ত্তী এরোপ্লেনের পাইলট, তার দূরবীণের কাচের ক্রশ চিহ্নের সঙ্গমস্থলে, অগ্রবর্ত্তী মিসাইল পাখীকে নজরবন্দী করে রেখে দিতেন। ফরাসী এস এস-১১ এই রকমেরই ট্যাঙ্কধ্বংসী মিসাইল ছিল।

উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই একটি করে চালক দরকার—তা সে চালক মানুষই হোক, বা যন্ত্রই হোক। সেই জন্যই এই নিয়ন্ত্রণকে 'হুকুমবরদার নিয়ন্ত্রণ' ( **Command Control** ) বলা হয়।

**বেতার নৌবাহবিজ্ঞান** ( **Radio Navigation** ) হলো আর এক উপায়। যদ্দ্বারা তড়িৎ-চুম্বক শক্তিকে পরিচালনার কাজে ব্যবহার করা যায়। রেডিওমাধ্যমে, জাহাজের অবস্থান, গতিপথ, তাৎক্ষণিক দূরত্ব ইত্যাদি নির্ণয়ের বিজ্ঞান। আমেরিকায় একে লো-রা-ন **LORAN, ( Long Range Navigation )** বলে।

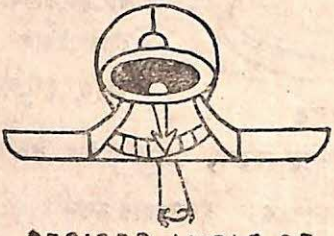
নিশানা থেকে সমান দূরে, নিশানাটির দু'পাশে সুনির্বাচিত জায়গায় দু'টি বেতার প্রেরক বসানো হ'লো। এই দু'টি প্রেরক একই সময় যুগপৎ বেতার স্পন্দন পাঠাতে থাকে। এই তরঙ্গগুলির গতি আমাদের জানা আছে, সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। মিসাইলে স্থাপিত একটি বেতার গ্রাহক, ঐ দুটি প্রেরক




থেকে অবিকল সমদূরে আছে। তা হলে প্রেরিত বেতার স্পন্দনও অবিকল একই সময়ে দুপাশ থেকে এসে পৌঁছচ্ছে। বুঝবার সুবিধার জন্য ধরে নিচ্ছি মিসাইলটিকে উত্তর থেকে দক্ষিণে যেতে হবে। নিশানাটি ঠিক মাঝামাঝি আছে। প্রেরক যন্ত্র দুটি বসানো হ'বে পূবে পশ্চিমে। উত্তর দক্ষিণ রেখার সমদূরে। এই দুই প্রেরক যন্ত্রকে কল্পিত রেখা টেনে যোগ করলে সেই রেখার লম্ব (per-

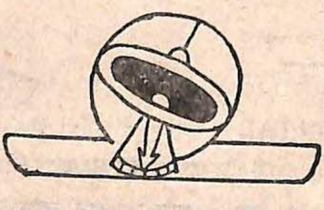
তার মানে **পিচ, ইঅ** এবং **রোলের** ভুলত্রুটি ঐ জাইরোস্কোপেই ধরা পড়বে। ঐ ফ্রেম ও কাঁটার angle-এর মাধ্যমে। ইলেকট্রিক কম্পিউটার সেটি টের পেয়ে পাঠাবে সার্ভোমেকানিজমকে। সার্ভোমেকানিজম ডান বা বাঁ দিকে ঘোরানো মুখ ঘুরিয়ে ঠিক সোজা করে দেবে ( **ইঅ** )। মাথা এবং লেজের, ঢেউয়ের মাথায় ওঠা ও গহ্বরে নামার বন্ধুর ভঙ্গী, সিধে সমতল-গামী করে দেবে ( **পিচ** )। এবং মাতলামো করে আকাশের ধুলোয় গড়াগড়ি খাওয়া ( **রোল** ) রদ করবে।

পক্ষান্তরে, বাঁ দিকে একটু দ্রুত, বেশী পরিমাণই মোড় ঘোরাবার দরকার পড়ল। বাঁয়ে 'ব্যাঙ্কর্ড টার্ণ' নেওয়াতে হবে। একটু বেশী বাঁ মোড় ফিরতে



DESIRED ANGLE OF BANK

গেলে, 'বডি'টা বাঁ দিকে হেলিয়ে দিতে হবে। সেটি করাবো জাইরোস্কোপকে ভুল করিয়ে দিয়ে। মাটিতে বসে 'ইঅ'-র জাইরোস্কোপের কাঁটাকে ফ্রেমের সঙ্গে কিঞ্চিৎ বাঁ দিকে টেনে দেবো যন্ত্রযোগে। তার মানে, কম্পিউটারকে বার্তা পাঠিয়ে। আমার অভিপ্রায় মতন বাঁ দিকে ঘুরে আপনি সিধে হয়ে যাবে আবার।



বিভিন্ন নির্দেশক প্রণালীতে অথবা স্থির পাটাতনে উৎপন্ন ইঙ্গিতগুলি বিবর্ধন করা হয়। তারাই মিসাইলের গতি নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতি সঞ্জীবিত করে মিসাইলটিকে সুপরিচালিত করে নিয়ে যাবে। তার মানে যান্ত্রিক উপায়ে

তারাই হাল ( rudder ) ঘোরাবে ফেরাবে। উত্তোলক ( elevator ) কাজ করিয়ে মিসাইলকে ওপরে ওঠাবে, নিচে নামাবে। এবম্প্রকারেই মাটির হুকুম মানবে সওয়ারী-হীন পক্ষিরাজ। প্রয়োজন মতো পথ বদলাবে। নিশানার পিছনে ধাওয়া করে তাকে পাকড়াও করবে। নিশানার উপরে পৌছে মিসাইল তার বিস্ফোরকপূর্ণ মাথাটি ( warhead ) ফুটে, নিজে ম'রে নিশানাকেও শেষ করবে।

দুটি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। যাতে, মিসাইলের পিটের, পেঠের, লেজের ডানা পাখা হাল ইত্যাদি কাজে লাগবে না। কারণ পিঠের পেটের ডানাগুলিতে বাতাসের চাপ বা স্রোত জেয়াদা বা জাস্তি নেই।

প্রথম পরিস্থিতি। মিসাইল তো ছাড়া হল, কিন্তু যথেষ্ট বেগ পেল না। ফলে, মিসাইলের চারপাশে হাওয়ার স্রোত যথেষ্ট হল না। ওড়ার এই সঙ্কটে তাকে সুস্থিতি বজায় রাখতে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হয়। ওড়ার যথেষ্ট বেগ পাইয়ে দিতে, দীর্ঘ রেলপথের ওপর তাকে টেনে নিয়ে তারপর হাওয়ায় ভাসানো হয়। 'মাজল ভেলসিটি' সর্ব বৃহৎ করার জন্য যে কারণে কামানের নল তা-বড়ো লম্বা করতে হয়!

আর একটি উপায় এবং সবচেয়ে আধুনিক ও কার্যকরী উপায় হলো 'বুস্টার' রকেটের সাহায্য নেওয়া। এর সাহায্যে মিসাইল তাড়াতাড়ি স্পীড পেয়ে যাবে। এবং আঁতুড়েই পেঁচোয় পাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়াও যাবে। কোন কারণেই তো আর মিসাইলকে নিজের এলাকায় ভূমিষ্ঠ হতে দিতে পারা যাবে না। এই বোবা কালা দুশমন তো নিজের পরের জমি বুঝবে না। অনর্থ ঘটিয়ে ছাড়বে।

বুস্টার সঙ্গে যাবে না। ঠেলে তুলে দিয়ে ছেড়ে দেবে। ছোট্ট ছোট্ট বুস্টার তা বড় মিসাইলকে স্বর্গের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়, যাদের ওজন কয়েক টন। এই পদ্ধতিতে ওড়াবার মঞ্চ ( launching pad ) তেমন দীর্ঘ হবার দরকার নেই।

আর একটি উপায় হল।

সমস্ত চালক-ডানা ( control vanes ), হাল, বা পুচ্ছের ক্রিয়াশীল সমতলগুলি (control surface)* মোটরের কাজ করার পর ব্যয় হওয়া

* Rudder, elevator aleron-এর ডানার মধ্যে খাঁজ কেটে ছোট ছোট ডানা কব্জা দিয়ে fit করা থাকে। ( বড়ো বড়ো gate-এর মধ্যে wicket gate-এর মতন।). এই ছোট্ট ডানাগুলি আলাদা control করা যায়। এগুলিই control surface।

pendicular) ধরে এগোতে হবে। মিসাইলটি যদি উল্লম্ব রেখার ডান দিকে চলে যায়, তা হলে ডান দিককার প্রেরক যন্ত্রের স্পন্দন বাঁ দিক থেকে প্রেরিত স্পন্দনের আগে এসে পৌছবে। মিসাইলের ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ঐ অতি সামান্য সময়ের তফাতটুকু কাজে লাগাবে। হিসেব করে বের করবে কতোটা ডান দিকে সরে গেছে। সেটুকুকে শোধরাবে। সংশোধনী নির্দেশ পাঠাবে এই কাজে নিযুক্ত যন্ত্রটিকে। ভ্রান্ত পথের অবাধ্যতা ছেড়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো স্বপথে ফিরে আসবে মিসাইল। এতে অসুবিধে এই যে, নিশানাটির ঠিক অবিকল সমান দূরে, ডাইনে বাঁয়ে দুটি বেতার প্রেরক বসাতে হবে। আর নিশানাটি অবশ্যই এর উল্লম্ব ( vertical ) রেখায় হতে হবে।

আরো একটি রাস্তা হলো দু পাশে দুটি তো থাকবেই—আগে পিছে ও সমান দূরে, আরো দুটি প্রেরক যন্ত্র থেকে বেতার তরঙ্গ পাঠানো। অথচ চারটি প্রেরক যন্ত্রের ঠিক মধ্যিখানে হতে হবে নিশানাটিকে। পূবে পশ্চিমে উত্তর দক্ষিণ যে দিকেই হোক, কিম্বা ঈশান নৈঋত বায়ু অগ্নি যে বিদিকেই হোক, এই সমদূর চারটি প্রেরক যন্ত্র স্থাপনের স্থান আমার নিজের এলাকাতেই হতে হবে। শত্রুর এলাকায় আমার প্রেরক যন্ত্র রাখবো কি ক'রে ?

আরো একটি উপায়। **বীম রাইডার**। বিশেষ আলোক রশ্মিতে মিসাইলকে শিক্ষিত ও দুরস্ত করা। রাডার বা লাল উজানী বা অপর কোন অদৃশ্য অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের একটি অপরিসর কিরণ রেখা (beam) নিশানার ওপর ফেলা হতে থাকল। মিসাইলের মধ্যে ঐ অদৃশ্য বিশেষ রশ্মির গ্রাহক স্থাপন করা গেল। গ্রাহক ঐ কিরণ রেখায় সঞ্জীবিত হয়ে থাকবে। গ্রাহক অন্য কিছুতে সাড়া দেবে না। কিরণ রেখাটি অপরিসর। চওড়ায় লক্ষ্যবস্তুটির চেয়ে বড়ো নয়। আমি আমার জমিদারীতে বসে নিশানা তাক করে বিশেষ কম্পাঙ্কের ( frequency-র ) অ-সাধারণ কিরণ-রেখা ( beam ) তৈরী করে নিশানার ওপর ফেলতে থাকলাম। মিসাইলের মধ্যস্থিত গতি নিয়ন্ত্রক মোটর, ওপরে নিচে ওঠা নামার মোটর, পাশে ঘোরার যন্ত্রকে এবং অন্যান্য তাবৎ যন্ত্র বা মোটরকে ঐ রশ্মিতে, তথা ঐ অ-সাধারণ কম্পাঙ্কে বেঁধে দিলাম। ঐ কিরণ রেখা ধরেই মিসাইল চলতে থাকবে। মিসাইলটি নিশানার ওপর যেতেই রশ্মির উৎপাদন বন্ধ করলাম। এগোবার, ওঠা নামার, পাশে ফেরার, গড়াগড়ি খাবার যাবতীয় মোটর, সঞ্জীবনী রশ্মি বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। মুখ থুবড়ে

পড়ল মিসাইল। নিশানা যদি গতিশীলও হয়, আমার কাজ হবে নিশানার ওপর ঐ বিশেষ কিরণ রেখা ফেলে রাখা। বলা বাহুল্য ঐ কিরণ রেখা খালি চোখে দেখা যায় না। মিসাইলের সমস্ত মোটর যখন ঐ বিশেষ রশ্মি ও বিশেষ কম্পাঙ্কের সুরে বাঁধা, তখন নিশানা গতিশীল হলেও আমি যখন আমার তৈরী ঐ বিশেষ কম্পাঙ্ক ও কিরণ রেখা, তার ওপর রাখতে পারছি : হিট তখন অনিবার্য।

মার্কিন নৌবহরের ( 'ট্যালো' ও 'টেরিয়ার' ) হাওয়াই প্রতিরক্ষা মিসাইল ঐ ধরনের **কিরণরেখা** পদ্ধতির উদাহরণ (Beam rider)।

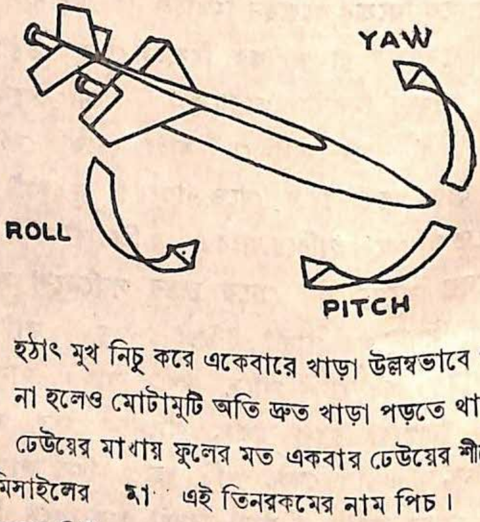
আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন মিসাইল কি উত্তাপকে ধাওয়া করে? আকাশে উড়ন্ত এরোপ্লেন বা আগন্তুক মিসাইল যে কড়া উত্তাপ জন্মায় তাকে শুঁকতে শুঁকতে আমার মিসাইল এগোচ্ছে। কোনো রকমে শত্রুর প্লেন বা শত্রুর মিসাইল 'মিস' করলে আমি যে মিসাইল ছেড়েছি সেটা, সমস্ত তাপের আকর, সূর্যমুখী হয়ে সূর্যের দিকে যেতে থাকবে? ন কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরের সূর্যকে ধরতে না পেরে, হারিয়ে যাবে?—এ থিয়োরী সত্যি কি?

**মিসাইলদের মধ্যে সব চেয়ে চতুর সর্বনেশে হ'লো সন্ধানী মিসাইল**। এ মিসাইলের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই আছে। তাই দিয়ে নিশানা সন্ধান করে বেড়ায়। এর চোখ আছে, দেখতে পায়। কান আছে, শুনতে পায়। বিশেষ অবস্থায় চুম্বক ক্ষেত্র, আলোক ক্ষেত্র, তড়িৎ ক্ষেত্র বা বেতার প্রেরক উৎস, বা উত্তাপ ক্ষেত্র, অতি সহজে, বিনা আয়াসে খুঁজে বের করতে পারে। কোন কারণে নিশানা বিমুখী হয়ে গেলে নিজের কলকব্জা নিয়ন্ত্রিত করে মিসাইলকে নিশানামুখী করে নেয়। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যওয়ালা নিশানাকে বের করে নেয় যারা, তাদের বলা হয় নিষ্ক্রিয় অন্বেষ্টা ( passive seeker )। শত্রু যদি পারতো আলো, উত্তাপ, বিদ্যুৎ, বেতার ইত্যাদির উৎস পেটে পুরে রাখত। তা তো আর সম্ভব নয়। এই উৎসগুলি যে স্বয়ংপ্রকাশ! না-হলেই বা কি! আগন্তুক মিসাইলই, তার রাডার সংকেত সিগনাল দিয়ে, নিশানা "আলোকিত" করে তারপর নিশ্চিত আঘাত হানতে পারে। বলা-বাহুল্য এ আলো চোখে দেখার নয়। এই দলটিকে বলা হয় সক্রিয় অন্বেষ্টা ( active seeker )। মার্কিন স্থলবাহিনীর 'হক', নৌবাহিনীর 'সাইড ওয়াইণ্ডার' এই সক্রিয় অন্বেষ্টা দলের।

## মর্জি নিয়ন্ত্রণ ( Attitude Control )

মর্জি নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে, মিসাইল পরিচালিত-ই (guided) হল না। সে যদি নিয়ন্ত্রণকারী-ইঙ্গিত-এ ( controlling signal ) সাড়া না দিতে পারে তাহলে গাইডেড মিসাইলের জন্মই বৃথা।

তিন রকমের কোণাকুণি গতি সম্ভব। ডাঙায় হতো মাত্র দুটি রকম। সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে। আকাশযানের ব্যাধি তিন রকম—পিচ, ইয়, রোল।




পিচ—(১) হঠাৎ মুখ নিচু করে একেবারে খাড়া উলম্বভাবে পড়ার চেষ্টা।

(২) না হলেও মোটামুটি অতি দ্রুত খাড়া পড়তে থাকা।

(৩) ঢেউয়ের মাথায় ফুলের মত একবার ঢেউয়ের শীর্ষে ওঠা, আবার নিচে নামা। মিসাইলের ঝা এই তিনরকমের নাম পিচ।

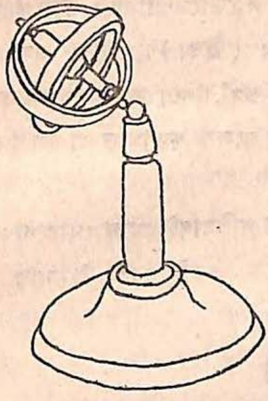
ইঅ—লম্ব অক্ষের নিরিখে কোণাকুণি ঘুরে যাওয়া, ডাইনে বাঁয়ে ঘোরা।

রোল—গড়াগড়ি খাওয়া।

কিন্তু মিসাইলের বুকে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিরূপণ করতে গেলে এমন কোন একটি পাটাতন দরকার, যার স্থিরতা আছে। সবই বদলাবে সে বদলাবে না। মিসাইলের যে কোন অবস্থায়—মুখ উঁচু, মুখ নিচু ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে—এই পাটাতন থাকবে উর্দ্ধাধ। মোটামুটি আকাশে মাথা, মাটির দিকে পা এই পোজিশান বজায় রাখতে হবে এই পাটাতনকে। যাকে ভিত্তি বা নিরিখ ক'রে, অন্যান্য ক্রিয়ার দোষত্রুটি নিরূপণ করা যাবে। এবং নিয়ন্ত্রক ষ্টেশনকে জানানো যাবে, যাতে নিয়ন্ত্রক ষ্টেশন সংশোধনী সঙ্কেত পাঠিয়ে মিসাইলের বেগড়বাঁই মর্জি, সায়েস্তা করে দিতে পারে।

এতদুদ্দেশে জাইরোস্কোপের ব্যবহার অপরিহার্য। কারণ যে সমতলে জাইরো

স্কোপের চাকাটি ঘুরছে ( **horizontal plane** ) সেই অনুভূমিক সমতলেই সর্বদা থাকে।



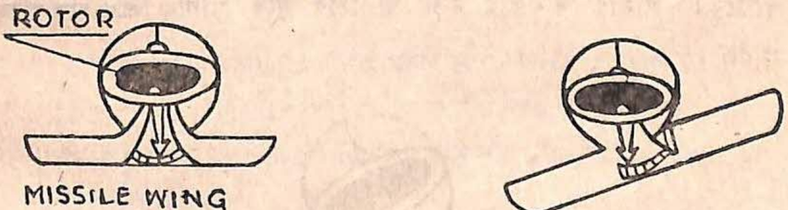
GYROSCOPE

**জাইরোস্কোপ হ'ল**

জিম্বালের উপর স্থাপিত স্বাধীনভাবে ঘূর্ণ্যমান চাকা। চাকাটি যে ফ্রেমের উপর বসানো তার ওলট পালট হলেও জাইরোস্কোপের ঘোরার হের ফের হয় না। এই গুণ থাকায় জাইরোকম্পাস-এ, বিমানের স্বয়ংক্রিয় চালন পদ্ধতিতে, বড়ো জাহাজের স্টেবিলাইজার ও **মিসাইলে জাইরোস্কোপ অপরিহার্য।**

প্লেন বা মিসাইল পিচ করুক, রোল করুক, ইঅ করুক, জাইরোস্কোপের চাকা সেই অনুভূমিকই থাকবে। ধ্রুবতারার মতন।

মিসাইল যদি গড়াগড়ি খাবার চেষ্টা করে, জাইরোস্কোপের রোটরের চাকা থেমে যাবে না। ( রোল ) গড়াগড়ি খাবার কোণ, কাঁটা এবং ফ্রেমের কোণ কর্তৃক নির্দিষ্ট হবে। এই কোণ ইলেকট্রনিক কম্পিউটারে ধরা পড়বে। কম্পিউটার :একটি সার্ভোমেকানিজমকে* প্রাণবন্ত করে গড়াগড়ি খাবার প্রবণতাটুকু




শুধরে দেবে। ঠিক ঐ একই উপায়ে জাইরোস্কোপ নির্দেশিত ফ্রেম এবং কাঁটার কোণের পরিমাণ, পিচ এবং ইঅ-র দোষও শুধরে দেবে।

---

* Servo mechanism—an automatic device for controlling large amounts of power by means of very small amounts of power and automatically correcting performance o a mechanism অর্থাৎ কম মাত্রার শক্তি দিয়ে বৃহৎ শক্তি নিয়ন্ত্রণ, এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের ত্রুটি শোধরাবার স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক কৌশল।

পরিত্যাজ্য গ্যাসের নির্গম পথের নিচে স্থাপন করা। এখানে কোন দিন হাওয়ার চাপের অভাব হবে না। জেটনিঃসৃত হাওয়ার স্রোত এখানে সেকেণ্ডে এক মাইল বেগে সর্বদাই বইছে। এই হাওয়ার স্রোত কনট্রোল সারফেসগুলিতে বাড়ি খেয়ে মিসাইলের লেজের ওপরে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি করবে। সাধারণ 'এআর ভেন' যেমন ক্রিয়া উৎপাদন করে, তেমনি আর কি! ব্যয়িত গ্যাসের উত্তাপ ২০০০° থেকে ৪০০০° ফারেনহীট। সেই তাপে কোন পদার্থকে না গলিয়ে না পুড়িয়ে অক্ষয় রাখা, সে এক প্রাণান্ত সমস্যা। কিন্তু এই এআর ভেনগুলিকে বেশীক্ষণ ঐ প্রগলভ উত্তাপ সহ্য করতে হচ্ছে না। কারণ অল্পক্ষণেই মিসাইল স্পীড পেয়ে যাচ্ছে। এই উত্তাপের কথা চিন্তা করে এই উত্তাপের টেঁকসই করার জন্য জার্মানরা অঙ্গারক ( **carbon** ) দিয়ে এই কনট্রোল ভেন তৈরী করেছিল।

এই সমস্যার আর একটি সমাধান—জেট মোটরকে জিম্বালের* ওপর বসানো। যাতে জাইরোস্কোপ থেকে পাওয়া ত্রুটির সংশোধনী ইঙ্গিতের বশে, মিসাইলের নড়াচড়ার বিন্দুমাত্র বেগ পেতে না হয়।

মিসাইলের স্বাভাবিক গতিবিজ্ঞান কাজ করে না আরো একটি ক্ষেত্রে। অনেক অনেক উপরে যেখানে আবহাওয়া অত্যন্ত পাতলা কিম্বা নেইই বলতে গেলে। এক্ষেত্রেও সমাধান হল রকেট মোটরকে জিম্বালে বসানো কিম্বা যে সব রকেট মোটরের ব্যয়িত গ্যাসের নির্গমন **পাশের** দিকে, গতিপথের সমকোণে সেই রকেট-মোটরের সংস্থাপন। শুধু মেজাজ শোধরাবার প্রয়োজনেই নয় পরিচালনা ক্ষেত্রেও অত্যাবশ্যকীয়।

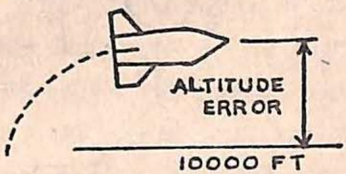
অল্টিমিটার অদৃশ্য ফিতে ফেলে এক বাঁও মেলে না, দুই বাঁও মেলে না করে মাটি থেকে খাড়াই মাপে। সেই অল্টিমিটার-নিয়ন্ত্রিত একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাংশ, পরিচালকের বেঁধে-দেওয়া উচ্চতায় মিসাইলকে চলতে বাধ্য করে। ভুল করলে শুধরে দেয় কি ক'রে ?

দশ হাজার ফুটে বাঁধা আছে। ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গিয়ে সেই উঁচুতেই অনুভূমি চলতে লাগল। ধরুন বারোহাজার ফুট উপরে উঠে বারোহাজার

---

*জিম্বাল (gimbal) হল এমন একটি যন্ত্র কৌশল যার ওপর সংস্থাপিত বস্তু—এক্ষেত্রে রকেটে মোটর—কোন কারণেই হেলে পড়বে না, মুখ থুবড়ে পড়বে না। উড়ন্ত প্লেন বা মিসাইল যতোই কাত চিত হোক না। এরোপ্লেনের ভিতরের ছ'দে যদি শিক টাঙাই, সেই শিকেতে যদি কোন কিছু রাখি সেই রকম আর কি।

ফুটেই চলছে। চলেছে-ই। নামছে না। অবিচল মঞ্চ (stable platform) হ'ল অনুভূমিতে চলার জন্য, অনুভূমিত্ব রক্ষা করার জন্য তৈরী একটি যন্ত্রাংশ। সে না-দিচ্ছে নিচে নামতে, না-দিচ্ছে ওপরে উঠতে। সেই বারো হাজার ফুটের গোঁ বজায় রেখে চলেছে। তাকে শুধু দশ হাজার ফুটেই নামাতে হবে না, নামিয়ে দশ হাজার ফুট উঁচুতেই বজায় রাখতে হবে। অবশ্যই দশ হাজার ফুটে নামিয়ে এনে পিচ-এর দোষ না থাকলে অবিচল মঞ্চই তাকে দশ হাজার ফুটে বজায় রাখবে।

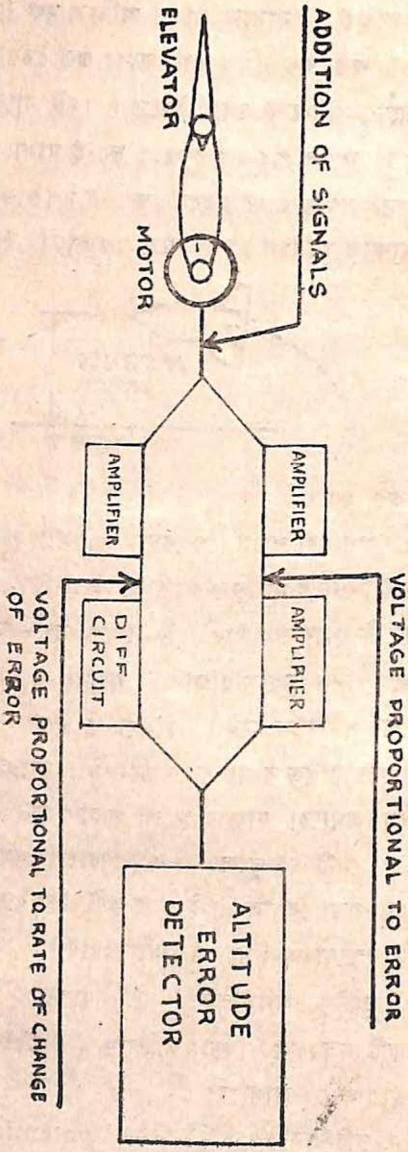



কি ক'রে এটি করা হয়?

অল্‌টিমিটারে যে-ভুল ধরা পড়ল, যে-বেচাল পরিলক্ষিত হ'ল, সেই ভুল দুই রকমে একই সঙ্গে দুটি মিটারে নথিভুক্ত হতে থাকল। এক, ভুল কতোটুকু। দুই, ভুল কতো দ্রুত এবং কি-হারে বদলাচ্ছে। উদাহরণে, ভুল—দু'হাজার ফুট উঁচুতে। এক নম্বর মিটার বলে দিল ভুল দু'হাজার। বরাবর বারো হাজার ফুট উঁচুতে চলতে থাকলেই ভুলের পরিবর্তন নেই। দু'নম্বর তা হলে ভুলের পরিবর্তন রেকর্ড করবে না। বারো হাজার গড় বজায় রেখে চলেছে। বারোহাজার পঞ্চাশ হচ্ছে, পনেরো সেকেণ্ড পরে এগারো হাজার নশো পঞ্চাশ ফুট। এই ক্ষেত্রে দু'নম্বর মিটার কাজ করছে। সেটি এই ভুলের বা এই বেচালের খবরদারী করবে।

অল্‌টিমিটারে ধরা-পড়া বেচাল একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন ব্লকে পৌঁছে যাচ্ছে। ওপরটায় আছে দুটি সম্প্রসারক (বা অ্যামপ্লিফায়ার)। এরা ভুলের পরিমাণ কাজে লাগাচ্ছে। ভুলটুকু অ্যামপ্লিফাই করে ধরছে। নিচের ব্লকে একটি সম্প্রসারক, আর একটি অন্তরকলক বিদ্যুৎ গতিবৃত্ত (differential circuit)-র ভুলের পরিবর্তনের হার কাজে লাগাচ্ছে।

লক্ষ্য করে দেখুন, দুটিই বিভিন্ন তড়িৎ বিভব (potential) জন্মাচ্ছে। এবং এলিভেটরগুলি নিয়ন্ত্রণ করছে যে-মোটর, সেই মোটরকে বিদ্যুৎ-শক্তি জোগাচ্ছে দুটি ব্লকই। দুটি ব্লক থেকে তড়িৎ বিভব এসে যোগ-বিয়োগ হয়ে ক'মে-বেড়ে এই মোটরকে সিধে-উল্টো, আস্তে জোরে ঘোরাচ্ছে। উত্তোলক (elevator-কে ওঠাচ্ছে নামাচ্ছে ইত্যাদি।


ADDITION OF SIGNALS
ELEVATOR
MOTOR
AMPLIFIER
AMPLIFIER
AMPLIFIER
DIFF CIRCUIT
VOLTAGE PROPORTIONAL TO ERROR
VOLTAGE PROPORTIONAL TO RATE OF CHANGE OF ERROR
ALTITUDE ERROR DETECTOR

# চতুর্থ অধ্যায়

## মিসাইলের পে-লোড

মিসাইলের জন্ম জীবন ও মৃত্যু এক এবং একটি মাত্র উদ্দেশ্যের চরণে নিবেদিত। ( Pay load ) পে-লোডটিকে ঠিক মতো জায়গায় ঠিক মতো সময়ে পৌছে দেওয়া। মিসাইল নিজে সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্য। জীবন তার মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। 'পে-লোড' ( Pay load ) কথাটি, মিসাইল রকেটের দুনিয়ায় অতি পরিচিত, বহু উচ্চারিত। 'পে-লোড' হলো মিসাইলের 'ওয়ার হেড'-এ (War head) যে মূল্যবান সামগ্রীর পসরা বহন করা হয়। এই পসরা কখনও বিস্ফোরক, কখনও অগ্নিপ্রজ্বালক বা অন্য কোনো রাসায়নিক পদার্থ, কখনও কুকুর বা বাঁদর, কখনও যুরি গাগারিন, আলান শেপার্ড। 'ওয়ার হেড' হলো মিসাইল বা টর্পেডোর সেই প্রকোষ্ঠ, যাতে 'পে-লোড' বহন করা হয়। অন্য সব প্রকোষ্ঠের তুলনায় 'ওয়ার হেড' ক্ষুদ্রতম প্রকোষ্ঠ। ছোট হলোই বা! ওটি যে মণিকোঠা—

এরোপ্লেন বাহিত বিরাট বোমা, বা কামানের গোলার চেয়ে বেশি দ্রুততায় বিস্ফোরক পৌছে দিতে পারে মিসাইল। এরোপ্লেনের স্পীড, এবং কামানের গোলার বিশালতা—দুয়ের সমন্বয় পাওয়া যাবে মিসাইলে।

মিসাইল কিন্তু ভারী বশংবদ। দাসানুদাস এই পবননন্দনকে যে গন্ধমাদনই বহন করতে দেয়া হবে, তা-ই বয়ে নিয়ে যাবে। যেখানে জলাঞ্জলি দিতে বলা হবে, সেখানেই দেবে। নড়-চড় হবে না বিশেষ। মিসাইলের ক্ষেত্রে জলাঞ্জলি তো আত্মাহুতি।

ছোট আকারের মিসাইলকে বহন করতে দেওয়া হয় অ-সামান্য বিস্ফোরক, চূর্ণনীয় বোমা ( Fragmentation Warheads ) ইত্যাদি। কারণ, ছোট মিসাইলেরা, নিশানার চাঁদমারীতে ভুল করতে জানে না।

কিন্তু দেশে দেশে মিসাইল চর্চার এই যে এতো ধুম-ধাম, তার মূল কারণ— মুহূর্তে প্রলয় ঘটানোর মালিক অ্যাটম বোমা বহন করবার জন্য। অ্যাটম বোমা বাহী মিসাইল আকারে বড়ো হয়। নির্জন নির্মানব মিসাইল ছাড়া, মানুষ সওয়ারী-ওলা কোন্ প্লেন বয়ে নিয়ে যাবে অমন বিপজ্জনক পসরা? "মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন আমি ধ্বংস। আমি অভিশাপ। আমি মহাভয় পৃথ্বীর।" এই লাইন কটি নজরুল যখন লিখেছিলেন, অ্যাটম বোমা তখনও জন্মায় নি। লাইন কটি অ্যাটম বোমা সম্পর্কে সর্বাধিক প্রযোজ্য, সন্দেহ নেই।

## নিউক্লিয়ার ওয়ার হেডস

একটি, মাত্র একটি আই-সি-বি-এম, (ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল) বা অন্তর্মহাদেশ (পারমাণবিক) স্বনিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র যে সশব্দ মহাপ্রলয় ঘটাতে পারে, তা ধারণার বৃত্তে ধরা যায় না। তার তুলনা নেই। তোমার উপমা মাত্র তুমিই কেবল।

বিজ্ঞানীরা আই-সি-বি-এম-এর ধ্বংসক্ষমতাকে টি-এন-টির দাঁড়িপাল্লায় মাপার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকেন। বলেন—একটি আই-সি-বি-এম, কয়েক কোটি টি-এন-টির সমতুল। এ যেন দাঁড়িপাল্লায় একদিকে কয়েক মহাপদ্ম (billion) মোমবাতি আর অন্যদিকে সূর্যকে চাপিয়ে সূর্যালোকের 'ক্যাণ্ডল পাওয়ার' মাপার হাস্যকর চেষ্টা।

পারমাণবিক বোমার সর্বপ্রথম পরীক্ষার তারিখ ১৬ই জুলাই ১৯৪৫। এই তারিখটি স্মৃতিপটে খোদাই করে রাখার মতো। মানবজাতিকে সার্বিক বিলুপ্তির সেই কি সূচনা? গ্রো মোর ফুড যতোই করি না কেন, ক্রমবর্ধমান জনতাকে দুবেলা দুমুঠো দিতে পারছি না। এতে তো ভুল নেই। খাবার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এক লহমায়। এক সেকেণ্ডেরও দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ে। একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ। সব শেষ। তবে, এই মহাপ্রলয়ে 'নোয়ার' নৌকোও পাওয়া যাবে না। মনুষ্যজাতির প্রজননও বজায় না থাকতে পারে। হয় তো প্রোটোপ্লাজমের চিহ্নও থাকবে না বিশ্বসংসারে।

পঁয়তাল্লিশ সালের ষোলই জুলাই। পরমাণু মাত্র সময়ে—এক সেকেণ্ডেরও দশ লক্ষ ভাগ সময়ে,—বিস্ফোরণজনিত পারমাণবিক বিভাজনের ফলে এক কোটি বা ততোধিক ডিগ্রী তাপমাত্রা সৃষ্টি হ'ল।

বহু দশক পর পর্যন্ত ধ্বংসের উত্তরাধিকারী রেখে গেল। তখনকার জল স্থল অন্তরীক্ষে কী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হলো, প্রাণী ও উদ্ভিজ জগতে কী বিক্রিয়াব সূত্র রেখে গেল, তার একটু নমুনা দেখা যাক—

"মুহূর্তে দূরের পাহাড়ের গায়ে এক ঝলক তীব্র আলোর ঝলসানি। মনে হল কে যেন এক লহমায় সূর্যের ওপর থেকে অন্ধকারটি সরিয়ে নিয়েছে।" বিস্ফোরণের পরীক্ষা চালানো হয়েছিল ঠিক ভোর পাঁচটা—সূর্যোদয়ের পূর্বে। সেকেণ্ড দুয়েক পর চাইতেই চোখে পড়ল ঔজ্জল্য অনেকটা কমে গেছে। তবু দূরে দিগ্বলয়ের ওপর যেন একখণ্ড উজ্জ্বল সূর্য। ক্রমে আকাশের দিকে উঠছে।

তার নিচে ধূসর রঙের কুণ্ডলী পাকান মেঘ। কেমন কুঁজো হয়ে পিঠ বাড়িয়ে দিচ্ছে ওপরে, বরং বলা চলে, ঠেলে উপরে উঠছে। রক্তিমাভা মেঘও ক্রমে বিবর্ণ হয়ে গেল। বিশেষ করে মেঘের ওপরের অংশটা। বুঝলাম প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তায় বাতাসে আভা দেখা দিয়েছে। তারপর আকাশ ফাটা শব্দ। একের পর এক। সে শব্দ গড়িয়ে যাচ্ছে দূরে, অনেক দূরে… বিস্ফোরণের সময় যাদের ঘুম ভেঙে যায় তারা আকাশে একটা প্রচণ্ড ঝলসানি দেখতে পায়। দেখতে পায় দেড়শ মাইল দূরের মানুষও। বহু দূর থেকে গুড় গুড় শব্দ শোনা যায়।…কয়েক দিন পর সীসের চাদরে ঢাকা জীপে চড়ে একদল পর্যবেক্ষক সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করলেন মরুভূমির বালি সবুজ এবং তুলোর মতো কাচে পরিণত হয়েছে। ইস্পাতের স্তম্ভটি বাষ্প হয়ে উবে গেছে।' পরীক্ষার জায়গাটি ছিল উত্তর আমেরিকার নিউ মেকসিকোর জনমানবহীন মরুভূমি সমতুল প্রান্তর। আর বিভীষণ বোমাটিকে একশ ফুট উঁচু একটি ইস্পাতের স্তম্ভের ওপর বসানো হয়েছিল।

যা বলছিলাম। একটি ডেভি রকেট যুদ্ধক্ষেত্রের যে কোনো জিনিস ধূলোয় মিশিয়ে দিতে পারে, এবং সে ধূলো আকাশে উড়িয়ে দিতে পারে। এবং এই পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়তে মাত্র তিনটি লোক লাগবে।

বিস্ফোরণ ব্যাপারটা কী?

বিস্ফোরণ মানে কী? অতি অল্প সময়ে অতি বেশী পরিমাণ শক্তির (energy) অকস্মাৎ মুক্তিদান।

পারমাণবিক বাদ দিলে অন্য মামুলী বিস্ফোরণগুলি সব রাসায়নিক বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণকে হঠাৎ ও প্রচণ্ড বিস্ফারণ বললেও বলা যায়। পারমাণবিক বিস্ফোরণের আগে পর্যন্ত টি-এন-টি ই ছিল সব চেয়ে শক্তিধর। সব চেয়ে ভয়ঙ্কর ও আতঙ্কজনক বিস্ফোরক। টি-এন-টির বিস্ফোরণও রাসায়নিক বিস্ফোরণ।

টি-এন-টি তথা ট্রাইনাইট্রোটোলুয়ীন। এর রাসায়নিক সংকেত (formula) এক ভজকট বিতিকিচ্ছিরি বিদকুটে ব্যাপার—$CH_3C_6H_2(NO_2)_3$। টোলুয়ীনের সঙ্গে মোটামুটি নাইট্রিক এসিড যুক্ত করে এই পদার্থ। টোলুয়ীনের অপর নাম মেথিল বেনজিন। মেথিল বেনজিন, বেনজিনের মতোই অনেকটা, অমনি সুগন্ধি। বেঞ্জিন আপনারা জানেন মোটর গাড়ীর জ্বালানী হিসেবে

ব্যবহার করা যায়। বেনজিন বর্ণহীন, উদ্বায়ী—সহজে, হাওয়ায় উবে যায়। বেনজিন দাহ্য, সুগন্ধি হাইড্রোকারবণ। বেনজিনের রাসায়নিক সংকেত $C_6H_6$ মেথিল বেনজিনের রাসায়নিক সংকেত $C_7H_8$। এটি বেনজিনের চেয়ে কম উদ্বায়ী। গুণে দাহ্য। ধর্মে বিষ। কোক চুল্লীর গ্যাস, আলকাতরা, হাল্কা তেল, পেট্রোলিয়াম থেকে সহজে ও প্রচুর পরিমাণে তৈরী হয়। অনেক কাজে লাগে। টোলুয়ীনের তথা মেথিল বেনজিনের গঠন চেহারাটা দেখুন। সাতটি কারবনের অণু, আটটি অণু হাইড্রোজেনের। এই টোলুয়ীনের সঙ্গে সাদা বাংলায় বলতে গেলে নাইট্রিক এসিডের বিবাহ ঘটিয়ে যে সন্তানটি জন্মাল, তাতে বাপ মায়ের দোষগুণ উভয়ই বর্তাল। কিন্তু তার একটি আলাদা চরিত্র জন্মাল যা বাপ মায়ের আকৃতি ও প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র। ছেলেটি হলো কালাপাহাড়। লক্ষ করে দেখুন টি-এন-টিতে কারবন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ছাড়া অন্য কিছু নেই। টি-এন-টি বিস্ফোরণ মানে এই কারবন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন অণুগুলির পুনর্বিন্যাস। যে রকম প্রতিবেশিত্বে এই অণুগুলি সাজানো ছিল তাদের ঘরবাড়ী ভেঙে চুরে লণ্ডভণ্ড করে শক্তির মুক্তি দেয়া। এ-ই হলো টি-এন-টি বিস্ফোরণের মূল তত্ত্ব।

পারমাণবিক বিস্ফোরণেও তাই। বিস্ফোরণের সাহায্যে যে বোতলের ভূতের মুক্তি, অর্থাৎ শক্তির মুক্তি দেওয়া হয় তার মূল তত্ত্বও, রাসায়নিক বিস্ফোরণের মতো-ই। রাসায়নিক বিস্ফোরণে অণুগুলির পুনর্বিন্যাস, পারমাণবিক বিস্ফোরণে পরমাণুগুলির পুনর্বিন্যাস—এই যা তফাত। অণু গঠিত হয় যে পরমাণু দিয়ে, পারমাণবিক বোমার বা বিস্ফোরণের কারবার সেই পরমাণু নিয়ে। সাধারণ বোমার বিস্ফোরণের দৌড় অণুর দরজা পর্যন্ত। পারমাণবিক বিস্ফোরণ অণুর দরজা তো ছার, পরমাণুরও অন্তঃপুর বা নিষিদ্ধ জেনানা মহলে ঢুকে অনর্থ বাধায়।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ দুটি উপায়ে ঘটানো যায়:

এক। পারমাণবিক বিভাজন, **nuclear fision**

দুই। পারমাণবিক একীভবন **nuclear fusion**

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মৌলিক পদার্থ পরমাণু দিয়ে গড়া। একটি পরমাণু হলো মৌলিক পদার্থের সেই ক্ষুদ্রতম অংশ, পদার্থটিকে ভেঙে ফেললেও যে অংশটি পিতৃরক্ত ও পিতৃপরিচয় বহন করে। সেই অংশটিকে ঐ মৌল পদার্থেরই

অংশ ও বংশধর বলে চেনা যায়। পরমাণুটির ভৌত ধর্ম ( Physical Property ) ও রাসায়নিক ধর্ম ( Chemical Property ) মৌল পদার্থ টির প্রকৃতি নির্দেশকই ( Characteristic ) হয়ে থাকে।

অণু ভেঙে পরমাণু, যার নাম অ্যাটম। ছোটর থেকে ছোট, তস্য ছোট। অ্যাটম কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'আর ভাঙা যায় না'। অ্যাটম অর্থে পরমাণু। পরমাণুকে আর ভাঙা যেত না বলেই অ্যাটম নাম হয়েছিল। সেই পরমাণুকে ভাঙা হয়েছে।

পরমাণুকে আরো ভাঙুন। ভাঙা পরমাণু। ভাঙা পরমাণুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ ইত্যাদি পিতা পরমাণুটিকে মনে করিয়ে দেবে না। ভাঙা পরমাণু সম্পূর্ণ নিজস্ব চরিত্রের, সম্পূর্ণ অন্য লক্ষণযুক্ত। বিলকুল আলাদা। ভিন্নধর্মী। এই অণোরণীয়ানদের কাজে লাগিয়েই পারমাণবিক বিস্ফোরণ।

পরমাণুর গঠনটা কি ?

মাঝখানে একটি নিউক্লিয়াস। অথবা পরমাণুকেন্দ্র। নিউক্লিয়াস কথাটির অর্থ শাঁস। একদম ভিতরের বিচি। নিউক্লিয়াসটি একেবারে মধ্যিখানে। একেবারে ক্ষোদিষ্ঠ। ভারী। প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে তৈরী। প্রোটন এবং নিউট্রন মিলিয়ে নাম নিউক্লিয়াস। প্রোটনগুলি হাঁ-ধর্মী। পজিটিভ বলুন, পর বলুন, পরা বলুন। নিউট্রনের চার্জ নেই। নামটাই তাই। শুনলেই বোঝা যায় নিউট্রনগুলি নিউট্রাল। উদাসীন। না পরা, না অপরা। ক্লীব।

একদম ভিতরে কেন্দ্রে প্রোটন নিউট্রন মিলিয়ে নিউক্লিয়ন। প্রোটন, নিউট্রন আলাদা ভাবেও—উভয়েই নিউক্লিয়ন।

কেন্দ্রের নিউক্লিয়নকে ঘিরে ঘূর্ণ্যমান নৃত্যশীল অনেক অনেক ইলেকট্রন। ইলেকট্রন অপরা ধর্মী, না-ধর্মী, নেগেটিভ।

নিউক্লিয়নকে ঘিরে সেকেণ্ডে ২২শ কিলোমিটার বেগে ইলেকট্রনরা ঘুরছে।

সব মিলিয়ে অ্যাটম কিন্তু বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ।

আবার আরো বিস্ময় আছে।

একখানি অ্যাটম যেন ছোট্ট একটি সৌরজগৎ। বাইরে চক্রগতি পথে না-ধর্মী ইলেকট্রন। ভিতরে হাঁ ধর্মী প্রোটন। নিউট্রনের চার্জ নেই।

অ্যাটমের ভিতরেও মহাশূন্যতা। কেন্দ্রের নিউক্লিয়ন থেকে দু হাজার প্রোটন-ব্যাস দূরে ইলেকট্রনেরা। সেকেণ্ডে ২২শ কিলোমিটার বেগে ঘুরে চলেছে। ইলেকট্রনেরা এক থেকে অপরের দূরত্বও ঐরূপ।

**হাইড্রোজেন বনাম ইউরেনিয়াম।**

মৌল পদার্থের সংখ্যা আজ বোধ হয় ১০৩।

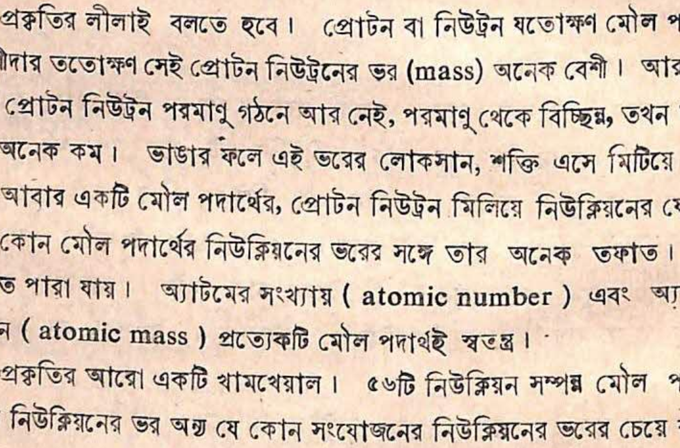
তারমধ্যে হাইড্রোজেন-ই ( উদজান ) একমাত্র মৌল পদার্থ যার কেন্দ্রে শুধু একটি নিউক্লিয়ন। সেই একটি মাত্র নিউক্লিয়নে আবার শুধুই একটি প্রোটন। নিউট্রন নেই। অন্য যে কোন মৌল পদার্থেই প্রোটন নিউট্রন উভয়ই থাকে।

এবং হাইড্রোজেন যেমনি সহজিয়া, ইউরেনিয়াম তেমনি ভারী, তেমনি জটিল। প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে নিউক্লিয়নের সংখ্যা সর্বাধিক। দুশো আটত্রিশটি। বিভিন্ন মৌল পদার্থের প্রোটন নিউট্রন বিন্যাসে বিশেষ তারতম্য থাকে।

প্রকৃতির লীলাই বলতে হবে। প্রোটন বা নিউট্রন যতোক্ষণ মৌল পদার্থের অংশীদার ততোক্ষণ সেই প্রোটন নিউট্রনের ভর (mass) অনেক বেশী। আর যখুনি সেই প্রোটন নিউট্রন পরমাণু গঠনে আর নেই, পরমাণু থেকে বিচ্ছিন্ন, তখন তাদের ভর অনেক কম। ভাঙার ফলে এই ভরের লোকসান, শক্তি এসে মিটিয়ে দেবে।

আবার একটি মৌল পদার্থের, প্রোটন নিউট্রন মিলিয়ে নিউক্লিয়নের যে ভর, অন্য কোন মৌল পদার্থের নিউক্লিয়নের ভরের সঙ্গে তার অনেক তফাত। এটা বুঝতে পারা যায়। অ্যাটমের সংখ্যায় ( atomic number ) এবং অ্যাটমের ওজনে ( atomic mass ) প্রত্যেকটি মৌল পদার্থই স্বতন্ত্র।

প্রকৃতির আরো একটি খামখেয়াল। ৫৬টি নিউক্লিয়ন সম্পন্ন মৌল পদার্থের প্রতি নিউক্লিয়নের ভর অন্য যে কোন সংযোজনের নিউক্লিয়নের ভরের চেয়ে কম।




প্রকৃতির লীলার কি শেষ আছে! আর একটি ভোজবাজি। কতকগুলি অবস্থার অধীন, ভর (mass) এবং শক্তি (energy) বিনিময়যোগ্য।

ধরা যাক 'ইউরেনিয়াম-২৩৫'-এর কেন্দ্রীন। ২৩৫টি নিউক্লিয়ন আছে। তাকে সমান চারটি ভাগে ভাগ করা গেল। ভাগ হবার আগে প্রতিটি নিউক্লিয়নের ভর যা ছিল, ভাগ হবার পর সেই ভর গেল কমে। ভাগ করার পর ভরের এই ক্ষতি, তৎক্ষণাৎ শক্তি দিয়ে পূরণ হবে।

এ আবিষ্কার আইনস্টাইনের। ১৯০৫ সালে। ভরের ক্ষতি শক্তি দিয়ে পূরণ হবে। আবার এই হলো পারমাণবিক বিস্ফোরণের রহস্য।

একটি নিউট্রনের তোপ দেগে ভারী ওজনের কেন্দ্রীন-কে **(nucleus),** ভেঙে ফেলা হয়। বিশেষ করে ইউয়েনিয়াম ও প্লুটোনিয়ামের ক্ষেত্রে এই তোপ দাগলে বিভাজিত খণ্ডাংশের সঙ্গে শাঁস থেকে বেশ গোটা কতো নিউট্রন মুক্তিলাভ করে। মুক্তি পাওয়া এই নিউট্রন দল মুক্তির আনন্দে তখন হৈ-হল্লা সুরু করে। কাছে পিঠের অন্য সমস্ত শাঁসের সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষে ধাক্কায় সেই প্রতিবেশী শাঁসগুলিকে চূর্ণ করতে থাকে। এবং আরো নতুন আরো তীব্র বিভাজনের উৎপত্তি ঘটায়।

আরও একটি ধাঁধা। কঠিন ঘন বস্তু (solid) আসলে নিরেট নয়। আসলে তা ফাঁকা দিয়ে গড়া। …"যারই কিছু ওজন আছে, যা কিছু জায়গা দখল করে আছে, তাকেই বলা হয় পদার্থ। হয় তা জীবন্ত, নয় তা নির্জীব। …সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, যত রকমেব জিনিসই আমরা দেখি—আকাশে, কি ৫৭৫,১০,০০০ বর্গ মাইল ধরাপৃষ্ঠে, কি ১৩,৯৪,৪০,০০০ বর্গ মাইল সমুদ্রের নীচে-আসলে কিন্তু মাত্র ১০৩টি (?) খোদ জিনিস দিয়েই তা তৈরী। প্রতিটি পদার্থ তৈরি আবার ঐ পরমাণু দিয়েই। এ দুনিয়ায় সবচেয়ে হাল্কা পরমাণু হল হাইড্রোজেন পরমাণু। একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন প্রায় এক গ্রামের দশ কোটি ভাগের একভাগ। আর সবচেয়ে ভারী পরমাণু হলো ইউরেনিয়াম-এর। তার একটি পরমাণুর পারমাণবিক ওজন হলো ২৩৮।…বিভিন্ন রকমের পরমাণুরা জাতে ও স্বভাবে এক রকম নয়। তাই এক ঘটি সোনার সঙ্গে এক ঘটি লোহার ওজন কখনও এক হয় না। বিভিন্ন রকমের সব পরমাণুরা আবার নানা রকমে মিশে নানান পদার্থের সৃষ্টি করে। প্রায় ক্ষেত্রেই পরমাণুরা নিজেরা স্বতন্ত্র ভাবে থাকে না। দুটি বা ততোধিক পরমাণু সমাহারে আণবিক অবস্থায় থাকে, যৌগিক বা মৌলিক যাই দেখি না কেন তা হলো সঙ্ঘবদ্ধ অণু।

বস্তুর প্রকাশের ভঙ্গি তিন রকম—কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়। এই তিন রকম আকার ছাড়া অন্য কোন আকারে বস্তু থাকতে পারে না। যেমন জল। কখনও

তরল পানীয়, কখনও বরফ, কখনও বাষ্প। জল হলো যৌগিক পদার্থ। হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেনের একটি পরমাণু মিশে গিয়ে জলের একটি অণু তৈরী হয়েছে। আমরা একটি অণু দেখিনা। দেখি অজস্র অণুর সমাহার।...অণুর জন্যই পরমাণুদের ঘর বাঁধা। এ পৃথিবীতে যা কিছু দেখছি তারা অণু ও পরমাণুর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। সব জিনিসই ভাঙতে ভাঙতে পৌঁছয় অ্যাটমে। অ্যাটম শব্দের উৎপত্তি—'অ্যা' অর্থে না, 'টম' হচ্ছে ভাঙা। যা ভাঙা যায় না, তাই অ্যাটম। যে কোন জিনিসই লক্ষ কোটি অ্যাটমের সমষ্টি।...আবার অ্যাটম বা পরমাণুই বস্তুর শেষ কথা নয়। এক একটি অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটন আর নিউট্রন মজুত আছে। প্রত্যেকের শেষতম অবিভাজ্য কণিকা হলো ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। একটা অ্যাটম এতো ছোট যে, খালি চোখে তো দূরে থাক, এমন কি কোন রকম শক্তিশালী অণুবীক্ষণের নিচেও আমরা দেখতে পাই না। একটি অ্যাটমের ব্যাস এক সেন্টিমিটারের পাঁচ কোটি ভাগের এক ভাগ। তার মধ্যে আবার রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। একটি অ্যাটমে সমান সংখ্যার ইলেকট্রন ও প্রোটন থাকে। বিভিন্ন রকমের অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রনদের ঘুরন্ত গতিবেগের প্রভেদ দেখা যায়। একটা অ্যাটমের যা কিছু ভার তা দেখা যায় কেন্দ্রে। ইলেকট্রনদের ওজন এতো নগণ্য যে তা অগ্রাহ্য করা চলে। তা হলে একটি পরমাণুর যে ভর, তার মূলে আছে নিউট্রন আর প্রোটনদের সম্মিলিত ওজন (প্রায় সমান সমান—নিউট্রনের সামান্য বেশী)। হাইড্রোজেন অ্যাটমে একটি ইলেকট্রন প্রোটনের চেয়ে ১৮৫০ গুণ হাল্কা।......সবচেয়ে সাদাসিধে ভিতরকার ব্যাপার হলো হাইড্রোজেনের।

## পঞ্চম অধ্যায়

# পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও ফলাফল

এতো পরিমাণে বিপদজনক যে পদার্থ তাকে নাড়াচাড়া করা যাবে কি করে ? তাকে দিয়ে বিভাজন অস্ত্র তৈরী করা যাবে কি করে ? ইউরেনিয়ামের 'হাফ লাইফ'-ই ৪৫০,০০,০০০০০—চারশো পঞ্চাশ কোটি বছর। এই সাড়ে চারশো কোটি বছর লাগবে তার, তেজস্ক্রিয়ার ফলে, পরিমাণে অর্ধেক হয়ে যেতে। যেখানেই তিনি থাকুন তেজ ছড়াতে থাকবেন। তেজস্ক্রিয়ার ফলে ইউরেনিয়াম পর পর রূপান্তরিত হতে থাকে। ইউরেনিয়াম থেকে রেডিয়াম। এবং সবশেষে সীসা। সীসার অ্যাটমে নিউট্রন ও প্রোটনের সংখ্যার তারতম্য থাকে না। থাকে না বলেই সীসার অ্যাটম স্থায়ী পর্যায়ের। তার আর রূপান্তর নেই। যতোক্ষণ পর্যন্ত অ্যাটমের কেন্দ্রে প্রোটন নিউট্রনের সংখ্যার অতিরিক্ত তারতম্য থাকবে প্রোটনের চেয়ে নিউট্রনের সংখ্যা অনেক বেশী থাকবে, ততক্ষণ সে নিউট্রনের সংখ্যা ঝরাতে থাকবে। নানাভাবে, ক্রমাগত ইলেকট্রন প্রোটন আর পজিট্রন ছড়িয়ে তেজস্ক্রিয় অ্যাটমটি হাল্কা হতে হতে প্রোটন নিউট্রন সমান সমান হয়ে স্থায়িত্ব পাবে।

সেই ইউরেনিয়ামকে নাড়াচাড়াই বা করবো কি করে ? তাকে দিয়ে অ্যাটম ভাঙার বন্দুকই বা বানাবো কি করে ?

১৯৩৮ সালে জোলিও কুরী অ্যাটম ভাঙার যে পদ্ধতি বের করে গেছেন আজও তা-ই চলছে। এতে বাইরে থেকে নিউট্রন কণিকা দিয়ে অ্যাটমকে আঘাত করা হয়। নিউট্রন কণিকা অ্যাটমের অন্দর মহলে এসে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে দেয়। একবার গুঁতোগুঁতির কাজ সুরু করাতে পারলেই হলো। তা আপনা আপনি চলতে থাকে। যতোক্ষণ না অ্যাটমগুলি ভেঙে গিয়ে একটা হেস্তনেস্ত এস্পার-ওস্পার হচ্ছে। উপযুক্ত শক্তির উপযুক্ত সংখ্যক নিউট্রন কণিকা বাইরে থেকে পাঠানো শুধু যথেষ্ট কষ্টসাধ্যই নয় অর্থসাধ্যও বটে।

যে কোন উপায়ে একটি নিউট্রন কণিকাকে বাইরে থেকে পরমাণুর ভিতরে পাঠাতে পারলেই হলো। তাহলেই কাজ হাসিল। সেটিই হবে ভাঙনের অগ্রদূত। বাদ বাকিটা আপনি হবে।

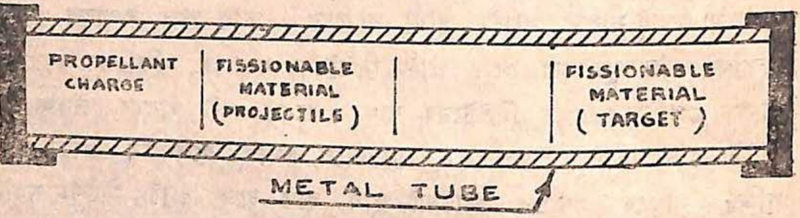
১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ হলো। তার আগের দিন ঐ বোম্বাদত্যিটিকে ক্রেনের সাহায্যে একশো ফুট উঁচু একটা লোহার স্তম্ভের মস্তকে

স্থাপন করা হয়। উঁচুতে তোলার সময় এবং তুলে রাখার সময় ভয়ে বুক কাঁপেনি, হেন লোক আশে আশে ছিল না। যদি পড়ে যায়, কী হবে ?

ইউরেনিয়ামটুকু অতিমাত্রায় সন্তর্পণে নাড়াচাড়া করতে হবে। তাকে রাখতে হবে প্রাক সন্ধি Sub-critical অবস্থায়। ব্যবহারকারীর ইচ্ছা ও প্রয়োজন মতনই যাতে তাকে সন্ধিভর ( Critical mass ) করে তোলা যায়। এবং যুক্ত হয়ে অতি সন্ধি ( Supercritical )-এর ধাপেও চলে যেতে পারে। Critical mass এর বাংলা—সন্ধি ভর।

দুটি উপায়—

দুটি উপায় বাজারে চালু আছে।




প্রাস এবং নিশানা পদ্ধতি Projectile and Target method। বন্দুকটির চেহারা থেকে বোঝা যাবে, দুটি বিভাজ্য পদার্থ। একটি প্রক্ষেপ্য, Projectile বা প্রাস। খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর, নিশানা। এই প্রক্ষেপ্য বা Projectile-টি এবং নিশানা বা Target-টি উভয়েই বিভাজনযোগ্য পদার্থ। এ সবের গোড়ায়, ছবিতে বাঁ দিকে, বিস্ফোরকের চার্জ। এই চার্জ ফায়ার করলে সেটি প্রথমে প্রাস বা প্রোজেক্টাইলের বিভাজনযোগ্য পদার্থে ধরুন ইউরেনিয়ামের ভর-এ বিভাজন সৃষ্টি করবে। কিন্তু বিভাজন যোগ্য দুটি ইউরেনিয়ামের ভর-ই প্রাক সন্ধিভর ( Sub Critical ) অবস্থায় রাখা ছিল। তাই প্রোজেক্টাইল মার্কা কিছু নীরেস ইউরেনিয়াম ফায়ার হলেও, টার্গেট মার্কা ইউরেনিয়ামের ভর-এ হামলা না-করা পর্যন্ত বিভাজন সম্পূর্ণ হবে না। এ যেন দুটি অর্ধেক মিলে এক সম্পূর্ণ করা। প্রোজেক্টাইল মার্কা ইউরেনিয়ামের ভর ফায়ার হয়ে পরমাণু ভেঙে নিউট্রন কণিকারা মুক্তি পেল। এই মুক্তি-পাওয়া নিউট্রন কণিকারা এইবার টার্গেট মার্কা ইউরেনিয়ামের ভর-এ হামলা সুরু করল। এবং শেষোক্তের অ্যাটমের অন্দর মহলে ঢুকে অ্যাটমগুলিকে ভাঙতে লাগল। এবং যেহেতু সজীব সমস্ত পদার্থ অ্যাটম দিয়ে গড়া তাদেরও ভাঙতে সুরু করল।

তা সে মানুষ ও পাখীর শরীরই হোক কিম্বা হাওয়া জলই হোক লোহার স্তম্ভই হোক। কারোকে রেহাই দিল না।

দুটি সাব ক্রিটিকাল বা প্রাক সন্ধিভর ইউরেনিয়ামকে, সন্ধিভর, বা সুপার ক্রিটিকাল বা অতি সন্ধিভর অবস্থায় আনবার জন্য এই ফায়ারিং-টি সম্পন্ন করতে হবে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। নইলে, প্রাথমিক বিভাজনের বেগ ভালো করে বিভাজন সুরু করার আগেই, ফুস করে শেষ হয়ে যেতে পারে। মূল বিভাজন সুরু না করতে পারে।

প্রক্রিয়াটিকে টিউব বা নলের অভ্যন্তরে করার আর একটি সার্থকতাও আছে। এতে পদার্থটিকে বেশ কিছুক্ষণ কাছাকাছি ধরে রাখা যায়। যার ফলে বিভাজন নিশ্চিত হতে পারে, বিভাজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

পারমাণবিক বিস্ফোরণে নিউট্রন দিয়ে যে তোপ দাগা হয় তাতে প্রায়-নির্ভার, ছোট্ট, দূরে দূরে ছিটানো ইলেকট্রনেরা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে না।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের রহস্যে ফিরে যাই।

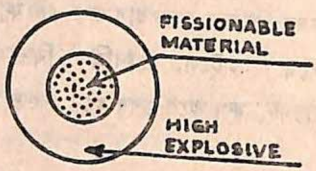
ইউরেনিয়ামের ভর-টি প্রয়োজন অনুপাতে যদি কম বা ছোট হয়, প্রাথমিক বিভাজন থেকে জন্ম পাওয়া নিউট্রনেরা, আরো বিভাজন সৃষ্টি করতে না পেরে, মৌল পদার্থের খপ্পর ছিঁড়ে কেটে পড়বে। বিস্ফোরণ ঘটবে না।

ইউরেনিয়ামের ভর বাড়ানো হলো। নিউট্রন দিয়ে তোপ দাগা হলো। প্রতিটি সময় কণিকায় যে ক'টি নিউট্রন বিতাড়িত হচ্ছে সেই ক'টিই তৈরী হতে থাকল, তার বেশী নয়। ইউরেনিয়ামটি তখন সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার ( **Critical**-এর ) প্রান্তে এসে থেমে রয়েছে। এতেও শৃঙ্খল বিক্রিয়া ( **Chain reaction** )—সৃষ্টি হল না। পারমাণবিক বিস্ফোরণ হবে না।

ইউরেনিয়ামের পরিমাণ তথা ভর আরো বাড়ানো হ'লো। নিউট্রন দিয়ে তোপ দাগা হলো। এবারে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ বেড়ে যাবার ফলে, নিউট্রন বেশী সংখ্যায় সৃষ্টি হতে পারল। এরা সমসংখ্যক নিউট্রন বিতাড়িত করেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে রইল। তারা আরো নতুন নিউট্রন তৈরী করতে লাগল, তাড়াতে লাগল, তৈরী করতে লাগল, তাড়াতে লাগল। তবু প্রাথমিক ইউরেনিয়াম, ভর-এ গুরু থাকায় নিউট্রন সংখ্যাগুরু হয়ে থাকল বরাবরই। যার ফলে ( চেইন রিঅ্যাকশান ) শৃঙ্খল বিক্রিয়া সুরু হলো। অর্থাৎ অবিরাম পরমাণু বিভাজন। অবিরাম অবিরত নিরন্তর ভর-এর ক্ষয়, শক্তিতে রূপান্তর, নতুন

পরমাণুর বাদাম ভাঙা, অর্থাৎ কেন্দ্রের নিউক্লিয়াস ভাঙা, ভেঙে নিউট্রন প্রোটন ভর-এর ক্ষয়, শক্তিতে রূপান্তর—এই শৃঙ্খল বিক্রিয়া চালু হয়ে গেল।

দ্বিতীয় উপায়কে বিতাড়ন পদ্ধতি বলা চলে।




চারদিকে উগ্র বিস্ফোরক দিয়ে মধ্যিখানের সব-ক্রিটিকাল ভর-এর ইউরেনিয়ামকে চাপতে চাপতে নিষ্পেষিত, প্রায় কোণঠাসা করে রাখা হয়। এতে শাঁসগুলি ( nucleus ) আরো কাছাকাছি আসতে বাধ্য হয়। যাতে নিউট্রনেরা ইউরেনিয়াম শাঁসগুলির সঙ্গে সংঘর্ষ না করে সহজে বেরিয়ে আসতে না পারে। অতিমাত্রায় চাপের ফলে সাধারণত সাব-ক্রিটিকাল ভর তার ঘাটতি মিটিয়ে ক্রিটিকাল হয়ে উঠে—তথা সক্রিয়তা প্রাপ্ত হয়ে—পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

ফিশান ( বিভাজন ) প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত হলো ফিউশান বা একত্রীকরণ প্রক্রিয়া। হাল্কা মৌল পদার্থের শাঁসগুলিকে একে অপরের সাথে যুক্ত করে ভারী মৌল পদার্থে পরিণত করা হয়। ৫৬ সংখ্যার নিউক্লিয়নের সীমারেখা পর্যন্ত, অত্যন্ত হাল্কা মৌল পদার্থগুলির প্রতি নিউক্লিয়ন পিছু ভর, অপেক্ষাকৃত ভারী ভারী পদার্থের নিউক্লিয়নের ভরের চেয়ে বেশী বলে এইসব ক্ষেত্রে ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করে মুক্তি দেয়া হয়। ফিউশান প্রক্রিয়ার পারমাণবিক বিস্ফোরণে হাইড্রোজেন কিম্বা হাইড্রোজেনের আইসোটোপ দ্রবীকরণ করে ভারী মৌল পদার্থে পরিণত করা হয়। বলা বাহুল্য, এই প্রক্রিয়াতে অতিমাত্রায় উচ্চতাপ ও চাপের প্রয়োজন। অথচ, এই ব্যাপারে প্রয়োজন দশ লক্ষ ডিগ্রীরও বেশী তাপমাত্রা। এই তাপমাত্রা পাবার একমাত্র উপায় হলো বিভাজন ঘটানো। তার মানে একত্রীকরণ পদ্ধতির বিস্ফোরণ। মানে দুটোরই সংমিশ্রণ। বিভাজন সঙ্গে সঙ্গে একত্রীকরণ। কাজেই, ৫৬ সংখ্যার নিচের নিউক্লিয়ন সমন্বিত হাইড্রোজেন বোমা তৈরীর ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, ইউরেনিয়াম প্লুটোনিয়াম বোমার চেয়ে ডবল। প্রথমে বিভাজন করে হাল্কা নিউক্লিয়নগুলিকে একত্র করে ভারী

করে তোলো। তারপর বিস্ফোরণ। হাইড্রোজেন বা সমান অ্যাটমিক সংখ্যার অন্য পদার্থ ( ৫৬ সংখ্যার নিচের গোষ্ঠী ) পাওয়া যেমন সোজা, বিস্ফোরণ ঘটানো তেমনি কঠিন। তার চেয়ে ইউরেনিয়াম ( ২৩৫ নিউক্লিয়নওয়ালা ) বা প্লুটোনিয়াম ( ২৩৯ নিউক্লিয়নওয়ালা যা থেকে নেপচুনিয়াম বাদ দিয়ে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় ) জোগাড় করাই ভালো। বোমা তো বোমা ইউরেনিয়ামের !

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট দেশ, চীন—এরা রাজা ব্যক্তি। এদের পরই কানাডা—উচ্চপর্যায়ের ইউরেনিয়াম খনির মালিক। কাঁচা মালের রাজা। সুইডেন—পৃথিবীর অর্ধেক ইউরেনিয়ামের মালিক। যদিও কিছু নিচু জাতের এই খনিজ সম্পদ। ভারতের শুধু নিচু মানের ইউরেনিয়ামই প্রচুর আছে তা-ই নয়, থোরিয়ামও যথেষ্ট। প্লুটোনিয়াম থেকে নেপচুনিয়াম ইত্যাদি বাদ দিয়ে ইউরেনিয়ামের সমতুল তৈরীর কাজও চলছে এই ভারতের মহা মানবের সাগর তীরে।

কাঁচা মালের জন্য এদের দ্বারস্থ হয়ে ঐ ইউরেনিয়াম সংগ্রহের চেষ্টাই ভালো। হাইড্রোজেনকে ভারী কর ; আগে ফিশন পরে ফিউশান। ও বড়ো হাঙ্গামা।

## পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল

পারমাণবিক বিস্ফোরণের অর্থ হলো অতি অল্প সময়ে অতি বৃহৎ শক্তির মুক্তি প্রাপ্তি। এই দানবিক অতিকায় শক্তির মুক্তির ফলে, বিস্ফোরণের উৎপন্ন দ্রব্য ও পারিপার্শ্বিক, দশ লক্ষ ডিগ্রীর চেয়েও উত্তপ্ত সাদা হয়ে গিয়ে গরম গ্যাসের বিরাট গোলক সৃষ্টি করে। এই গ্যাস অতো উত্তপ্ত বলেই বিরাট চাপ ও গতিবেগ সৃষ্টি ক'রে বিস্ফোরণের চার পাশের সব কিছুকে ধাক্কা মারতে থাকে। যতক্ষণ না চাপ তাপ থিতিয়ে যাচ্ছে। হাওয়ায় হলে এই চাপের ঢেউকে ব্লাষ্ট ঝাপটা বা বিস্ফোরণ বলে। জলে বা ভূমধ্যে বিস্ফোরণ হলে ঐ চাপকে বলা হয় শ্বক বা আকস্মিক অতর্কিতে ধাক্কা।

মামুলী ও এতাবৎকাল জানা রাসায়নিক বিস্ফোরণের ঝাপটার তুলনায় পারমাণবিক বিস্ফোরণের ঝাপটার প্রচণ্ডতা সহস্র সহস্র গুণ বিধ্বংসী। এ ছাড়াও আরো দুটি বিরাট তফাত আছে। এক নম্বর, মুক্তি পাওয়া পারমাণবিক শক্তির এক তৃতীয়াংশ উত্তাপ এবং আলো হয়ে যায়। এই উত্তাপ বিকিরণ এতোই প্রচণ্ড যে, পুড়িয়ে তো মারে-ই, অনেক দূরে দূরান্তে অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ করে

দেয়। দু নম্বর, পারমাণবিক বিকিরণ ( nuclear radiation ) অতি মাত্রায় বিপজ্জনক ও অন্তর্ভেদী রশ্মির জন্ম দেয়। বিস্ফোরণের সময়ে প্রাথমিক বিকিরণ তো আছেই, বিস্ফোরণে-উৎপন্ন সব ক্রিয়াকাণ্ড তেজস্ক্রিয় হয়ে থেকে যায়। বহু দিন বহু বছর পর্যন্ত তার চরম ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া নির্গত হতে থাকে। এই বছর-বছর পর্যন্ত স্থায়ী ক্ষতির ক্ষমতাকে বলা হয় অবশিষ্ট তেজস্ক্রিয়তা ( residual radioactivity )।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে যে শক্তি নির্গত হয় তাকে টি এন টি বিস্ফোরণের 'মান'-এ বলা হয়। পরিমাপের একক হলো কিলোটন। অর্থাৎ এক কিলোটন (বা এক হাজার টন ওজনের) টি এন টি বিস্ফোরণ করলে যে শক্তি (এনার্জি) পাওয়া যেত। কিলোটন তো কিছু নয়। আজকাল মেগাটনের কারবার চলছে। মেগাটন হলো দশ লক্ষ টন। একশো মেগাটনও তো আসরে হাজির।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের পনেরো শতাংশ পারমাণবিক বিকিরণে পরিণত হয়। আবার এরও তৃতীয়াংশ তার মানে আদ্যাশক্তির পাঁচ শতাংশ প্রাথমিক কিস্তিতেই উচ্চমানের গামা রশ্মি বিকিরণ করে। অতি মাত্রায় শক্তিশালী একস-রশ্মির মতোই এই গামা রশ্মি। গামা রশ্মি লম্বা লম্বা পা ফেলে যে কতো দূর চলে যায়। এবং তাদের ভেদন ক্ষমতাই বা কী মারাত্মক। চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, শোঁকা যায় না, জিভ দিয়ে চাখা যায় না, চামড়ার ওপর ভালো মন্দ কিছুই লাগে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। কিন্তু শরীরের ভেতরের কলকব্জায় অবধি এর প্রবেশ। সজীব পদার্থের ওপর বিষম বিষক্রিয়া। জ্যান্ত কোষগুলিকে বিদ্যুতায়িত ( ionize ) করে প্রভূত পরিমাণে। মারাত্মক প্রাণঘাতী তো বটেই, বিক্রিয়া সৃষ্টি করে মানুষ ও প্রাণীর শরীরের ওপর ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতি ঘটায়।

বাকি দশ শতাংশ শক্তি অবশিষ্ট বিকিরণ হয়ে আকাশে বাতাসে নহুষের প্রেতাত্মার মতন, একটু বাড়িয়ে বলা যায়, অনন্ত কাল ধরে ঘুরে বেড়ায়। এর উৎপন্ন দ্রব্য হলো গামা এবং বীটা রেণু। অতিদ্রুত গতিতে ভ্রাম্যমাণ ইলেকট্রনই হলো এই বীটা রেণু। গামা রশ্মির মতো অতোটা অন্তর্বেধের ক্ষমতা বা বিদ্যুতায়নের ক্ষমতা বীটা রেণুর নেই। জামা কাপড়ে বা চামড়াতেই বীটা রেণু আটকে যায়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে, আহার্য বা পানীয়ের সঙ্গে শরীরের অভ্যন্তরে গ্রহণ না করা পর্যন্ত বীটা রেণুর নাশকতার ক্ষমতা নেই-ই বলা চলে।

বিস্ফোরণটি নিকটে ঘটলে সন্নিহিত সব দ্রব্যই তেজস্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে। মাটির কাছাকাছি বিস্ফোরণ ঘটালে ঠিক নিচেকার জিনিসপত্র অতিমাত্রায় ভাস্বর করে তুলে আকাশে অনেক উঁচুতে উড়িয়ে দেয়। পরে যখন এই সব তেজস্ক্রিয় সামগ্রী আকাশ থেকে আস্তে আস্তে ভূমিষ্ঠ হতে থাকে তখনও এই সব 'ফল-আউট' জ্যান্ত প্রাণীর পক্ষে দারুণ ক্ষতিকর। আর একটা মজা। এই সব তেজস্ক্রিয় সামগ্রী যখন মাটির দিকে নামতে থাকে, নিচেকার বাতাস তখন আর তাকে গোলাকার থাকতে দেয় না। টেনে লম্বা করে চুরুটের আকার করে ছাড়ে। দিগন্তের পটভূমিতে যেন চুরুট ঽঙা একটি বিরাট চুরুট। তেজস্ক্রিয় সামগ্রীর 'ফল আউটে'র জমাট হওয়া এলাকায়, সরাসরি অনাবৃত অবস্থায় ধরা পড়লে, ফল প্রাণঘাতী। সৌভাগ্যবশত যারা ধরা পড়বেন, পূর্বে জানতে পারলে, তারা প্রতিষেধকের আশ্রয় নিতে পারবেন। অর্থাৎ অতো মারাত্মক দৈত্যেরও মরণ কাঠি আছে। ঐ 'ফল-আউট' কাঠ, ইট ধুলো বালি জল ইত্যাদি যে কোন স্থূল পদার্থই ভেদ করতে পারে না—এই যা বাঁচোয়া। আর একটা বাঁচোয়া, সময়ের সঙ্গে তেজস্ক্রিয়তাও কমতে থাকে। মারাত্মক 'ফল-আউট' তক্ষুণি মারাত্মক। কয়েক ঘণ্টা পরে নয়। কয়েক দিন কেটে গেলে তো কথা-ই নেই।

সুফল (না কুফল?) পেতে গেলে মিসাইল বাহিত পারমাণবিক বোমা উড়ন্ত অবস্থায় একটি বিশেষ সময়েই বিস্ফোরিত হবে। এমনি পরিকল্পনা করেই আকাশে ছাড়া হয়। আকাশে বিস্ফোরণ ঘটলে তার ফল হবে সব চেয়ে মারাত্মক। মাটির ওপর বা ভূগর্ভে, জলের ওপর বা জলের তলায় ফাটালে মারাত্মকতা হবে অনেক অনেক কম।

প্রথমে বিচার করা যাক বোমাটা হাওয়ায় ফাটালে কি ফল পাওয়া যাবে। মিসাইলের টিপকল বা ট্রিগার টানার সঙ্গে সঙ্গে, একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই, অতিমাত্রায় গরম ভাস্বর গ্যাসের গোলাকার 'বল' তৈরী হবে। এটিকে বলা হয় অগ্নিগোলক। আগুনের বল। বাতাসে ফাটানো হলে এক মেগাটন বোমার দরুণ এই আগুনের গোলা এক মাইল ব্যাস পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হবে। এটিকে যদি হাওয়াই বিস্ফোরণ বলতে চাই তাহলে কিন্তু এই এক মাইল ব্যাসের আগুনের গোলা মাটি ছুঁলে চলবে না। এক মেগাটন বোমার প্রাথমিক উত্তাপ বিকিরণ অতি প্রচণ্ড। মানুষের গায়ের চামড়া অনাবৃত পেলে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে

বারো মাইল দূর পর্যন্ত। আর তাপ? টের পাওয়া যাবে, সে তো ষাট মাইল দূর পর্যন্ত।

এক মেগাটনের তেজস্ক্রিয়তা বিকিরণ কয়েক মাইল ব্যাস নিয়ে অত্যন্ত গুরুতর হবে। বিকিরণের হাত থেকে নিস্তার পেতে গেলে, দুমাইল দূরে তিন ফুট পুরু কংক্রীট বা সমতল জিনিসের আড়াল নিতে হবে। অবশিষ্ট বিকিরণ অনেক দূর দূরান্তে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লেও টাটকা টাটকা মাটিতে এসে পৌছবে না। আকাশেই ভাসতে থাকবে অনেকক্ষণ। নামবে ধীরে ধীরে। যদি না ভারী রকমের বৃষ্টিপাত তাকে ঘাড় ধরে মাটিতে পৌছে দেয়।

এক মেগাটন বোমার ঝাপটা-টা তৈরী হয় আগুন গোলার মাত্রাধিক উত্তপ্ত গ্যাসের সম্প্রসারণ থেকে। ঢেউয়ের সামনেটাকে বলে শুক ফ্রণ্ট, অতর্কিত ধাক্কার অগ্রভাগ। কল্পনা বহির্ভূত দ্রুত গতিতে অগ্রসরমান একটি সংনমিত বায়ুর দেয়াল। প্রথম দশ সেকেণ্ডে এই দেয়ালটি চার মাইল এগিয়ে যায়। প্রথম মিনিট অন্তে সেটি বারো মাইল পৌছে গেছে। এবং আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে প'ড়ে শব্দসম গতিতে এগোয়।

মাত্রাতিরিক্ত চাপের এককে এই বিস্ফোরিত বোমার ঝাপটার দাপটকে পরিমাপ করা হয়। মাত্রাতিরিক্ত চাপ বা 'ওভার প্রেশার' হ'লো সাধারণ চলতি মানের হাওয়ার চাপের উপরি যেটা। এই ওভার প্রেশার যদি বর্গ ইঞ্চিতে এক পাউণ্ড বা বেশি হয় যে-কোন বাড়ি বা কাঠামোই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই মাত্রাতিরিক্ত চাপের হাত থেকে বাঁচা কিন্তু খুব কষ্টসাধ্য নয়। এক মেগাটন বোমার দরুণ এই ওভার প্রেশার ছ মাইল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে।

অন্তরীক্ষে ( space এ ) যদি বোমা ফাটানো হয় তার ফলাফল তো সম্পূর্ণ অন্যরকম। সবচেয়ে নাটকীয় তফাত হবে এই যে, অন্তরীক্ষে ব্লাস্ট ওয়েভও তৈরী হবে না। সেখানে হাওয়া নেই, এ সব ধাক্কা ধুক্কি বয়ে নিয়ে যাবে কে? সেখানে হাওয়া নেই, হাওয়া সংনমিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। হাওয়ার দেয়ালের দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার প্রশ্নও নেই। নির্বাত নিষ্কম্প বায়ুশূন্য স্পেস-এ আগুন গোলা দ্রুতই মণিহারা ফণী বা দাঁতভাঙা সাপের মতো নির্জীব হয়ে পড়বে। অপর-পক্ষে বিকিরণ কিন্তু দ্রুত, অতি দূরে ছড়িয়ে পড়বে। হাওয়া নেই যখন, হাওয়ায় মিশে পাতলা হবার প্রশ্নও ওঠে না। বিকিরণের লব্ধ ফলস্বরূপ উত্তাপ, গামা ও বীটা রশ্মির উপদ্রব, অতি দ্রুত দূরে ছড়িয়ে পড়বে। বাধা দিতে হাওয়া নেই।

মনের আনন্দে বিনা টিকিটে, বিনা টিকিট-চেকারে তারা বাধাবন্ধহীন ভ্রমণ সুরু করবে। কেউ রুখবে না। এই বিকিরণ যে কতো দূর যাবে তা আজো হিসেব হয় নি। অবশিষ্ট তেজস্ক্রিয়তার (residual radioactivity) কুফল হবে সামান্যই। কারণ, বিস্ফোরণজনিত ক্রিয়াকলাপ অতি অল্প সময়ে অত্যন্ত বেশী আয়তনে ছড়িয়ে প'ড়ে বিস্তীর্ণ হয়ে পাতলা হয়ে যাচ্ছে। বিস্ফোরণের হাতে হাতে ফলও বেশী হতে পারছে না। সে তার ঝাপটার তাণ্ডবের বৃত্তে তো কোনো বড়ো সড়ো আয়তনের লক্ষ্যবস্তু পাচ্ছে না। তার খোরাক জোগাতে হলে তো আকাশে ক্যাসল বা দুর্গ বানাতে হতো।

ভূতল বিস্ফোরণ ( সারফেস বার্স্ট ) ঠিক ঠিক ভূপৃষ্ঠে বা কিছুটা ওপরে হতে হবে। যাতে আগুনের গোলা মাটি ছুঁতে পারে। উভয়ক্ষেত্রেই ডবল সর্বনাশ হচ্ছে। হাওয়াই বিস্ফোরণের সাথে সাথে জলে বা স্থলে শ্বক ওয়েভ হচ্ছে। ভূতলের যতো নিকটে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে, ততোই চাপের ঢেউয়ের তীব্রতা, ভূতল বা জলে শ্বক হিসেবে শুষে নেবে। তার মানে হাওয়াই বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা সেই পরিমাণেই কমে যাবে। প্রারম্ভিক বিকিরণের উৎপন্ন ফল নির্ভর করবে, ভূপৃষ্ঠের কতোটা ওপরে বিস্ফোরণ ঘটানো হলো তার ওপর। একেবারে জল বা মাটির ওপরই যদি বোমা ফাটানো হয়, প্রারম্ভিক বিকিরণের সবটাই মাটি বা জলে খেয়ে নিয়ে খোয়া গেল। অবশিষ্ট তেজস্ক্রিয়তার উৎপন্ন ফল অশেষ গুণে বর্ধিত হবে, যদি বিরাট পরিমাণ ধূলোবালি বা জলকে সে বাষ্প করে নিতে পারে। এবং বিস্ফোরণের ঝাপটায় উড়িয়ে নিয়ে, তেজস্ক্রিয়তা দিয়ে সেই ধূলোবালি কলুষিত করার সুযোগ পায়। অর্থাৎ বিস্ফোরণের নিচে এই ধূলো-বালি জাতীয় অপদার্থ জিনিষ-ও বোমার তেজস্ক্রিয়ার পরশমণির ছোঁয়ায়, দুর্দান্ত শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। জল হলে তো কথাই নেই। টপ করে বাষ্প হয়ে তেজস্ক্রিয়ার কলুষ মেখে নিয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াল। এক মেগাটন বোমার পাঁচ শতাংশ তেজও যদি বাষ্প তৈরীর কাজে লেগে যায়, তা হলে ২০,০০০ টন ধূলোবালি বা এক লক্ষ টন জল বাষ্প হয়ে তেজস্ক্রিয় হতে কতোক্ষণ? এই তেজস্ক্রিয় বাষ্পীভূত বস্তু-রা দ্রুত আকাশে উঠে যায় এবং মাটিতে নামে আস্তে—ধীরে। তখন তারা কলুষিত কণা কিম্বা কলুষিত শীকর। হাওয়া সেগুলিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় চতুর্দিকে দূরে দূরান্তরে, বহু বহুদূর অবধি। ১৯৫৪ সালে বিকিনি প্রবাল বলয়ে ( এটলে ) যে মহাশক্তিশালী বোমা

ফাটানো হয়েছিল সেটি সাময়িকভাবে কলুষিত করেছিল ২৫০ মাইল লম্বা ৪০ মাইল চওড়া জায়গা। এই দশ হাজার বর্গ মাইল কলুষিত করতে সময় লেগেছিল দশ ঘন্টার মতো।

এটা প্রমাণিত সত্য যে, "শরীরের সারা অংশে অতিরিক্ত মাত্রায় তেজস্ক্রিয় রশ্মি যদি সামান্য সময়ের জন্যও বর্ষিত হয়, তা হলে মৃত্যু ঘটবে। মাত্রা কম হলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে। এবং মাঝারি মাত্রার বিকিরণ, প্রজননগত পরিবর্তন সৃষ্টি করবে।"

একটি প্রশ্ন প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয়—বুঝ সমুঝ লোকের মনে এ প্রশ্ন উদয় না হয়েই পারে না। প্রশ্নটি এই,—পারমাণবিক বোমা কি ভূপৃষ্ঠের তাবৎ জায়গা তেজস্ক্রিয়ায় কলুষিত ক'রে সমস্ত মনুষ্য জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারে? মানুষ নামক প্রাণীর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর কি সমাসন্ন? নেভিল শুট একজন ঔপন্যাসিক। "সাগর সৈকতে" নামক উপন্যাসে তিনি এর উত্তর দিয়েছেন ইতিবাচক। এবং মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব 'নট' করে দিয়েছেন। অতো নিরাশাবাদী না হলেও চলবে। তার আশঙ্কা সুদূর পরাহত। খানিকটা করে জায়গার লোকজনকে হিরোশিমা নাগাসাকির মতো যুপে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে ভূপৃষ্ঠের স্থল ভাগে মানুষের আস্তানা যেখানে যেখানে আছে! কিম্বা গোটা পৃথিবীর আবহাওয়া কুলষিত করা! নৈব নৈব চ। সেইরকম আত্মঘাতী কুমতলব যদি কারো থাকে, তাকে কী করতে হবে? বিকিনি প্রবালবলয়ে ফেলা বোমা সবচেয়ে শক্তিশালী। পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠকে সমান সমান ভাগ করে সম দূরে কয়েক লক্ষ ঐ বোমা একই সময়ে ফেলতে হবে। কাগজে কলমে, ঐ ঘনত্বের 'ফল আউট' প্রাণঘাতী হলেও, ক্রমান্বয়ে তাদের তীব্রতা কমতে থাকবে। তখন আর তারা প্রাণঘাতী থাকবে না। যারা 'ফল আউটে'র নিরাপদ শেলটারে আশ্রয় নেবেন তাদের তো কিছুই হবে না।

আমি একটা মোটা হিসেব দিচ্ছি। আফ্রিকার স্থলভাগ—এক কোটি ষোল লক্ষ ছিয়ানব্বুই হাজার পাঁচশো বাহাত্তর বর্গ মাইল। এশিয়ার—এক কোটি চুয়াত্তর লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশো তিরাশী। ওশেনিয়া (প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী ও নিকটবর্তী দ্বীপ সমূহ)—তেত্রিশ লক্ষ তিন হাজার দুই। ইউরোপ—পঁয়ত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার সাতশো পঞ্চান্ন। অ্যান্টার্কটিকা (দক্ষিণ মেরুর

নিকটবর্তী দেশগুলি )—একান্ন লক্ষ। উত্তর আমেরিকা—তিরানব্বুই লক্ষ সাতান্ন হাজার ছাব্বিশ। দক্ষিণ আমেরিকা—আটষট্টি লক্ষ আটষট্টি হাজার আটানব্বুই বর্গ মাইল।

পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। এই তিন ভাগ জলে, জলের মধ্যে, জলের তলায় জ্যান্ত প্রাণী অনেক আছে। তারা থেকেই যাবে। তাদের বাদ দিয়ে মানুষের বসবাস, বাকি ঐ এক ভাগ স্থলের মোট আয়তন—পাঁচ কোটি তিয়াত্তর লক্ষ বারো হাজার ছত্রিশ বর্গ মাইল।

বিকিনি এটলের অ-সাধারণ বোমার কলুষিত করার ক্ষমতা দুশো পঞ্চাশ গুণিতক চল্লিশ মাইল। তার মানে দশ হাজার বর্গ মাইল। প্রাণ নাশের ক্ষমতার ব্যাপকতা এর সিকিও নয়। যাইহোক পুরো দশ হাজার বর্গ মাইলও যদি ধরা যায়, তাহলে, পাঁচ কোটি তিয়াত্তর লক্ষ বারো হাজার ছত্রিশ বর্গ মাইলে, দশ হাজার বর্গ মাইল দিয়ে ভাগ দিলে দাঁড়াচ্ছে পাঁচ হাজার সাতশো একত্রিশটা।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত দেশ, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন এই বৃহৎশক্তিরা ইনকাম ট্যাক্সের হিসেব দাখিল করেন না। করতে বয়ে গেছে তাদের। এই পঞ্চবটির তলায় তলায় আগাছা যারা, তারাও পারমাণবিক বোমার যে হিসেব দাখিল করেছেন সেগুলি দু নম্বর খাতার, অনুমান করি। তাদের হাতে মজুত বোমার হিসেবের সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। মেগাটন নাকি কারোও তৈরী নেই। সব কিলোটনের মামলা। ইটালীর আছে—তেতাল্লিশ কিলোটন, পশ্চিম জার্মানীর তিয়াত্তর, কানাডায় সতেরো, ভারতের সাতাশটি ( তৈরী নেই ), জাপান বিরেনব্বুই, সুইডেন তেতাল্লিশ, স্পেন বিয়াল্লিশ, পাকিস্তান নয়। একুনে তিনশো ছেচল্লিশটি কিলোটন মজুত আছে। এ হিসেব সত্তর সালের।

পৃথিবীর সব মানুষকে মেরে ফেলতে বিকিনি এটলের বোমার মতো অন্তত হাজার পঁচিশ বোমার দরকার। তাও সমদূরে রেখে একই সঙ্গে যুগপৎ ফাটাতে হবে।

আর তার জন্যে আর একটি জিনিস যেটি দরকার, সেটি হলো বৃহৎ পঞ্চশক্তির বিভেদ ভুলে যাওয়া। এবং, দু নম্বর দরকার তাদের আত্মঘাতের দৃঢ় সংকল্পের একাগ্রতা—আমরা সবাই একই সঙ্গে আত্মহত্যা করবো-ই—এই প্রতিজ্ঞা।

সাত মণ তেল কি পুড়বে ? রাধাও নাচবে না।

পারমাণবিক বোমার ধ্বংসের ক্ষমতার ব্যাপকতার প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

ভূপৃষ্ঠের তলায় বা জলের মধ্যে যদি বোমা ফাটানো যায়, বেশীর ভাগ শক্তিই ভূ-মধ্যের বা জলের তলার শক বা অতর্কিত ধাক্কা হিসেবে অপব্যয় হবে। ভূ-পৃষ্ঠের কতো কাছে বোমাটা ফাটানো হলো তার ওপরে নির্ভর ক'রে এই হাওয়াই ধাক্কা বেশীটাই অপচয় হয়ে যাবে। অকুস্থলের ( না, কু-স্থলের ? ) চারপাশের জল মাটিই বেশীর ভাগ উত্তাপ এবং প্রাথমিক বিকিরণ শুষে নেবে। আর জল মাটির এই ব্লটিংয়ের ফলে খুব কম মাত্রার বিকিরণই জলের বা মাটির তলা থেকে ওপরে এসে প্রাথমিক বিকিরণের ক্ষতি করতে পারবে। প্রাথমিক বিকিরণের ক্ষতি করতে পারল না হয়তো—কিন্তু দুর্জন যে, সে দুষ্কৃতি না-করে কি থাকতে পারে ? এমনিতে ( মাটির অনেক ওপরে ) এয়ার বার্স্ট হলে আকাশ বাতাস জল খানিকটা কলুষিত হবে ঠিকই। তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণ জল মাটি অবশিষ্ট তেজস্ক্রিয়তায় দূষিত কলুষিত হয়ে থাকবে। এবং হত্যার বিষ ও বীজ বহন করতে থাকবে।

## উচ্চ মানের বিস্ফোরক এবং খণ্ডীভবন বিস্ফোরক

মানুষ কি দিয়ে কি হচ্ছে না-জেনেই বহু শতাব্দী ধরেই বিস্ফোরক ব্যবহার করে আসছিল। না-বুঝেও আশ্চর্য রকম মৌল পদার্থের অণুর পুনর্বিন্যাস করে সে শক্তির মুক্তি দিচ্ছিল। এইগুলিকে চলতি ভাষায় রাসায়নিক বিস্ফোরণ বললেও শুদ্ধতর নাম হবে আণবিক বিস্ফোরণ। কারণ অণু নিয়েই এদের কারবার। তাদের পুনর্বিন্যাস করেই দুরন্ত শক্তি বেরিয়ে আসে বোতলের থেকে ভূতের মতন। ঐগুলিই আণবিক বোমা হওয়া উচিত। আর বিকিনি এটল, হিরোসিমা নাগাসাকির গুলি পারমাণবিক। কারণ অণুরও অন্দর মহলে ঢুকে পরমাণু নিয়ে এদের কারবার। পরমাণুর পুনর্বিন্যাস নিয়ে এদের লেনদেন।

রাসায়নিক বিস্ফোরক দুই রকমের। প্রপেল্যান্ট বা উৎক্ষেপক। আর, উচ্চ মানের বিস্ফোরক। হাই এক্সপ্লোসিভ। উৎক্ষেপক শ্রেণীর বিস্ফোরকের দহিকা শক্তি এতো মন্থর যে, তারা শুধু বন্দুক কামানের নলের মধ্যে থেকে প্রাস ( Projectile ) বা মিসাইলই ছুঁড়ে দিতে পারে। কিন্তু মিসাইলের ওআর-হেড হিসেবে চিরকাল উচ্চ মানের বিস্ফোরকেরই প্রয়োজন। তাদের দহিকা শক্তির গতি প্রতি সেকেণ্ডে কয়েক হাজার ফুট হওয়া অত্যাবশ্যক। দহনের দ্রুততা

যতো বেশি হবে, চারপাশ চূর্ণ করার ক্ষমতা brisance-ও ততো বেশি হবে।* উচ্চমানের বিস্ফোরক অতি দ্রুত দহন করে। এই প্রক্রিয়াকে ডিটোনেশান বলা হয়।

এই ডিটোনেশান ক্রিয়াটিকে এক বা একাধিক কাজে লাগানো হয়। (এক) বিস্ফোরণের ঝাপটার দাপট দিয়ে খুব সুরক্ষিত মোটা নিশানা বেধ করানো, (দুই) অনেক ছোট মিসাইল দিয়ে গড়া প্রাস-কে নিক্ষেপ করা। ধরুন, নিশানা হলো সাঁজোয়া গাড়ী। সেটা খুব মোটা ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরী। কিম্বা ধরুন, জাহাজের খোল। সেটাও মোটা-ইস্পাতের ও কাঠের। আমাদের লক্ষ হবে, একটা সাঁজোয়া গাড়ী বা জাহাজের দুর্বলতম পয়েন্টে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাদের পেটের মধ্যে ঢুকে পড়া, যেখানে তার গুরুত্বপূর্ণ হৃদযন্ত্র আছে। আছে হয়তো বিস্ফোরকের স্তূপ। এই মোটা পাত, তিন ইঞ্চি পর্যন্ত পুরু হয়। তাকে বিঁধতে গেলে মুখ ছুঁচলো ও আকৃতিতে গোল হওয়ার দরকার।




মনে করুন, মিসাইলটির নিশানা একটি দেয়াল। বিস্ফোরকবাহী গোলাটির মুখের দিকে আকারটি অবতল (Concave)। বিস্ফোরকটি ফাটলে, দহন ক্রিয়াটি এত দ্রুত হয় এবং ঝাপটার ঢেউ তৈরী হয়ে ওঠার আগেই, সেটি বিস্ফোরকের সর্বস্তরে সঞ্চারিত হয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের ঝাপটার ঢেউ তখন, বিস্ফোরকের সঙ্গে লম্বভাবে বাইরে আসার চেষ্টা করে। বিস্ফোরকের মুণ্ডুটি অবতল হওয়ার ফলে ঝাপটার ঢেউগুলি বিস্ফোরকের অক্ষরেখার কেন্দ্রীভূত ও একাগ্র হয়ে যায়।

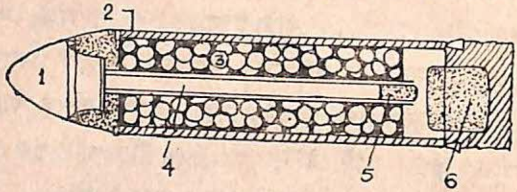
ফোকস (focus) হওয়া ঝাপটার ঢেউ-এর লব্ধ ফল (resultant) একটি গ্যাসের জেটের আকার ধারণ করে। যার বেগ, তাপমাত্রা আর চাপ একাগ্র হওয়ার ফলে, বিস্ফোরকের অন্য যে কোন অংশের চেয়ে বহুতর গুণে বেশী।

এই বিশেষ আকৃতির গুণে অপেক্ষাকৃত ছোট মিসাইলও অতিমাত্র চিমড়ে (toughest) জিনিস বেধ করতে পারে। যথা, ইস্পাতের কয়েক ইঞ্চি পুরু

* brisance কথাটির অর্থ হলো—the shattering or crushing effect of an explosive (কোন বিস্ফোরকের বিস্ফোরণের ফলে, জিনিস চূর্ণ করার ক্ষমতা)।

পাত কিম্বা বেশ কয়েক ফুট পুরু রিইনফোর্সড কংক্রীট। কিন্তু তার জন্য দরকার ঠিক পয়েন্টটিতে লম্বভাবে আঘাত জমানো। নইলে, গ্যাস জেট ঠিক মতো কাজ করতে পারবে না। সবচেয়ে পুরু বেধ বিদ্ধ হবে না। সবটাই অকেজো হয়ে যাবে। ট্যাঙ্কধ্বংসী, দুর্গধ্বংসী, ফরাসীর এস-এস-১১ মিসাইল এই মূল তত্ত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

খণ্ডীভবন (fragmentation) বিস্ফোরকের কোন না কোন আকারে প্রচলন আগেই ছিল। কামানের গোলায় তো ছিলই, যে গোলাগুলি ফাটবার পর



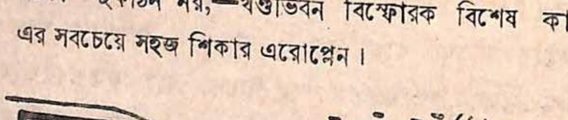

SHRAPNEL

অসংখ্য টুকরো হয়ে, দুর্দান্ত বেগের অসংখ্য ছোট গুলির কাজ করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 'শার্পনেল'ও ( shrapnel ) ফেটে গিয়ে অসংখ্য ছোট গোলাকার গুলি ফোয়ারার মতন ছিটিয়ে দিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হাত বোমার গায়ে কামরাঙার মতো শির তোলা-তোলা থাকত। ফেটে গিয়ে ঐগুলিই টুকরো হয়ে গুলির মতো তীব্র বেগে চতুর্দিকে ছিটকে পড়ত।

## আধুনিক বিস্ফোরক-শীর্ষ মিসাইল

উদ্দেশ্য তো, তড়িৎ গতিতে উপযুক্ত আকারের প্রাস (Projectile) ছুঁড়ে নিশানাকে ঘায়েল করা। তীব্র বিস্ফোরকের চারদিকে 'রড' তারের টুকরো, গোলাকার লোহার গুলি সাজিয়ে কিংবা মিসাইলটিকেই টুকরো টুকরো হবার ব্যবস্থা করে প্রাসটিকে তৈরী করা যেতে পারে।

যে সমস্ত নিশানা অপেক্ষাকৃত দুর্বল গঠনের, যেগুলি দুর্গ প্রাকার, ট্যাঙ্ক বা জাহাজের মতো সুকঠিন নয়,—খণ্ডীভবন বিস্ফোরক বিশেষ কাজে লাগে সেখানে। এর সবচেয়ে সহজ শিকার এরোপ্লেন।



BEFORE AFTER

বিস্ফোরণটি ঘটানো যেতে পারে (১) সংঘর্ষের প্রাথমিক আঘাতে একটি মৃদু ফিউজ গলে গিয়ে, (২) নিশানার সন্নিধান টের পেয়ে ইলেকট্রনিক ফিউজ গলে গিয়ে, (৩) বাইরে থেকে সংকেত পেয়ে ডিটোনেটার কাজ করিয়ে।

**তার মানে, ইলেকট্রনিকের এমন যন্ত্রপাতি মিসাইলের মধ্যে থাকে যেটা নিশানার তাপ ধোঁয়া ইত্যাদি টের পেলে কাজ করতে পারে। বৈদ্যুতিক চুম্বকের ওপর, বিদ্যুতের ওপর, আলোর ওপর কাজ করতে পারে। নিশানা যেই জাতের, সেই শিক্ষা দেব মিসাইলকে। প্রায় কাছাকাছি আমাকে নিয়ে ফেলতে হচ্ছে স্বপরিচালিত করে। তারপর, আশেপাশে নয়, আগানে-বাগানে নয়, নিশানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার নিশ্চয়তা দেবে ঐ সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক 'ব্রেন'গুলি। কোনোটা বিদ্যুৎ-সন্ধানী, কোনোটা চুম্বক-সন্ধানী, কোনোটা আলো-সন্ধানী, কোনোটা তাপ-সন্ধানী ইত্যাদি।**

## যন্ত্রপাতির পে-লোড

মিসাইল কি শুধুই দুর্জন? শুধুই কি গোলা বারুদ বোমা মারণাস্ত্রের পশরা মাথায় নিয়ে আকাশ-পাড়ি দেয়? মোটেই না।

স্বয়ংক্রিয় মাপক যন্ত্র নিয়ে যায়। এ তো আপনারা আকছার দেখছেন। বায়ুমণ্ডলে তাপ মাপতে, বায়ুর চাপ মাপতে, জ্বালানী খরচের হার মাপতে, টেলিভিশান ক্যামেরা নিয়ে, এই রকম ডজন ডজন মাপার যন্ত্র নিয়ে মিসাইল-পাখী ডানা ( নেই, থাকলেও খুব ছোট ) মেলে। বিজ্ঞানীরা সেই সব খবরা-খবর মাটিতে পৌছে দেয়ার কাজকে টেলিমিটারিং (Telemetering) নাম দিয়েছেন। টেলি কথাটি দূরত্ব ব্যঞ্জক।

## সওয়ারীর বা দ্রব্যসামগ্রীর পে-লোড

স্পেস বা অনন্ত শূন্যের দিকে শূন্যমুখী হয়ে ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরালের ওড়ার মঞ্চ থেকে একটি রেডষ্টোন মিসাইল, ১৯৬১ সালের ৫ই মে যাত্রা করেছিল। ক্রমে ক্রমে গতিবেগ সংগ্রহ করে চির-উন্নতশির মিসাইলটি তার পে-লোড সমেত আবহমণ্ডল পার হলো। তারপর সূক্ষ্ম শরীরের নির্ভার নিয়ে বায়ুভূতো

নিরাশ্রয় বিদেহীর মতো নিঃশব্দে পরিক্রমা করতে লাগল। একসময় জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে বুস্টার, শঙ্কু-আকৃতি পে-লোডকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। শঙ্কুর ভিতে রাখা উত্তাপ নিরোধক ঢালটি সমুখে করে সেটি তখন উল্টে গেল এবং ধরণীমুখী হল। তখন তার স্পীড বেশই ছিল। তারপর বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তর তাকে উল্টো টানে রেখে স্পীড কমিয়ে দিল। ছোট একটি বিমানছত্র খুলে যেতে তার গতি গেল আরো কমে। এরপর নিচের দিকের একটি বড়ো নালী পথ (Chute) খুলে গেল এবং শঙ্কুটি ওড়ার মঞ্চ থেকে তিন শো মাইল দূরে আটলান্টিক মহাসাগরের জলে এসে পড়ল। একটি হেলিকপ্টার মাছরাঙা—ছোঁ মেরে একটি জ্যান্ত, হাত-পা-ওলা পে-লোড কুড়িয়ে নিল। পে-লোডের নাম অ্যালান শেপার্ড। এই ঘটনাটি ছিল একটি বিরাট সাফল্যের ভূমিকা মাত্র। পরের ২০শে ফেব্রুয়ারী মানুষ যাত্রী সহ পৃথিবীর কক্ষ পরিক্রমা করে এলেন জন গ্লেন।

শঙ্কু আকার ব্যোমযানের ভিতে পিঠ রেখে সওয়ারী বসেন। যাতে মিসাইলের ঊর্ধ্বমুখী ত্বরণের সময় তাকে তার পিঠের শেপ-এ তৈরী গদীতে চেপে রাখতে পারে। নামবার সময়, শঙ্কুর ভিতটি থাকে তলার দিকে। হাওয়ার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ৮ থেকে ১০ জি ( গ্রাভিটেশন ) পরিমাণ স্পীড কমার পরিণামে, তখনও কিন্তু তাকে গদীর পিঠে চেপে রেখে দেয়।

হাওয়াই ঘোড় সওয়ারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনেক সাজ-সরঞ্জাম থাকে। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় (environmental control system) নকল আবহাওয়ায় অভ্যন্তর ভরিয়ে রাখে। সমুদ্র পৃষ্ঠে বায়ুর চাপ বর্গ ইঞ্চি পিছু ১৪.৭ পাউণ্ড। ব্যোমযানের জঠরে অক্সিজেন ছেড়ে এই চাপ রাখা হয় বর্গ ইঞ্চিতে ৫ পাউণ্ড। সওয়ারীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে নির্গত অঙ্গারাম্লজান (Carbon dioxide), রাসায়নিকের ( যথা, লিথিয়াম হাইড্রক্সাইডের ) সাহায্যে মুক্ত ক'রে, সরিয়ে ফেলা হয়। জলীয় বাষ্প অন্যান্য গ্যাসও তদ্রূপে পরিষ্কার করা হয়। অম্লজান (Oxygen) সমৃদ্ধ ভিতরকার তৈরী-আবহাওয়ার তাপমাত্রা, এক অদ্ভুত উপায়ে আরামপ্রদ ঠাণ্ডায় রাখা হয়। স্পেস্-এ জল ফুটিয়ে।

সওয়ারীর ব্যবহারের জন্য একটি বাতায়ন আছে। বাত যুক্ত অয়ন, বাতায়ন হলো হাওয়া আসার পথ বা মার্গ। স্পেসক্রাফটের এগুলিকে জানালা, ঘুলঘুলি, ফোকর আর যাই বলুন বাতায়ন কখনও বলা চলবে না। এটি

উল্টো। হাওয়া রোখার এবং বাইরের মহাকাশ দেখার জন্যে কাচের আবরণ। সেখানে যে হাওয়া নেই। খোলা রাখলে যাত্রীর অনিবার্য মৃত্যু। বাইরে অনন্ত শূন্যে দিঙপরিমণ্ডল অবলোকন করার জন্য যাত্রীর কাছে আছে পেরিস্কোপ। পৃথিবী, আকাশ, অন্য গ্রহ তারা দেখতে হবে তো। একগাদা যন্ত্রপাতি আছে, মাটির সঙ্গে খবরাখবর রাখার জন্য। আর আছে ডজন ডজন নিশ্চয়কারী কলাকৌশল, যাতে নিরাপদে মায়ের কোলে ফিরে আসা যায়। এই কলাকৌশলের অন্যতম হচ্ছে উত্তাপ থেকে রক্ষাকারী বর্ম বা ঢাল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসার সংঘর্ষের দুরন্ত তাপের হাত থেকে বাঁচতে হবে তো! আছে দুটি বিমানছত্র, আপৎকালীন কাজে আসার জন্য। আরো এবম্প্রকার শতেক নিশ্চয়তা—'পরবাসী চলে এসো ঘরে অনুকূল সমীরণ ভরে' নিশ্চয় করার জন্য।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# মিসাইলের এঞ্জিন/রকমফের

আধুনিক স্বনিক্ষিপ্ত হাউই মোটরের চেহারাটা উনিশ শতকের পিকদানীর মতো। একটাকে আর একটা বলে ভুল হলে কিছু বলার নেই। হয়তো পিকদানীর চেয়ে একটু লম্বাটে। সেই সুষ্ঠু চেহারা, সরু গলা, হঠাৎ বিস্তীর্ণ ব্যাপ্ত পিছনটা।

বায়ুভুক গাদা জেট (ramjet) এঞ্জিনের চলতি নাম "উড়ন্ত স্টোভের নল"। কী সহজ অনাড়ম্বর চেহারা, উড়ন্ত একটি দুমুখ খোলা নল, মধ্যিখানে আগুন, ব্যস। প্রথম পরীক্ষা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। এরোপ্লেনের একটি পুরনো এগজস্ট পাইপ দিয়েই সত্যি সত্যি পরীক্ষাটা হয়েছিল।

স্বনিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের কথা উঠলেই মনে হয়, হয় গাদা জেট, বা হাউই মোটর শ্রেণীর। আছে অবশ্যই অনেক প্রকারের। মোটর হতেও পারে আরো অনেক রকমারী। কিন্তু এই দুই রকমই প্রধান।

একেবারে আদিতম ক্ষেপণাস্ত্রের নিজস্ব মোটর ছিল না। অর্থাৎ স্বয়ং চালিত ছিল না। এরোপ্লেন থেকে মাটির ওপরের নিশানায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। কামানের সাহায্যেও ছোড়া হয়েছিল কয়েকটি।

প্রারম্ভিক স্পীড পাইয়ে দিতে গুলতির সাহায্যে না-হয় ছোড়ার কার্যটি হলো। কিন্তু দীর্ঘ রাস্তা উড়তে হলে শুধু ছুড়ে দিলেই চলবে না। নিজের পথ চলার এঞ্জিন চাই।

পাখার সাহায্যে চালানো যেত। যেমন জলের তলার টর্পেডো। সেও তো স্বয়ং চালিত। তার তো পাখাই সম্বল। টেবিল ফ্যানের মতো তিনটে ব্লেড বা পাখা। চালক বিহীন বিমান দিয়েও তো প্রথম প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। ঐ পাখার সাহায্যেই কোরিয়ার যুদ্ধে কী হলো! পুরনো বাতিল হওয়া পাখা ওয়ালা এরোপ্লেনের চালক তুলে নিয়ে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হলো। বিস্ফোরক পুরে দিয়ে ছেড়ে দেয়া হলো। শব্দের কম বা শব্দানুগ স্পীডে হলে এই প্রথাকে একেবারে অচল বলা চলে না। তবে পাখাওয়ালা এরোপ্লেনকে স্বনিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র করে ব্যবহার করার অসুবিধেও অনেক। জিনিসটা জটিল, ব্যয়সাধ্য। ওজনে ভারী, অত্যন্ত মন্থরগতি।

স্বনিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র সাধারণত জেট-চালিতই হয়। জেট চালিত বলতে, (১) হাউই শ্রেণীর, এবং (২) বায়ুপ্রশ্বাসটানা নালী সমন্বিত—দুরকমই। এই দুই শ্রেণীর সুবিধে প্রচুর। স্পীড বেশী। ঘটং ঘটং রেসিপ্রোকেটিং এঞ্জিনের চেয়ে কলকব্জা অনেক সরল। এঞ্জিন গরম করে নেবার সময়ের দরকার নেই। পাখার মোচড়ের বাধা নেই। 'পিচ' নিয়ন্ত্রণের ঝঞ্ঝাট নেই। অথচ আবহাওয়ার যে কোন ব্যতিক্রম সহ্য করার ক্ষমতা আছে। ওজনে অতিমাত্রায় হাল্কা, যতদূর উঁচুতে পাঠান-না, আপত্তি নেই।

জেট চালিত ব্যাপারটা কি?

জেট হলো সূচ-সূক্ষ্ম ছ্যাদার মধ্যে দিয়ে অতিকায় চাপের তরল পদার্থকে জোর করে বের ক'রে দেয়া। তরল বলতে জলীয় পদার্থ বা বাষ্প দুইই।

একটা হাওয়া-পোরা পেট ফুলো বেলুনকে মুখের বাঁধন খুলে ছেড়ে দিয়ে দেখেছেন তো! নিজেই ফুর ফুর করে উড়ে বেড়ায়। পেটের হাওয়া না ফুরোন পর্যন্ত ঘরের মধ্যে এ-দেয়াল ও-দেয়ালে, ছাদে ধাক্কা খেতে থাকে। সংক্ষেপে, সরল ভাবে ঐটাই জেট প্রতিক্রিয়া। পদার্থ বিদ্যার একটি অতি সরল প্রারম্ভিক প্রামাণ্য হলো প্রতিটি ক্রিয়ার সমান ওজনের প্রতিক্রিয়া আছে। আমি বন্ধুর পিঠে আদর করে একটি বিরাশী সিক্কার চড় মারলুম। বন্ধুর পিঠে কি পরিমাণ জ্বালা করে উঠল, না, যে পরিমাণ আমার হাতের চেটোয় লেগেছে।

বন্দুক ছোড়া হলে, গুলিটা যেই বেগে নলের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে, সেই বেগেই বন্দুকটা পিছু হটে আসবে। তদ্রূপ কামান বা যে কোন আগ্নেয়াস্ত্র।

এই পিছু হটে আসার পরিমাণ বস্তুত, নিক্ষিপ্ত বস্তুটির ওজন, গতিবেগ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করবে। বন্দুকের বেলায় পিছু হটা-টা কয়েক ইঞ্চি। মর্টারের বেলায়—তলাকার লোহার প্লেট না থেকে নরম মাটি থাকলে—মর্টার নিজেই মাটির মধ্যে বারো চৌদ্দ ইঞ্চি গেঁথে যাবে।

এই প্রতিক্রিয়াটির নাম রিকয়েল।

জেট এঞ্জিন এই মূল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জেট এঞ্জিনের বেলায় রিকয়েল না বলে থ্রাস্ট বা ঘাত বলা হয়। পাউণ্ড হলো থ্রাস্ট-এর একক। জার্মান ভি-২ মোটরের থ্রাস্ট ছিল ৫৬,০০০ পাউণ্ড।

এক্ষুণি আপনারা বলবেন ও সব পাউণ্ড-ফাউণ্ড বুঝি না বাপু। তুমি হর্স পাওয়ার অশ্বশক্তি দিয়ে বলো, যেটা চালু কথা। কিন্তু মুশকিল এই স্পীডনির্ভর বলে সরাসরি এই থ্রাস্টকে অশ্বশক্তির ভাষায় বলা যায় না। প্রতিক্রিয়ার বল ( reactive force )-কে থ্রাস্ট বলা যায়। থ্রাস্ট শুধুই বল। কিন্তু ক্ষমতা ( বা power ) হ'লো বল ( force ) গুণিত গতিবেগ ( speed )। একটা কাছাকাছি কিছু বলতে গেলে বলা যায় ঘণ্টায় ৩৭৫ মাইল গতিবেগে ১ হর্স-পাওয়ারকে ১ পাউণ্ড থ্রাস্ট-এর সমতুল ধরা যায়। তার মানে দাঁড়াল ঐ ভি-২ যখন ঘণ্টায় ৩৭৫ মাইল বেগে চলছিল তখন তার উৎপাদিত অশ্বশক্তি ছিল ৫৬০০০। আর এই ভি-২ যখন তার চরম স্পীড ঘণ্টায় ৩৬০০ মাইল চলছিল তখন তার অশ্বশক্তি হয়েছিল ৫০০,০০০ এরও বেশি।

আর একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়। রকেট-মোটরের সর্বাপেক্ষা স্পীড কতো হতে পারে? ভি-২ এর সর্বোচ্চ বেগ ( velocity ) কেন মাত্র সেকেণ্ডে ৫০০০ ফুট হয়েছিল। মিসাইলটি যতোক্ষণ মাটির কাছাকাছি ততোক্ষণ হাওয়ার সংঘর্ষ এবং মহাকর্ষ ( gravtaition ) তার স্পীড ব্যাহত করে দিচ্ছে। কিন্তু অল্প সময়ের জন্যই সে মাটির কাছাকাছি। কাজেই বুঝবার সুবিধার জন্য আমরা ধরে নেবো, সে এই দুটি বিপরীত টান ছাড়িয়ে মহাকাশে ( space-এ ) উড়ছে। যেখানে মহাকর্ষ নেই, হাওয়া তো নেই-ই, তাই তার সংঘর্ষও নেই।

এইখানে একটু অঙ্ক এসে পড়ছে। সেটুকু বাদ দিচ্ছি।

গ্যাসটা কাজ করে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন সেটা সাধারণ বিচারে অপদার্থ। তাকে আর আমাদের কোন দরকার নেই। না, ঠিক তা নয় কিন্তু। দেখা যাবে তখনও সে মরা হাতী। তার দাম লাখ টাকা না হলেও বেশ কয়েক হাজার। এই পৃথিবীতে মানুষের মল থেকে শুরু করে কোন্ জিনিসটাই বা একেবারে ফেলে দেওয়া হয়? কোনো পদার্থই অসার থাকে না। আর কিছু না হোক সার করে নেওয়া হয়।

গ্যাসটা কাজ করে বেরিয়ে যাচ্ছে ভি-২ এর সেই এগজস্ট গ্যাসের ভেলসিটি (গতিবেগ) ছিল সেকেণ্ডে ৬০০ ফুট। ওড়ার মুহূর্তে ভি-২ গন্ধমাদনটার ওজন ছিল ১৪ টন, তার ৯ টনই জ্বালানী।

ঐ অঙ্কর হিসেবে বের করা যায়, ভি-২-কে মহাকর্ষর টান আর হাওয়ার সংঘর্ষ কাটাতে না হলে, তার চরম স্পীড হতে পারত সেকেণ্ডে ৬০০০ ফুট।

এই থেকেই দুটো আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটিত হলো মানুষের কাছে। মিসাইলের গতিবেগ বেশী পেতে হলে দুটি উপায় আছে। এক, ঐ ছেড়ে যাওয়া এগজস্ট গ্যাসের গতিবেগ বাড়াতে হবে। দুই, ওড়ার আগে গন্ধমাদনটার ওজনের মোটা অংশ জ্বালানী (প্রপেল্যাণ্ট) হওয়া চাই।

জনসাধারণের আর একটা চলতি বিশ্বাস যে, বেরিয়ে যেতে গিয়ে এগজস্ট পিছনের বায়ুস্তরে বা কোনো কিছুকে দেওয়াল করে নিয়ে তাকে ধাক্কা মারতে মারতে এগিয়ে চলে। আর, ঐ দুরন্ত স্পীড অর্জন করে। সেই ধারণাটা একেবারেই ভুল। গ্যাস নির্গমের সময় যে রিকয়েল তৈরী হচ্ছে—পিছু ঠেলা বলা যেতে পারে—সেই রিকয়েলই মিসাইলকে বা অন্য কোন জেট চালিত ব্যোমযানকে ঐ দুরন্ত স্পীড দান করে।

মিসাইলের জেট' এঞ্জিন দুরকমের হয়। (অনেকগুলো) নালীওয়ালা বায়ুভুক (ducted air breathing propulsion system) এবং হাউই (rocket)।

## বায়ুভুক জেট

বায়ুভুক জেট বললাম এই জন্যে যে, এই মোটর, জ্বালানী দহনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন হাওয়া থেকে সংগ্রহ করে। অন্যপক্ষে রকেট মোটরকে অনেক উঁচুতে উঠতে হবে যেখানে নাইট্রোজেন ৮০ ভাগ, অক্সিজেন ২০ ভাগ ওয়ালা হাওয়া নেই। রকেট মোটরকে তাই নিজের অক্সিজেন নিয়ে উড়তে হয়।

এবং এই কারণেই, বায়ুভুক জেটের দৌড় তদ্দুরই, যদ্দুর হাওয়া আছে! তার ওপরে ওঠার ক্ষমতা তার নেই-ই। বায়ুভুক এঞ্জিনের নিয়ে উড়তে হয় শুধু জ্বালানী। অক্সিজেন নয়, আর অতিরিক্ত কিছু নয় বলেই এই এঞ্জিন খুব ছোট, হাল্কা হতে পারে।

## স্পন্দন জেট Pulse Jet

স্পন্দন জেট, সেকেণ্ডে ৬ থেকে ৬০ ক্রিয়াচক্রের (cycle) সবিরাম (intermittent firing) যতি-ওলা এঞ্জিন। এঞ্জিন যতি-দহন ধরনের বলেই, নির্গমন পাইপ দিয়ে ব্যয়িত গ্যাস, ধরুন সেকেণ্ডে ৬০ বার স্পন্দনের আওয়াজ নিয়েই বেরোয়। তাই আওয়াজটা একটানা না হয়ে, তোতলামির মতন 'তো' 'তো' করতে করতে বেরোয়। এই জন্যেই স্পন্দন জেট এঞ্জিনকে তোতলা স্টোভপাইপ বলা হতো। (১) হাওয়া টানা। হাওয়া টানার নাক নয়, মুখে কতগুলি একমুখো ঝাঁপ দরজার ভালব ছাড়া এই এঞ্জিনে সচল প্রত্যঙ্গ কিছু নেই। এই ছোট ছোট ঝাঁপ দরজাগুলি বাইরের হাওয়া টেনে নেবার পর ভিতরে তৈরী গ্যাসের চাপে ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে যায়। (২) সংনমন। বস্তুত, হাওয়া টানা এবং জ্বালানীর অন্তর্ক্ষেপ (injection) কাজ দুটি একই সময়ে হচ্ছে। ঠিক তখনই ঝাঁপ দরজা খোলা।

(৩) দহন। ক্রিয়াচক্রের পরের ধাপ—জ্বালানী দহন। সেই সময় ভিতরে নতুন তৈরী গ্যাসের চাপে ভিতর থেকে ঝাঁপ দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

(৪) নির্গমন। এর পরের ধাপ, গ্যাসের বেরিয়ে যাওয়া। বেরিয়ে যাওয়ার রিকয়েলে—এই এঞ্জিন তথা মিসাইল এগিয়ে যাচ্ছে।

ক্রিয়াচক্রের চারটি ঋতু শেষ। নতুন ক্রিয়াচক্র সুরু হবে। ভালো করে বিচার করে দেখা যাক—

**প্রথম পর্ব**। হাওয়ার মধ্যে দিয়ে দ্রুত বেগে যাওয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণ হাওয়া ঢুকছে ব্যাপ্তিকারকে ( diffuser এ )।

**দ্বিতীয় পর্ব**। হাওয়া সংনমন ( কমপ্রেশন )

হঠাৎ প্রশস্ত ব্যাপ্তিকারকে এসে হাওয়া গতিবেগ হারাচ্ছে। কিন্তু বাইরের আরো হাওয়া ঢোকার ফলে হাওয়ার চাপ বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে একমুখো ঝাঁপ দরজা ঠেলে জ্বালানী-দহন-প্রকোষ্ঠে, হাওয়া ঢুকে পড়ছে। সেই সঙ্গে

জ্বালানীর অন্তর্ক্ষেপও ঐ একই সঙ্গে হচ্ছে। এখানে হাওয়ার স্রোতে গতিবেগ কম, চাপ অত্যন্ত বেশী।

জ্বালানীকে জ্বালতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পাবার জন্য এই হাওয়াটুকু দরকার। রকেট মোটরকে হাওয়াহীন রাজ্যে চলতে হয় বলে তার জ্বালানী জালবার অক্সিজেন সে বয়ে নিয়ে যায়।

এই পৃথিবীতে অক্সিজেনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরু! হাওয়ার এক পঞ্চমাংশ অক্সিজেন। তাই দিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। আর বাঁচিয়ে রাখে ও জ্বলতে সাহায্য করে--আগুনকে। অক্সিজেন ছাড়া দুটি জিনিস বাঁচে না। মানুষ আর আগুন।

অল্প বেগ, অথচ গুরু চাপের হাওয়ার ওপর, ফোয়ারার মতো জ্বালানীর শীকর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে দ্বিতীয় তথা সংনমন পর্ব সমাপ্ত।

**তৃতীয় পর্ব। দহন।**

প্রথমবার—একটি বারের জন্যই স্পার্ক প্লাগের সাহায্যে দহন ক্রিয়ার সূত্রপাত করে দেওয়া হয়। পরে আর স্পার্ক প্লাগের দরকার হয় না। পরে হাওয়া-মিশোন জ্বালানী, স্বয়ং দহন। নিজেই জ্বলতে থাকে।

এই স্পার্ক প্লাগের স্ফুলিঙ্গের ফলে জ্বালানীতে আগুন লেগে দহন প্রকোষ্ঠে বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে অতি অল্প সময়ে অতি তীব্র চাপ ও তাপের সৃষ্টি হয়। দহন-প্রকোষ্ঠের ভিতরের চাপ তখন বাইরে ব্যাপ্তিকারকে চাপের চেয়ে অনেক বেশী। বাতাসগ্রাহী ভালবের ঝাঁপ দরজা ভিতর থেকে তাই বন্ধ হয়ে যায়। হাওয়ার অক্সিজেন নিয়ে জ্বালানীর দহন চলতে থাকে।

**চতুর্থ পর্ব।** আসল ক্রিয়া—**গ্যাসের নির্গমন।**

জ্বলন্ত হাওয়া-আর-জ্বালানীর মিশেল, দুরন্ত বেগে পিছন খোলা পুচ্ছনল দিয়ে বেরোতে গিয়ে রিকয়েল সৃষ্টি করে। এই রিকয়েল-ই মিসাইলকে সামনে ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে নিয়ে যায়।

প্রথম চার-পর্ব ক্রিয়াচক্র শেষ। দ্বিতীয় ক্রিয়াচক্র সুরু।

এর পুনরাবৃত্তি ভেবে দেখা যাক। পুচ্ছ নল দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে যাবার পর দহন প্রকোষ্ঠে চাপ কমে যায়। সুমুখের ব্যাপ্তিকারকের এবং তারও বাইরে খোলা বায়ুস্তরের বাতাসের চাপের চেয়ে দহন প্রকোষ্ঠে চাপ তখন কম হয়ে যায়।

ফলে প্রথমে ব্যাপ্তিকারকে হাওয়া ঢুকতে থাকবে। সেই চাপ বেশী হলে তুরমুশ (ramming) চালাতে চালাতে একদা দহন প্রকোষ্ঠের ঝাঁপ দরজা যাবে খুলে। টাটকা বাতাস ঢুকবে, এবং তাতে ফোয়ারার মতো ক'রে জ্বালানীর শীকর এসে পড়বে। জ্বালানী অক্সিজেন পেয়ে গেল। জ্বালানীতে আগুন ধরাতে এবারে আর স্পার্ক প্লাগের স্ফুলিঙ্গ দরকার হবে না। জ্বলন্ত কিছু পরিমাণ গ্যাস, পুচ্ছ-নলে ছিলই। তারা এই ক্রিয়ার সময় দহন প্রকোষ্ঠে ফিরে আসবে। তার গরম, এবং এঞ্জিনের দেয়ালের গরমই গ্যাসে আগুন ধরিয়ে দেবে।

এখানে একটা লক্ষ্য করার বিষয় আছে। বাতাসগ্রাহী নালীগুলিতে প্রথমেই যে চাপের হাওয়া দরকার হচ্ছে সেটা মাটিতে রাখা অবস্থায় পাওয়া যাবে না। যে পরিমাণ স্পীডে এতোখানি হাওয়া পাওয়া যাবে সেই প্রারম্ভিক স্পীড পাইয়ে দিতে তাই স্পন্দন জেটকে বুস্টারের সাহায্যে, অথবা গুলতি ছুড়ে, যাত্রা সুরু করাতে হয়। গ্যাসে একবার আগুন ধরে গেলে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেও স্পন্দন জেট স্বয়ংক্রিয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা মন্থর যাত্রার উপযুক্ত। চট করে ওড়ার ব্যবস্থা নয়।

পালস জেট এঞ্জিনের কলকব্জা অতি সরল। জ্বালানী—সামান্য কেরোসীন। ব্যয়সাধ্য নয় একেবারেই। কিন্তু পালস জেট ইঞ্জিন ঘণ্টায় ৪৫০ মাইলের বেশী যেতে পারে না। উঁচুতে ওঠা তো সীমাবদ্ধ। ১০,০০০ ফুটের বেশী নয়। সেখানে হাওয়া পেতে হবে তো। কাজেই স্পন্দন জেট (pulse jet) গাইডেড মিসাইল ট্রেনিংএ, অথবা বিমান ধ্বংসী কামানের নিশানা হওয়া ছাড়া আর বিশেষ কোন কাজে লাগে না।

## টার্বো জেট (Turbo Jet)

গতি দ্রুত না হওয়া পর্যন্ত, পর্যাপ্ত হাওয়া টানতে পারে না পালস জেট এঞ্জিন। পর্যাপ্ত হাওয়া না-পেলে জ্বালানী সম্পূর্ণ হতে পারে না তার।

সেই স্বাভাবিক হাওয়ার ওপর নির্ভর করে থাকার হাত থেকে পরিত্রাণের রাস্তা টার্বো (turbo) জেট। টার্বো জেটএ সংনমন ক্রিয়াটি পালস জেটের চেয়ে অনেক জোরদার পাওয়া যায়। টার্বো জেটে ক্রিয়াচক্র সেই চারিটিই। হাওয়া টানা, সংনমন, দহন, নির্গমন।

কমপ্রেসারের রোটরের বেষ্টনীতে আংটি আকৃতি হাওয়া-গ্রহণের নালী আছে অনেকগুলি। প্রথম ক্রিয়া হলো সেই নালীগুলির মাধ্যমে হাওয়া টানা।

কমপ্রেসার ব্লেডের প্রথম সারিগুলি ঘুরে উঠলে হাওয়া টেনে নিয়ে সজোরে পরের সারিগুলিতে পাঠিয়ে দিতে থাকে। দ্বিতীয় সারি পাঠায় তৃতীয় সারিকে। পর পর এই একই রকম করে গতিবেগ ও চাপ উভয়ই বাড়তে বাড়তে এক সময় দহন প্রকোষ্ঠে পৌছে যায়। দ্বিতীয় ক্রিয়া, সংনমন, সম্পূর্ণ হলো।

কমপ্রেসারের সাহায্যে যান্ত্রিক উপায়ে সংনমিত বায়ু স্বাভাবিক বাতাসের চাপের অনেক গুণ বেশী চাপ সৃষ্টি করে। এই সংনমিত বাতাস যে দহন প্রকোষ্ঠে গিয়ে পৌছায়, সে প্রকোষ্ঠের প্রস্থচ্ছেদ ক্রমশ বিস্তৃত। অর্থাৎ ছোট ব্যাস থেকে ক্রমশ বড় ব্যাস।

দহন প্রকোষ্ঠে আছে শতছিদ্র অনেকগুলি নল। এগুলি বাতাসের পঞ্চমাংশ অক্সিজেনই টেনে নেয়। এই নলগুলির মধ্যেই জ্বালানীর শীকর এসে পড়ে এবং আগুন ধরে যায়। তৃতীয় ক্রিয়া, দহন, সম্পূর্ণ।

এই নলগুলির মধ্যে থেকে জ্বলন্ত গরম গ্যাস বেগে বেরিয়ে আসে। এসে, তখনো অদগ্ধ হাওয়ায় মিশে টারবাইনের পাখার মধ্যে দিয়ে পুচ্ছ নলে পৌছে যায়। চতুর্থ ক্রিয়া, এইটাই আসল—অতো পরিমাণ গ্যাসের সরু নালী দিয়ে নিষ্ক্রমণ! এবং বেরিয়ে যেতে গিয়ে রিকয়েল ধরণে থ্রাস্ট এর সৃষ্টি। যার ফলে মিসাইল অমন দুরন্ত সম্মুখ গতি পায়।

স্মর্তব্য, এই চারটি ক্রিয়া পালস জেটে যতি দিয়ে দিয়ে হচ্ছিল—বিরাম দিয়ে দিয়ে হচ্ছিল। যার ফলে তার গতিও ঠিক নিরবচ্ছিন্ন অবিরাম নয়। ধাক্কা মেরে মেরে চলা। যদিও সেই ধাক্কাগুলি চোখে বা কানে ধরা পড়বার নয়।

কিন্তু টার্বো জেট-এ এই চারটি প্রক্রিয়াই যুগপৎ এবং অবিরাম। কোনো যতি বা বিরতি নেই।

পুচ্ছ নলে যাবার পথে গরম গ্যাস ও অদগ্ধ হাওয়ার মিশেল টারবাইনের পাখার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় টারবাইনকে ঘুরিয়ে দেয়। টারবাইন ঘোরায় কমপ্রেসারকে। শত ছিদ্র নলগুলির মধ্যে জ্বালানী এসে প'ড়ে দহন সম্পূর্ণ করে। দহনের অতি অসহ্য উচ্চতাপ টারবাইনের পাখাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিত। সেই নলগুলির চারপাশে প্রচুর স্বাভাবিক হাওয়া থাকায় তাপ কমে ১৫০০° ডিগ্রী ফারেনহীটে নামিয়ে দেয়। টারবাইনের পাখাকে জ্বলে যাবার

হাত থেকে বাঁচায়। শত ছিদ্র নলগুলিকে কমবাশচান ক্যানও ( **Combustion can** ) বলা হয়। ঐ দহন নলগুলির মধ্যে হাওয়ার সঙ্গে জ্বালানীর অনুপাত একেবারে আদর্শ বলা যেতে পারে। জ্বালানীর পনেরো গুণ হাওয়া হলে উচ্চতাপের দহনকে আদর্শ স্বরূপ বলা যায়। টারবাইনে যে যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন হয় সেটি কমপ্রেসারটিকে চালাবার পক্ষেই পর্যাপ্ত। তার চেয়ে বেশী নয়।

তার চেয়ে বেশী যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থার জন্যেই আফটার বার্নার আবিষ্কৃত হলো। টারবাইন ছেড়ে বেরোবার পর সেই গরম হাওয়ার স্রোতে আরও জ্বালানী পুড়িয়ে দহন ক্রিয়াকে দীর্ঘতর করা হ'লো।

টারবাইনের পাখাগুলি যতটা গরম সহ্য করতে পারে তারও চেয়ে উচ্চতর তাপ চাই। কাজেই সেটা টারবাইনের পাখা পার হয়ে আসার পরই পাওয়া সম্ভব। 'আফটার বার্নার' তাই করে। এর পিছনে মূল তথ্য হলো—সব কাজ সেরে বেরিয়ে, হাওয়ার পঞ্চভূতে মেশার ঠিক আগে এগজষ্ট গ্যাস যতো গরম হবে, তার নির্গমনের গতিবেগও ততো বেশী হবে। বলা বাহুল্য নির্গমনের গতিবেগ যতো বেশী হবে থ্রাস্ট বা সামনে চলার বেগও ঠিক সেই পরিমাণেই বেশী হবে।

টার্বোজেট এঞ্জিনে আফটার বার্নার দেওয়ার সার্থকতাই এই। আফটার বার্নার না থাকলে শব্দাগ্রগামী বা শব্দাতিগ **supersonic** স্পীড পাওয়া সম্ভব হতো না।

টার্বোজেট-এর সুবিধা প্রচুর। যান্ত্রিক উপায়ে এর কমপ্রেসার চালু থাকে। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেও টার্বোজেট, হাওয়ার সংনমন **সংকোচন** (কমপ্রেশান) সৃষ্টি করে নেয়। কিন্তু প্রাপ্তব্য শক্তির অধিকাংশই কমপ্রেসারের কাজে ব্যয় হয়ে যায়, যতোক্ষণ না মিসাইলটি আকাশে উঠে বেশী গতিবেগ পাচ্ছে। গতিবেগ বেশী হলে হাওয়া বেশী হচ্ছে। এতে কমপ্রেসার, টারবাইনের ওপর কম নির্ভর ক'রে, উচ্চগতিতে স্বাভাবিক হাওয়াকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। তার মানে এঞ্জিন-সৃষ্ট ক্ষমতা বেশীর ভাগ থ্রাস্ট-এর কাজে লাগতে পারে।

টার্বোজেট এর আরও অনেক সুবিধা আছে। অন্য জেট এঞ্জিনের চেয়ে জ্বালানী খরচ কম। তা সত্বেও হয়তো বা একটু ব্যয়সাপেক্ষ। তা হোক খুব নির্ভরযোগ্য। গাইডেড মিসাইলের জন্য আদর্শ এঞ্জিন। এখনও এর নির্মাণ কলার উন্নতি বিধান হচ্ছে—

মিসাইল আকাশে ওঠে একবারই। এবং আত্মহত্যার আগে তার জীবনকালও কয়েক মিনিটের বেশী নয়। হয়তো কয়েক সেকেণ্ড। সেই তুলনায় টার্বোজেট ব্যয়সাধ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু যুদ্ধে যিনি নেমেছেন, খরচের হিসেব তার জন্য নয়।

## দুরমুশ জেট (Ram Jet)

এতেও একাধারে শব্দাগ্রগামী গতিবেগ (**supersonic speed**) পাওয়া যায়, অথচ এর এঞ্জিন অনাড়ম্বর ও কম ব্যয়সাপেক্ষ।

আগেই বলা হয়েছে, অতি উচ্চ স্পীডে টার্বোজেটে, হাওয়ার দুরমুশ করার ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে কমপ্রেসারের অনেকখানি কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। স্পীড যদি তেমন উঁচু পর্যায়ের পাওয়া যেত, কমপ্রেসার টারবাইন না হলেও চলত। হাওয়ার দুরমুশ দিয়েই প্রয়োজনীয় সংনমন বা কমপ্রেশান পাওয়া যেত। ফলতঃ, র‍্যাম জেট এঞ্জিন সবচেয়ে হাল্কা এবং এতে গতিশীল কোন যন্ত্রাংশ নেই।

মনে করুন মিসাইলটি দ্রুতবেগে বাঁ দিকে যাচ্ছে। নালাপথে প্রচুর হাওয়া ঢুকতে পারছে। নাকের ডগায় মোচাকৃতি দ্বীপের মতন আছে। ঐ জায়গার গঠনটাই এই রকম যে হাওয়ার প্রবেশ ওখানে এসে সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। হাওয়া মন্থরগতি হয়ে যায়। বস্তুত হাওয়াকে ভিতর-পানে প্রবেশ করতে গিয়ে বেশ কতোগুলি ধাক্কা-ঢেউয়ের সম্মুখীন হতে হয়। তাতে চাপ বৃদ্ধি পেয়ে হাওয়ার গতি বেগ কমে যায়। দহন প্রকোষ্ঠে জ্বালানী মিশিয়ে দহন সম্পূর্ণ হয়। তার মানে দহনের ফলে এখানে গ্যাস ইত্যাদির আয়তন বহুল পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় **Momentum = Mass × velocity** এবং এইগুলিও বর্ধিত ভরবেগে **momentum** = ভর (**mass**) গুণিত গতিবেগ (**Velocity**) নির্গমন নজ্‌ল দিয়ে বের হতে থাকে। তার মানেই থ্রাস্ট এর বৃদ্ধি এবং সেইসঙ্গে সম্মুখ গতিরও শব্দাগ্রগামী স্পীড প্রাপ্তি।

জ্বলন্ত গ্যাস পিছনের মুক্তপথ দিয়ে কিম্বা সুমুখের মুখ দিয়ে কেন বেরিয়ে যায় না—এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন নয়।

দহনের সময় হাওয়ার বেগ, দহন-প্রকোষ্ঠের অগ্নিশিখা কেন নিভিয়ে দেয় না। এমনিতে নিভিয়ে দিতে পারে বলেই র‍্যাম জেট এঞ্জিনে, একটি ছ্যাদাওলা ধাতব

নলের মধ্যে শিখা প্রজ্বলিত রেখে দেয়। এটি থাকে জ্বালানী অন্তর্ক্ষেপকের **injector**-এর পিছনে। এটি একটি ইলেকট্রিকের অনির্বাণ অগ্নি উৎস।

২০০০ অশ্বশক্তির সমতুল থ্রাস্ট এবং গতিবেগ উৎপাদনকারী র‍্যাম জেটের এঞ্জিনের ওজন ৬০ পাউণ্ডের বেশী নয়। তার মানে শব্দাগ্রগামী স্পীডে প্রতি অশ্বশক্তিতে ০.০৩ পাউণ্ডের থ্রাস্ট হলেই যথেষ্ট। **র‍্যাম জেট ৮০,০০০ ফুট উঁচুতে উঠতে পারে।**

উঁচু গতিবেগে র‍্যাম জেটের থ্রাস্ট যদিও অপরিসীম, স্থির অবস্থায় র‍্যাম জেট-এর থ্রাস্টই নেই।

একে আকাশে উড়িয়ে ন্যূনতম স্পীড পাইয়ে দিতে, হয় বুষ্টার না-হয় গুলতির প্রয়োজন। শব্দ সম স্পীড না হওয়া পর্যন্ত র‍্যাম জেট কোন কাজেই আসে না।

## রকেট

রকেটের মোটর আবহাওয়ার অক্সিজেনের আশায় না থেকে নিজের প্রয়োজনের অক্সিজেন নিজেই বহন করে। কাজেই রকেটকে মাধ্যমের বিচার করতে হয় না। রকেটই একমাত্র মোটর যা হাওয়াহীন অন্তরীক্ষেও কাজ করতে পারে।

**রকেটের জ্বালানী—কঠিন কিম্বা তরল, দুইই হতে পারে। Solid মানে কঠিন বা নিরেট। নিরেট জ্বালানী অপেক্ষাকৃত আস্তে জ্বলে। নিরেট জ্বালানীর বৃহত্তম সুবিধা এই, এর এঞ্জিন অনাড়ম্বর। ছুড়তে সহজ। অর্থাৎ নিকট পাল্লার নিশানা যদি হয় তা হলে নিরেট জ্বালানীওলা রকেট মোটর আদর্শস্থানীয়।** পক্ষান্তরে, অসুবিধা হলো, নিরেট জ্বালানীকে দীর্ঘক্ষণ জ্বালিয়ে রাখা যায় না। দহন প্রকোষ্ঠ প্রয়োজন-অতিরিক্ত গরম হয়ে যেতে চায়, ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা প্রায় নেই-ই। নিরেট জ্বালানীকে একবার জ্বালিয়ে দিলে আর নেভানো যায় না। তার পরিমাণের ওপর নির্ভর। যতোটা জ্বালানী দেয়া হয়েছে ততোটা পুরোই জ্বলবে। স্বভাবতই থ্রাস্ট বা ঘাতও সেই রকমই হবে। তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। নিরেট জ্বালানীর মধ্যেই জ্বলবার উপযুক্ত অক্সিজেন দেয়া থাকে। জ্বালানী জ্ব'লে জ্ব'লে কমতে থাকলে দহন প্রকোষ্ঠের ভিতরের আয়তন বাড়তে

থাকে। তাতে তাপ ও চাপ উভয়ই বদলাতে থাকে। তার মানে ঘাতেরও অদল বদল হয়। জ্বালানী ফুরোতে থাকলে মিসাইল হালকা হতে থাকে, অভিকর্ষের রেখাও (graph) বদলাতে থাকে। নিরেট জ্বালানীর মোটরে অসুবিধা অনেক।

## তরল জ্বালানীর রকেট মোটর

এমন দিন ছিল যখন নিরেট জ্বালানী ছাড়া পাওয়াই যেত না। তখন দুশ্চিন্তা ছিল কি করে ঘাত বাড়ানো যাবে। তার মানে স্পীড বাড়ানো যাবে। আর কি করে তার স্থায়িত্ব বাড়িয়ে পাল্লার দূরত্ব আরো বাড়ানো যাবে! একদিন তার জবাব পাওয়া গেল। মিসাইলের মধ্যেই তরল জ্বালানী ভাণ্ডার থাকবে। এবং এই জ্বালানী, আধার থেকেই মোটরে পৌছে যাবে। ধরুন, অ্যালকোহল হলো জ্বালানী। তা হলে কী কী থাকতে হবে! এক নম্বর, অ্যালকোহলের চৌবাচ্চা। তাকে জ্বালাবার সহায়ক অক্সিজেন দিতে হবে। দু নম্বর, আর এক চৌবাচ্চা তরল অক্সিজেন। তিন নম্বর, মোটর। চার নম্বর, জমানো চাপের compressed air-এর চৌবাচ্চা। দহন প্রকোষ্ঠে জ্বালানী ফোয়ারার মত ছড়িয়ে পড়ে। অক্সিজেন মিশ্রিত হয়ে জ্বলতে থাকে। এইগুলি দুরন্ত চাপ সৃষ্টি করে। এগজস্ট নজল দিয়ে বহিষ্কৃত হবার সময় ঘাত-এর সৃষ্টি করে।

দহন সুরু হলেই ভিতরে নিজস্ব চাপের সৃষ্টি হয়। জমানো চাপের চৌবাচ্চা থেকে পাওয়া চাপ নিজস্ব চাপের চেয়ে বেশী না হলে সে চাপ দিয়ে জ্বালানীকে মোটরে পৌছে দিতে পারবে না। কাজেই চাপ সৃষ্টিকারী জমানো চাপের চৌবাচ্চাও চাই। এই আধারে থাকে উচ্চ চাপের হাওয়া বা নাইট্রোজেন। এর কাজই চাপ সৃষ্টি করা।

আধ মিনিটের বেশী চলতে হবে এমন জ্বালানী, তার ওপর অক্সিজেন ট্যাঙ্ক ও চাপ-সৃষ্টির ট্যাঙ্ক, এসবের সমাহারে বপুটি অতি মাত্রায় বিপুল হতে হয়। বপুর আয়তন কমাতে তাই টারবাইন চালিত পাম্পের সাহায্যে মোটরে জ্বালানী পৌছে দেয়া হয়। রাসায়নিক উপায়ে তৈরী বাষ্পের সাহায্যে এই টারবাইন চালানো হয়। কিন্তু এতে ভিতরে এতো তাপের সৃষ্টি হবে যে সমস্তটাই জ্বালিয়ে দেবে। তাই তাকে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা হিসেবে জ্বালানী কিম্বা অক্সিজেনকে, মোটরের বেষ্টনী দেওয়া জ্যাকেটের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে ঠাণ্ডা করে দহন প্রকোষ্ঠে পাঠানো হয়।

তরল জ্বালানীর রকেট মোটর নিরেট জ্বালানীর চেয়ে দীর্ঘতর ক্ষণ চলতে পারে। এবং তরল জ্বালানীর ঘাত ও সময় নিয়ন্ত্রণ যোগ্য। তরল জ্বালানীর ক্রিয়া-সম্পাদন যোগ্যতা অনেক বেশী অথচ ওজনে অনেক কম। ভি-২ মিসাইলের চরম গতিবেগে, প্রতি পাউণ্ড তরল জ্বালানী, ৬ অশ্বশক্তির ক্ষমতা-সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল।

অসুবিধার মধ্যে, বড় জটিল এর যন্ত্রপাতি। বিশেষ ব্যয়সাধ্য। তরল জ্বালানীকে ভাণ্ডারিত করা কষ্টসাধ্য। তরল অক্সিজেনকে জীইয়ে রাখা বেশ শক্ত—খুব নীচু তাপে রাখতে হয়। হিমাঙ্কের চেয়েও ২০০° ফারেনহীট নিচে।

রকেট মোটরে জ্বালানী খরচার মাত্রা অতিরিক্ত। ভি-২ ৬০ সেকেণ্ডে ৯ টন অ্যালকোহল আর অক্সিজেন পুড়িয়ে ফেলেছিল।

যাই হোক আর তাই হোক, তরল জ্বালানী ওয়ালা রকেটই একমাত্র মোটর যার স্পীড-এর সীমা নেই, উঁচুর সীমা নেই। ঊর্দ্ধাকাশে, চাঁদে, গ্রহান্তরে পৌঁছাবার একমাত্র ব্যোমযান এই তরল জ্বালানীর রকেট।

দূর পাল্লা পেতে গেলে, পৃথিবীর অভিকর্ষ কাটাতে গেলে, কিম্বা এমন কি পৃথিবীর কক্ষপথে ঢুকে পড়তে গেলেও, মিসাইলকে দুরন্ত গতিবেগ দিতে হবে আর দুরন্ত গতিবেগ দিতে গিয়ে পসরা হয়ে যায় ভীষণ ভারী। **পৃথিবীর মায়া কাটানো গতিবেগ হতে হবে ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল।**

এক স্টেজের একটি রকেট দিয়ে এই রকম একটা স্পীডের কাছাকাছি স্পীডও পেতে গেলে, হয় নির্গম গ্যাসের গতিবেগ বাড়াতে হবে। না হয়, রকেটের ভর (mass) এর অনুপাত উন্নত করতে হবে। এই অনুপাত হলো—ওড়ার সময়ে রকেটের যে ওজন, তার সঙ্গে সমস্ত জ্বালানী মুক্ত রকেটের ওজনের অনুপাত।

আজও পর্যন্ত চরমতম গতিবেগ পাওয়া গেছে সেকেণ্ডে ৯০০০ ফুট।

আর ঐ ভর এর অনুপাত বাড়াতে হলে ওড়ার সময়ের ওজনের ৯৫ শতাংশ হতে হয় জ্বালানীর ওজন। নিজের খালি ওজনের বিশগুণ ( তেল ) জ্বালানী। এই নিয়ে কি ওড়া সম্ভব ?

তার জবাব হলো—ক্রমাগত জ্বালানী ফুরোতে থাকবে আর অপ্রয়োজনীয় ওজন ফেলে দেওয়া হবে। প্রতিনিয়ত তেমন ওজন ঝরানো সম্ভব হয় না তাই তিন স্টেজ রকেটের উদ্ভব। প্রথম রকেটের জ্বালানী নিঃশেষ হয়ে গেলে, দ্বিতীয় স্টেজের মোটরকে চালু করে প্রথম স্টেজের রকেট মুক্ত হয়ে যায়। তখন দ্বিতীয়

আর তৃতীয় স্টেজ রকেট চালু থাকে। ব্যাঙাচির লেজের মতো প্রথম স্টেজ রকেট খসে গেছে। এমনি করেই দুই তৃতীয়াংশ জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে দুটি স্টেজও খুলে যাবে। তৃতীয় স্টেজটি থাকবে মাত্র।

অতোখানি জালানী বয়ে নিয়ে উঠতে হয় বলেই চেহারাও হয় ঢাউস আকৃতির। ফন ব্রাউনের স্যাটার্ন রকেট ছিল কুড়িতলা বা ২০০ ফুট উঁচু। তরল জ্বালানীর আটটা মোটর, ১,৫০০,০০০ পাউণ্ড থ্রাস্ট সৃষ্টি করে ৫০০ টন নিয়ে আকাশে উড়েছিল। নিরেট জ্বালানীর দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের নিরেট জালানীওয়ালা বুস্টারে ১০০ টন, জ্বালানী ছিল। জ্বলেছিল ৮৭ সেকেণ্ড, থ্রাস্ট সৃষ্টি করেছিল ৫০০,০০০ পাউণ্ডের।

## সপ্তম অধ্যায়

## নৌবহরের মিসাইল

পারমাণবিক শক্তি পরিচালিত ব্যালিস্টিক মিসাইল-সাবমেরিনের পাল্লার সত্যি করেই সীমা নেই। তেমনি সীমা নেই স্পীডের। সবচেয়ে বড়ো কথা, ছুট বলতেই, প্রতিরক্ষার মিসাইল-লড়াইয়ে, সরাসরি বড়ো অংশ গ্রহণ করতে পারে এই সাবমেরিন। একটা চলতি ধারণা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়ে গেছে "নৌবাহিনীর অস্তিত্ব প্রধানত স্থল সৈন্য ও বিমান বাহিনীকে সাহায্য করতে এবং রক্ষা ও পুষ্ট করতে। শেষোক্তটিই যদিও চরম নিষ্পত্তির কৃতিত্ব লাভ করে।"

দূর পাল্লার ৩০০০ মণী কামান নিয়ে জলযুদ্ধ তো আজ ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথার বিষয়বস্তু। বিমানবহরবাহী জাহাজের নতুন মূল্যায়ন হয়েছে, নতুন চেহারা হয়েছে, নতুন ব্যবহার হয়েছে। নৌবহরে যোগ হয়েছে ফ্রিগেট। পৃথিবীর সমস্ত বড় রাষ্ট্রের নৌবহরের চেহারাই পালটে যাচ্ছে।

তার একমাত্র কারণ মিসাইলের আমদানী। মিসাইলের ক্ষমতা অসাধারণ, যে কোন কাজে মিসাইলের ব্যবহার। মোটামুটি, পাঁচ রকমের বিভিন্ন কাজে আজকের দিনের নৌবহর বিন্যস্ত। ক্যারিয়ার, ক্রুজার, ফ্রিগেট, ডেস্ট্রয়ার, সাবমেরিন। সঙ্গে এসকর্ট শিপ জুড়লে ছ'রকম।

## ক্যারিয়ার ( বিমানবহরবাহী জাহাজ )

মোটামুটি তিন উদ্দেশ্যে তিন রকমের ক্যারিয়ার। (ক) অ্যাটাক ক্যারিয়ার (খ) সাপোর্ট ক্যারিয়ার। (গ) অ্যামফিবিয়াস অ্যাসল্ট শিপ। **(ক) অ্যাটাক ক্যারিয়ার—**আক্রমণের জন্য ব্যবহার হয়। আমেরিকার তুরকম সাইজ ক্যারিয়ার উল্লেখযোগ্য। ফোরেস্টল শ্রেণীর ক্যারিয়ার। ডিসপ্লেসমেণ্ট—৬০,০০০ টন। [ জাহাজকে জলে ভাসালে যে পরিমাণ জায়গা দখল করে সেই পরিমাণ জায়গায় ৬০,০০০ টন জল ধরত। ] ১০০০ ফুট লম্বা পাটাতন বা ডেক। ২৫০ ফুট চওড়া।…দ্বিতীয় রকম হলো এনটারপ্রাইজ শ্রেণীর। অপসারণ ক্ষমতা—৮৫০০০ টন। লম্বায় ১১০০ ফুট। এনটারপ্রাইজকে শক্তি জোগায় আটটি পারমাণবিক চুল্লী। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটরস। এই পারমাণবিক চুল্লী, নতুন জালানী না-নিয়ে জাহাজের ষ্টীম টারবাইনকে পাঁচটি বছর চালু রাখতে পারে। কাজেই, খাবার বা চলার রসদ যখন সঙ্গেই আছে—যথা ইচ্ছে যেতে বাধা নেই। আর এতদ্দরুণ, স্পীডও হয় অস্বাভাবিক বেশী। ডেক-এ বাঁ-দিকে আগে পিছে দুটি বিমান অবতরণ ক্ষেত্র। মামুলী জাহাজের মত চিমণী নেই এতে, বয়লারে বাতাস টানবার নলও নেই। বহিরাকৃতিটা একেবারে অন্যরকম। জাহাজ মনে পড়লেই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে চিমনী। সেই চিমনীই নেই। আজকের ক্যারিয়ারের চেহারাটা একেবারে খাঁদা বোঁচা। ডেকের উপরের বিরাট বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের runway-র চারদিক ঠিক সমান ভাগে ভাগ করে বসে আছেন চতুর্মুখ ব্রহ্মা। চারটি প্রতিরক্ষা **মিসাইল ব্যাটারী**। এই ব্যাটারী কিন্তু ইলেকট্রিক সেল এর সমষ্টি নয়। **ব্যাটারী মানে সুসজ্জিত কামান শ্রেণী**। ক্যারিয়ার নিজের আত্মরক্ষার জন্য নিজে কামান রাখে না। নির্ভর করে এর বিমান বহরের উপরে। এতে বিমান ওড়াবার জন্য অতি আধুনিক ক্যাটাপাল্ট আছে। এর ডেক সুদৃঢ় করে মজবুত। ক্যাটাপাল্ট কথাটির এক অর্থ গুলতি। অন্য অর্থটিও গুলতির সমার্থক। ক্যাটাপাল্ট হচ্ছে —জাহাজ থেকে বিমান ওড়াবার যন্ত্র।

**ক্যারিয়ার একটি ভাসমান ও চলমান বিমান বন্দর।** এর বাসিন্দা জঙ্গী বিমানগুলি সব জেট-এঞ্জিন ওয়ালা। পঁচিশ বছর আগেও বিমানের স্পীড ছিল শব্দের স্পীডের আর্দ্ধেক! সেই থেকে বেড়ে বেড়ে বিমানের স্পীড আজ শব্দের স্পীডের দুগুণ। বিমানের অবতরণের ও আকাশে ওড়ার স্পীড

সেদিনের তুলনায় আজ তিন গুণেরও বেশী। সেইজন্যেই তো ৬০,০০০ টন, ৮৫,০০০ টন অপসারণ ( ডিসপ্লেসমেণ্ট ) ক্ষমতা ওয়ালা ঢাউস ক্যারিয়ারের অতো চাহিদা। এর বিমানগুলিতে এ-এস-এম, এ-এ-এম দুরকম মিসাইল থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের ক্যারিয়ারে কুলোয় না, আজ সেগুলি সব বাতিল করতে হয়েছে। তার কারণ, আজকের ক্যারিয়ারকে অনেক বেশী সংখ্যায় বিমান বয়ে নিয়ে যেতে হয়। অতোগুলি বিমানের জ্বালানীর তৈলাধার বা অস্ত্র-শস্ত্র এবং মিসাইল ইত্যাদি রাখতে জায়গা লাগবে না বিশাল !

এআর-টু-সারফেস শ্রেণীর মিসাইল বুলপাপ-এর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এর পাল্লা ছিল এতো যে, ক্যারিয়ার জাহাজ থাকতো বহু দূর। 'বুলপাপ' এর অ্যাকিউরেসি ( লক্ষ্যভেদে নিখুঁতত্ব ) ছিল অদ্ভুত। পিছন থেকে বোমারুর পাইলট, বেতার তরঙ্গের সাহায্যে, বুলপাপকে চোখে দেখে নিয়ন্ত্রিত করত। কাজেই নিশানায় না পড়ে মিসাইলটির খানা ডোবায় পড়ার আশঙ্কা ছিল না। "সাইডওয়াইণ্ডার" আর-একটি এ এস-এম। পাল্লা ছিল কম। অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে নিশানা তাগ করত। স্প্যারো-৩ ছিল যে কোন আবহাওয়ায় চলতে সক্ষম, দূর পাল্লার। যে-কোন কোণ থেকে আক্রমণে সক্ষম। র‍্যাডারের সাহায্যে নিশানা খুঁজে বের করত।

কোন দেশই তার শেষতম সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের কথা জানতে দেয় না। নিজের অসামরিক দেশবাসীর কাছেও সে খবর চেপে রাখে। এমন কি অন্য ইউনিটের সৈন্যদেরও জানতে দেয় না। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে হয়তো নতুন নতুন হাতিয়ারের আকৃতিটা একবার দেখিয়ে দেওয়া হয়। যেটা সহজে অন্যে নকল করতে পারবে না এমন চমকপ্রদ কিছু আবিষ্কৃত বা তৈরী হলে, নির্মাণ কৌশল না জানিয়ে তার উপকারিতা ( না অপকারিতা ) ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলা হয়। বন্ধুদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান মন্ত্রী বেড়াতে এলে তারও চোখে ঠুলী বেঁধে নিয়ে যাই। বলি......"কণ্ডাকটেড টুর"। আসল জায়গা দেখতে দিই না। আমার দেওয়া নানান দেশের অস্ত্রশস্ত্রের হিসেবও এই কারণেই অনেকক্ষেত্রে দু'চার বছরের পুরনো। এই সময়ের মধ্যে বিজ্ঞান কতোখানি এগিয়ে গেছে তার পরিমাপ করা সোজা নয়।

এক একটি নৌবহরের সঙ্গে অন্তত দুটি করে ক্যারিয়ার থাকে। ক্যারিয়ারের কর্তব্য বা দায়িত্ব হলো—এক, নৌবহরের প্রতিরক্ষা। দুই, জলে স্থলে আক্রমণের

ব্যবস্থা। তিন, জলপথে আধিপত্য করা ও সেই আধিপত্য বজায় রাখায় সাহায্য। চার, ডাঙ্গায় গিয়ে আক্রমণ।

## সাপোর্ট ক্যারিয়ার

মূল ক্যারিয়ারকে মদত দেয় সাপোর্ট ক্যারিয়ার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাতিল হওয়া ক্যারিয়ারগুলিকে পরিবর্তন করে, সাপোর্ট ক্যারিয়ার করা হয়েছে। এদের কাজ অ্যাটাক ক্যারিয়ারদের সাপোর্ট বা পৃষ্ঠপোষণ করা। শত্রুপক্ষের সাবমেরিন থেকে রক্ষা করা। সাবমেরিন খুঁজে বের করা, তাদের প্রতিরোধ বা ধ্বংসের ব্যবস্থা করা। এতে 'সোনার' নামে একটি যন্ত্র থাকে। কাছাকাছি কেন, দূরে দূরান্তরে—ডুবে থাকা কোন জলযানের উপস্থিতি আবিষ্কার করে এই সোনার। করে ভারী সুন্দর উপায়ে। শব্দসম বা শব্দাতিগ স্পীডের উচ্চ কম্পাঙ্কের বেতার তরঙ্গ পাঠিয়ে নিমজ্জিত জলযানের গায়ে প্রতিফলিত করে আনে। এতে শুধু উপস্থিতিই নয়, তার অবস্থানের দিক দূরত্ব সবই তৎক্ষণাৎ নিরূপণ করা হয়ে যায়। হাওয়ায় র‍্যাডার যে কাজ করে, জলের তলায় 'সোনার' করে সেই কাজ। সাপোর্ট ক্যারিয়ারে আর যা-যা থাকে তা হলো সাবমেরিন ধ্বংসী বিমান, হেলিকপটার ইত্যাদি।

**অ্যামফিবিয়াস অ্যাসল্ট শিপ** ( ডাঙ্গায় সৈন্য নামানোর জাহাজ )

এর কম্ম হেলিকপটারে করে শত্রুর ডাঙ্গায় সৈন্য নামানো। এগুলোর গতিবেগ ২০ নট। অপসারণ ক্ষমতা ১৮০০০ টন। ২০০০ সৈন্য, ৩০টি হেলিকপটার, ৯০০০ টন হেলিকপটার-বহন-যোগ্য যুদ্ধের মাল মশলা—এই হ'লো আসল্ট শিপের পণ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে—নৌবহরকে শত্রুর ডাঙ্গায় খুব কাছে নিয়ে যাওয়া হতো। উপকূলে মন্থর গতিতে সৈন্য নামানো হতো। সেখানে কিন্তু শত্রুরা গিজ গিজ করছে। আর, সব রকম হাতিয়ার নিয়ে শত্রুরা তৈয়ার। সে রকম যুদ্ধ আজকের দিনে অচল। আজ হেলিকপটারে করে অল্প অল্প পরিমাণে সৈন্য দূরে দূরে ছিটিয়ে নামিয়ে দেওয়া হলো। হেলিকপটারে করে ডাঙ্গায় পৌছতে অসুবিধেও হলো না।

## ক্রুজার

ক্রুজ কথাটার একটি অর্থ হলো ঘাটে ঘাটে ডিঙ্গা ভিড়িয়ে অনেকটা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানো। ক্রুজার হলো সমুদ্রের ভবঘুরে। যুদ্ধং দেহি ভাবের

চেয়ে অবশ আলস্যে ভ্রমণের আনন্দ করার চেহারাটাই মনে পড়ে। যুদ্ধজাহাজের দলে ক্রুজারের স্থান দ্বিতীয়।

৫০০ থেকে ৩০০০ টন অপসারণ ক্ষমতা, ৫০০ থেকে ৮০০ ফুট লম্বা—মোটামুটি এই হলো ক্রুজারের চেহারার ফিরিস্তি। মূলতঃ ব্যবহার—হাওয়াই হামলা রোখা।

ফরাসীদের একটি খুব শক্তিশালী ছোট্ট ৫০০০ টনী পকেট ক্রুজার ছিল। এটি গাইডেড মিসাইল জাতের। এতে হাওয়াই হামলা রোখার এবং সাবমেরিন রোখারও সাজ-সরঞ্জাম থাকত। আর থাকত মিসাইল।

বর্ত্তমানের সব ক্রুজারই গাইডেড মিসাইলবাহী জাহাজ। আমেরিকার 'লংবীচ' ছিল পরমাণু শক্তিচালিত ক্রুজার। সমস্ত ক্রুজারের কাজই হলো—সমুদ্রের বুকে নৌবহরকে শত্রুর হাওয়াই আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। আগেকার দিনের এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কামান শ্রেণী বদলে, মিসাইল বসিয়ে নেওয়া হয়েছে ক্রুজারে। আমেরিকার ট্যালস, টেরিয়ার, টার্টার ইত্যাদি মিসাইল ক্রুজারে বসানো হয়। সবগুলিই 'স্যাম' ( স্থল ) বা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে আকাশ শ্রেণীর। ট্যালস মিসাইল, ৬৫ মাইল পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আগন্তুক শত্রু বিমানকে ফেলে দিতে পারত। এর এঞ্জিন ছিল র‍্যাম জেট চালিত। টেরিয়ার ছিল মাঝারি পাল্লার মিসাইল। নিরেট জ্বালানীর এঞ্জিন। লম্বায় ১৫ ফুট, ওজন ৩০০০ পাউণ্ড।

টার্টার ছিল নিকট পাল্লার নীরেট জ্বালানীর রকেট চালিত মিসাইল। টার্টার ৫০,০০০ ফুট উপরে উঠে দশ মাইল দূর পর্যন্ত তাড়া করতে পারে।

সাবমেরিন ধ্বংসী মিসাইলের মধ্যে, রকেট চালিত ওয়েপন, "আলফা টর্পেডো" ছিল ১২$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি ব্যাসের। এটা নিক্ষেপকারী জাহাজ থেকে নামিয়ে দিলে কয়েক শ গজ দূরে ডেপথ চার্জ পৌছে দিতে পারে। সবচেয়ে বড়ো কথা এটি শব্দানুসারী গাইডেড মিসাইল। জলের মধ্যে দিয়ে যায়। শব্দ "ফলো" করে গিয়ে আঘাত হানে। এবং আপনিই নিশানা খুঁজে নেয়। সাবমেরিন ধ্বংসী অ্যাসরক-অ্যান্টি সাবমেরিন রকেট বেশ মজার। প্রথম কতকটা পথ হাওয়া দিয়ে ভেসে গিয়ে, পরে জলে ডুব মারে।

## ফ্রিগেট

নৌবহরের তালিকায় আকারে প্রকারে তিন নম্বর হলো ফ্রিগেট। এর কাজ প্রতিরক্ষা। কার্যত গাইডেড মিসাইলবাহী। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই থাক না, যে কোন

'রাফ' সমুদ্রে ফ্রিগেট চলতে পারে। এতে টেরিয়ার থাকে অ্যাসরক থাকে। আর থাকে কটা কামান। পারমাণবিক শক্তি চালিত গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট-এর অভাব নেই আজকাল।

## ডেষ্ট্রয়ার

৪০০ ফুট লম্বা হলেও, অপসারণ ক্ষমতা ৫০০০ টনেরও কম। তার মানে ডেস্ট্রয়ার আকারে ছোট। দেখতে ছিমছাম, চলনে অতিদ্রুত। আগেকার ডেস্ট্রয়ারগুলিকে সব গাইডেড মিসাইলবাহী করে ফেলা হয়েছে। এতে হাওয়াই প্রতিরক্ষার জন্য 'টার্টার' মিসাইল থাকে, কিছু পুরনো কামানও থাকে। আর থাকে নতুন সাবমেরিন-অন্বেষী যন্ত্রপাতি, সাবমেরিন-ঘাতী রকেট ছোড়ার ব্যবস্থা ( অ্যাসরক জাতীয় ), দুটো টর্পেডো ছোড়ার যন্ত্র, দুটো চালকবিহীন বিমান, সাবমেরিন ধ্বংসী হেলিকপটার ইত্যাদি। চালকবিহীন হেলিকপটার, অনেক দূরে রাখা ডেস্ট্রয়ার থেকে টর্পেডো বয়ে নিয়ে যায়।

ডেস্ট্রয়ারের কাজ শত্রুকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করা। ভূমিকাটা নতুন নয়। পন্থাটা নতুন। পন্থাটা বদলেছে, আরও বদলাচ্ছে। উড়োজাহাজ বা আকাশ থেকে শত্রুর আক্রমণ হলে ডেস্ট্রয়ারের মূল লক্ষ্য নিজের নৌবহর থেকে যতোদূরে সম্ভব এগিয়ে গিয়ে শত্রুকে বাধা দেয়া। শত্রুরা সাবমেরিন নিয়ে অন্তর্জলী আক্রমণ করলে ডেস্ট্রয়াররা যতোটা পারে রক্ষা নৌবহরকে কেন্দ্র করে বলয় আকৃতিতে গুটিয়ে আসে। কারণ, হাওয়াই আক্রমণের বা প্রতিরক্ষার হাতিয়ারের তুলনায়, জলের তলায় প্রতিরক্ষার হাতিয়ারের পাল্লা অনেক কম।

## এসকর্ট শিপ ( পাহারাদার )

নৌবহরে সবচেয়ে ক্ষুদ্রায়তন হলো এসকর্ট শিপ। অনেক দূর পাল্লার "সোনার" যন্ত্রপাতি থাকে, চালকবিহীন সাবমেরিন-ধ্বংসী হেলিকপটার থাকে। নৌবহরকে সাবমেরিন আক্রমণ থেকে বাঁচানোই হচ্ছে এদের কাজ।

## সাবমেরিন

নৌবহরে, সাবমেরিনের প্রাধান্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। আগে থেকে অত্যন্ত গুরু ভূমিকা ছিলই। তার ওপর আজকাল এগুলি পারমাণবিক চালিত হচ্ছে। গুরুত্বের তো কথাই নেই। এতে পাল্লা বেড়েছে স্পীডও বেড়েছে অপরিসীম। পারমাণবিক শক্তি পরিচালিত হবার

ফলে আগেকার এঞ্জিনের চেয়ে আকারে ও ওজনে অনেক ছোট হতে পেরেছে। জ্বালানী রাখার ট্যাঙ্ক নেই, বিরাট ইলেকট্রিক ব্যাটারী নেই। পারমাণবিক শক্তি চালিত এঞ্জিনের সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো—এতে হাওয়া লাগে না। জ্বালানীর পরিত্যক্ত অপদ্রব্য নেই। আর জ্বালানীর প্রয়োজন এতো কম যে, লাগেনা বললেই চলে।

পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিন তো আজকের কথা নয়। আমেরিকা প্রথম চালু করেছে ১৯৫৪ সালে। সেটার নাম ছিল 'নটিলাস'।

জলযুদ্ধে আজও পর্যন্ত সাবমেরিন যতো জাহাজ ডুবিয়েছে, অন্য সমস্ত সমরাস্ত্রের ফসল যোগ করে তার সমতুল হবে না।

ব্রিটেন, আমেরিকার সমরাস্ত্র নির্মানী বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদদের এক চতুর্থাংশই যে সাবমেরিন তৈরী করেন বা ঐ নিয়ে মাথা ঘামান—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

র‍্যাডার কর্তৃক আবিষ্কৃত হবার আশঙ্কার পরিমাণ কমাতে, আবিষ্কৃত হয়েছিল 'স্নরকেল টিউব'। আগেকার সাবমেরিনের কাঠামো ছিল ফুটবল মাঠের আকারের। সেটাকে র‍্যাডার দিয়ে খুঁজে বের করা নিশ্চয় অনেক সোজা ছিল। স্নরকেল টিউবটি আয়তনে একটি পিঁপের চেয়ে বড়ো নয়। আগেকার সাবমেরিনদের, হাওয়া নেবার প্রয়োজনে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর ভেসে উঠতে হতো, তাই শত্রুর গোচরে আসার আশঙ্কা থাকতো প্রচুর। পিঁপের আকার স্নরকেল টিউবটি হলো, সাবমেরিনের প্রশ্বাস নেবার ও নিঃশ্বাস ফেলার উপকরণ। সাবমেরিনের নাক। এই নাকটি জলের উপর জাগিয়ে রাখার ফলে সাবমেরিনকে 'সারফেস' করার প্রয়োজনও হতো না, ধরা পড়ার আশঙ্কাও তাই অনেক ক'মে গিয়েছিল। তাছাড়া সাবমেরিনরা কাঠামোর আয়তন ছোট করে ফেলল, আকৃতিও বদলে ফেলল। ফলে, জল-তলের স্পীড অনেকগুণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছিল। নতুন পারমাণবিক শক্তি পরিচালিত সাবমেরিনের এসব বালাই রইল না। এরোপ্লেনের মতনই "কনট্রোল ভেন" আছে এতে। নাবিকদের জন্য ভালো উৎকর্ষের খাবার থাকে। এবং নাবিকদের প্রয়োজনের এবং কমপ্রেসার ইত্যাদি প্রয়োজনের অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা সাবমেরিনের মধ্যেই থাকে। ফলে মাসের পর মাস সাবমেরিন ডুব মেরে থাকতে পারে। আমেরিকার 'ট্রাইটন' সাবমেরিন এক নাগাড়ে ৮৪ দিন ডুবে থেকে সারা পৃথিবী টহল মেরে এসেছিল।

জাপানী নৌবাহিনী, বিমান-বহর-বাহী সাবমেরিন তৈরী করেছিল, সে কি আজকের কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। ৪০০ ফুট লম্বা ৫৭০০ টন অপসারণ ক্ষমতাওয়ালা ছিল এগুলি। এগুলির প্রত্যেকটির হ্যাঙ্গারে চারটি বিমান আশ্রয় নিতে পারত। ১০৫ বা ১৪০ মিলিমিটারের কামান-আঁটা, টর্পেডো টিউবওলা এই জাপানী সাবমেরিন ৩০০ ফুট ডুব মারতে পারত। পাল্লা ছিল ৩০,০০০ মাইল। বুঝুন একবার। এতোগুলো এরোপ্লেন টেরোপ্লেন নিয়ে জলের তলায় একেবারে গায়েব। আর শুধু তাই নয়। লোক লোচনের অগোচরে থেকে ১৫০০০ মাইল দূরে গিয়ে কম্মটি সেরে আবার ১৫০০০ মাইল ফিরে নিজ নীড়ে আসা—! কী বিরাট ব্যাপার!

গত মহাযুদ্ধে অক্ষশক্তির অন্তত ৭০ খানা সাবমেরিন ডুবিয়ে দিয়েছে মিত্র-শক্তির সাবমেরিন।

১৯৪৯ সালে হাওয়াই-র উপকূলে মার্কিন নৌবাহিনীর মহড়া হচ্ছিল। তার একটি খেলা ছিল—জলের তলা থেকে সাবমেরিন ভেসে উঠল। জার্মানীর ভি-১ জাতের রকেট ফায়ার করল। নৌবহরের জাহাজগুলির মাথার উপর দিয়ে তাদের পার হয়ে অনেক ওপাশে গিয়ে পড়ল রকেট। অর্থাৎ কিনা জলের তলা থেকে তোমাদের সর্বনাশ করতে পারতাম। এর আগে যা ছিল সে ছিল, জলের তলা থেকে জলের তলায়।

এগারো বছর পর। জলের তলার সাবমেরিন থেকে কয়েক শ ফুট জল ভেদ করে উঠে এল মিসাইল। 'পোলারিস'। আকাশে অধিবৃত্ত রচনা করে কয়েক'শ মাইল এগিয়ে গেল। অর্থাৎ জলের তলায় অদৃশ্য থেকে, নৌবহরের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে এসে সেই নৌবহরকে ধ্বংস করা সম্ভব হলো। কাছাকাছি আসা মানে—লক্ষ্যে নির্ভুল হওয়া।

## সাবমেরিন তিন রকমের

(ক) মামুলী ধরণের আক্রমণের ( কনভেনশনাল অ্যাটাক )

(খ) পারমাণবিক আক্রমণের ( নিউক্লিয়ার অ্যাটাক )

(গ) নৌবহর ক্ষেপণাস্ত্র ধরণের ( ফ্লীট ব্যালিষ্টিক মিসাইল )

প্রথম (ক) শ্রেণীর সাবমেরিন—মান্ধাতার আমলের হলেও আজও চালু আছে কিছু কিছু।

দ্বিতীয় (খ) শ্রেণীর সাবমেরিন—পুরনো ডিজাইনের কাঠামো। দুই প্রপেলারওলা পুরনো সাবমেরিন গুলোকেই পারমাণবিক শক্তি দিয়ে চালানো হচ্ছে। **এই শ্রেণীর সাবমেরিন হ্যালিবাট—টার্বো জেট এঞ্জিন চালিত**। এতে **এস-এস এম** স্থল বা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে স্থল বা সমুদ্র পৃষ্ঠ শ্রেণীর, **'রেগুলাস' মিসাইল** থাকত।

তৃতীয় (গ) শ্রেণীর সাবমেরিন-'ট্রাইটন' তো বিরাট ঢাউস। সম্পূর্ণ নিজজ্জিত অবস্থায় এর ( ডিসপ্লেসমেন্ট ) অপসারণ ক্ষমতা ছিল ৭৭৫০ টন। দু'দুটো পারমাণবিক চুল্লী চালিত। এর কম্ম ছিল—প্রহরী গিরি করা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত ডুবো জাহাজগুলির বেশীর ভাগই ছিল ব্যাটারী ( ইলেকট্রিক সেল-এর সমষ্টি অর্থে ) চালিত। ব্যাটারী চার্জ করা এবং নাবিকদের বেঁচে থাকার অক্সিজেন সংগ্রহের জন্য তাই তাদের মাঝে মাঝে ভেসে ওঠা অনিবার্য ছিল। ভেসে ওঠা মানেই বিপদ ডেকে আনা। শত্রু র‍্যাডারের নজরে পড়ে যাওয়া। ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য এই সাবমেরিনগুলিকে তাই এঞ্জিন বন্ধ করে জলের তলায় নিশ্চলভাবে বসে থাকতে হতো। যুদ্ধের শেষের দিকে বিরাট লম্বা টেলিস্কোপ ধরণের নল লাগানো হল। এই নলের সাহায্যে সমুদ্রের উপর থেকে হাওয়া টেনে নেওয়া হত। এবং ডিজেল এঞ্জিন বা ব্যাটারীকে জলের নিচেই চালিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু এতেও শত্রু র‍্যাডারের শ্যেন-দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব হ'লো না।

পারমাণবিক ডুবো জাহাজ এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর।

এরা সাধারণ ডুবো জাহাজের চেয়ে অনেক ক্ষিপ্রগতি। জলের তলায় চলা ফেরা এদের অনেক স্বচ্ছন্দ। **সাগর জল থেকেই অক্সিজেন সংগ্রহ করে নিতে পারে বলে অনির্দিষ্টকাল জলের তলায় ডুব মেরে থাকতে পারে। ভেসে উঠতে হয় না।** এরা চোখের পলকে মারাত্মক ধরণের শব্দ **অনুসরণকারী টরপেডো** বা **ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে চোখের পলকেই জলের তলায় ডুব মারতে পারে।** জলের তলা থেকেই পোলারিস সাবমেরিনগুলি মারাত্মক টরপেডো বা মিসাইল ছুড়ে বিপক্ষ জাহাজ ধ্বংস করতে পারে। বা শত্রুর দেশের স্থলভাগেও প্রচুর ক্ষতিসাধন করতে পারে।

সর্বাধুনিক পোলারিসগুলিকে আই সি বি এম বাঅন্তর্মহাদেশ ক্ষেপণাস্ত্রে সজ্জিত করা হচ্ছে। যাতে এরা **লক্ষ্যবস্তুর বহুদূরে, সাগর জলে লুকিয়ে থেকেই** শত্রুর ওপর **আচমকা ও ধ্বংসাত্মক আঘাত হানতে পারে।** এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ঃ।

**Nuclear powered submarines some capable of firing ballistic missiles are now a threat to land areas as well as shipping. New detection and underwater fire control equipment enable a nuclear submarine to launch fast deadly homing torpedoes from deep beneath the surface with good accuracy.**

এই ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার দু'রকম পদ্ধতি আছে (ক) এয়ার ইনজেকশান পদ্ধতি (খ) গ্যাস-স্টীম জেনারেটার পদ্ধতি। জলের চাপ বা অন্য কোন অবস্থা এই ডুবোজাহাজগুলির গতি বা গতিপথের কোন রকম বাধা বন্ধই সৃষ্টি করতে পারে না।

বর্তমান বিশ্বের দুই সুপার পাওয়ার আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া উভয়েরই এই জাতের পারমাণবিক ডুবো জাহাজ আছে। ৭০ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ছিল ৪৭ খানা পারমাণবিক, আর ৫৭ খানা ডিজেল ইলেকট্রিক ডুবো জাহাজ। ৭৫ সাল নাগাদ পারমাণবিক ডুবো জাহাজের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫৬।

'৬০-৬১' সালে সোভিয়েট রাশিয়ার ডুবোজাহাজের সংখ্যা ৫০০। এর মধ্যে পারমাণবিকের সংখ্যা ৪০।

নৌবিভাগে পারমানবিক ডুবোজাহাজের প্রবর্তনের ইতিহাসটি বেশ অনুধাবনযোগ্য। বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক ডুবোজাহাজ হলো নটিলাস। ১৯৪৭ সালে আমেরিকার নৌবিভাগে ব্যবহারের জন্য রি-অ্যাকটার তৈরী করার অনুরোধ জানানো হয়। ১৯৪৮ সালে পরিকল্পনা সুরু। ৫০ এ নির্মাণ আরম্ভ। ১৭ জানুয়ারী' ৫৫—'নটিলাস' ডুবোযাত্রা সুরু করলো। নটিলাস লম্বায় ৩২৩·৭ ফুট, প্রস্থে ২৭·৬ ফুট। এতে আছে দুটি স্টিম টারবাইন এঞ্জিন। এর টরপেডো টিউব ৫৩৩ মিলিমিটার ব্যাসের। গতিবেগ ঘণ্টায় ২০ সামুদ্রিক মাইল। দীর্ঘতম ডুবোযাত্রার নজীর সৃষ্টি করে 'নটিলাস'ই, তার প্রথম যাত্রায়। ১৯৫৫ সালের মে মাসে। ১৩০০ মাইল ডুব সাঁতারে সান জোয়ান থেকে রওনা হয়ে পোর্টোরিকো (Puerto Rico) পর্যন্ত। এরপর ১৯৫৮ সালে উত্তর মেরুর বরফ

ঢাকা সমুদ্র তল দিয়ে চলে! এই বছরেরই অগাস্ট মাসে প্রশান্ত মহাসাগরের পার্ল হারবার থেকে একটানা চ'লে আটলান্টিক পোর্টল্যাণ্ডে পৌছায়। ১৯৬১ সালে পোলারিস শ্রেণীর ডুবোজাহাজ 'প্যাট্রিক হেনরী' ওপরে একবারও না-ভেসে উঠে, ৬৬ দিন ২২ ঘণ্টা একটানা জলের নিচেই কাটিয়ে দিল।

নটিলাস প্ল্যাণ্ট চলতো 'ইউরেনিয়াম-২৩৫' এ। ২৩০০ টন কয়লা বা তিন লক্ষ গ্যালন জ্বালানী তেলের উৎপাদিত শক্তির, সমপরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম এ।

মোটামুটি তিন উদ্দেশ্যে তিন রকমের পারমাণবিক ডুবোজাহাজ তৈরী হয়ে থাকে। (ক) টারগেট সাবমেরিন—জলের তলার যুদ্ধের কলাকৌশল শিক্ষা দেবার জন্য অনুশীলন শ্রেণীর। (খ) জাহাজের কাঠামো বা নকশা পরীক্ষা, স্বচ্ছন্দ গতিতে অবলীলায় জলের নীচে চলাফেরার অনুশীলন, পারমাণবিক পাওয়ার প্ল্যাণ্ট পরীক্ষা ইত্যাদির জন্য একরকম। (গ) সাগর বিজ্ঞান গবেষণার জন্য—রিসার্চ সাবমেরিন। আকারে ছোট, ব্যাটারী শক্তি সীমিত বলেই সমান্তরাল না-চলে লম্বভাবে বা খাড়া ডুব মারে।

পারমাণবিক ডুবোজাহাজে মোটামুটি আটটি বিভাগ থাকে। (১) অ্যাটাক সেণ্টার—যে অস্ত্রাগারে বসে শব্দভেদী প্রভৃতি বাণ ছোড়া হয়। (২) ব্যাটারী ঘর (৩) খাবার দাবার রাখার ভাঁড়ার ঘর (৪) বাসস্থান ও খাবার ঘর (৫) অগ্রবর্তী টর্পেডো ঘর (৬) পেরিস্কোপের ঘর (৭) নিয়ন্ত্রণ ঘর বা কনট্রোল রুম (৮) জাহাজের পুল বা ব্রিজ।

দূরপাল্লার মিসাইল বাহী পোলারিস-এ আরো চারটি বেশী প্রকোষ্ঠ থাকে। পারমাণবিক ডুবোজাহাজ, বাষ্প চালিত টারবাইন দ্বারা চলে। তাই এর এঞ্জিন ঘর সহজেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে এখানে শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে। এর রিঅ্যাকটর কম্পার্টমেণ্ট থেকে নিঃসৃত তেজস্ক্রিয়তা সংশ্লিষ্ট সাগর জল দূষিত করে। তাই যতোক্ষণ জাহাজ চলে ততোক্ষণ রিঅ্যাকটর বন্ধ রাখতে হয়।

৮৪০০ ফুট ডুব মেরে গভীরতম ডুবের ইতিহাস তৈরী করলো "থ্রেসার" ১৯৬৩ সাল, ১০ এপ্রিল। জায়গাটা আটলান্টিকে, বোষ্টন থেকে ৩০০ কিলোমিটার পূর্বে। অপারেশান সাকসেসফুল হলো। কিন্তু ১৩০ জন নাবিক নিয়ে থ্রেসার ডুবে গেল।

একটি উল্লেখের দাবীওয়ালা মিসাইল এই 'সাবরক' অথবা সাবমেরিন

রকেট। জলের তলায় টর্পেডো টিউব থেকে ছোড়া হলো। জলের তলা দিয়ে খানিকটা গিয়ে ভাসল। জলের ওপর ভেসে ভেসে খানিক গিয়ে এবার হাওয়ায় সওয়ার হলো। হাওয়ায় ভেসে আরও খানিক গিয়ে ডুব মারল। এবার ডুব সাঁতার কেটে জাহাজের বা শত্রুর সাবমেরিনের পেট ফাঁসিয়ে দিল।

নৌবহরে থাকে (ক) ক্যারিয়ার (খ) ক্রুজার (গ) ফ্রিগেট (ঘ) ডেষ্ট্রয়ার, দরকার বুঝে (ঙ) ডাঙ্গায় পৌছবার জলযান (চ) সাবমেরিন এবং (ছ) সরবরাহের জলযান।

স্ট্র্যাটেজিক মিসাইল স্থির বিন্দুকে অর্থাৎ অচল লক্ষ্য বস্তুকে ঘায়েল করতে পারে, যার ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক ( জিওগ্রাফিকাল কো-অর্ডিনেট ) জানা আছে। লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নৌবহর তো সচল। স্ট্র্যাটেজিক মিসাইল দিয়ে সুবিধা হবে না।

নৌবহরকে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করবে, বিমান দিয়ে ওপর থেকে, নয়তো সাবমেরিন দিয়ে তলা থেকে। অন্য জাহাজ থেকে বা উপকূল থেকে বড়ো ৩০০০ মণী কামান দিয়ে লড়াই করার দিন নেই আর।

ওপর থেকে বিমান আক্রমণ হলে নৌবহর বাঁচবে কী উপায়ে ?

যতো দূর পর্যন্ত সম্ভব শত্রু বিমানের আগমন ধরা পড়বে, র‍্যাডারে। অথবা, ধরা পড়বে আমাদের অন্য বিমান, সাবমেরিন বা ডেষ্ট্রয়ারের কাছে। আমাদের ক্যারিয়ার বা বিমানবাহী জাহাজ থেকে বিমান উড়ে গিয়ে প্রথম বাধা দেবে। যতোগুলো পারে, শত্রু বিমান মাটিতে ফেলবে। আবার জঙ্গী বিমান নিয়োগ করবে তাপ-অন্বেষী, 'সাইড ওয়াইণ্ডার' বা স্প্যারো' জাতীয় আকাশ থেকে আকাশ মিসাইল। বোমারু বা জঙ্গী বিমান যিনিই আক্রমণ করতে আসছেন, তার জেট এঞ্জিনে তাপ আছে প্রচুর। আক্রমণকারী ব্যোমযান, বিমান না হয়ে মিসাইল হলে তো কথাই নেই। তার এঞ্জিনের তাপ তো সর্বনেশে তাপ। সে তো এতো গরম যে ভাস্বর হয়ে জ্বলতে জ্বলতে আসছে। 'সাইডওয়াইণ্ডার'-এর কথাই ধরুন না। ইলেকট্রনিক বলতে কিছু নেই, একটি ছোট্ট বেতার যন্ত্র ছাড়া! 'সাইডওয়াইণ্ডার' লম্বায় ন'ফুট ওজন ১৫৫ পাউণ্ড। ইনি তাপের উৎসস্থলকে নিশানা হিসাবে "দেখতে" পান আর অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে নিশানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

'স্প্যারো' আকারে কিছু বড়ো। নিক্ষেপকারী জাহাজ থেকে মেঘ ছাড়িয়ে অনেক উর্দ্ধলোকে পৌঁছে র‍্যাডার রশ্মির সাহায্যে নিখুঁতভাবে নিশানা খুঁজে পান। **'সাইডওয়াইণ্ডার'-এর যন্ত্রপ্রণালী বা বেতার যন্ত্র, অবলোহিত রশ্মিতে আর 'স্প্যারো'র যন্ত্রপাতি, র‍্যাডার রশ্মিতে শিক্ষিত ও দীক্ষিত।** ক্যারিয়ার থেকে ওড়া আমাদের জঙ্গী বিমান বহরের চক্রব্যূহ যে শত্রু-বিমান ভেদ করতে পেরেছে তার বিপদ আরো জোর। সে র‍্যাম-জেট চালিত 'ট্যালস' মিসাইল এর পাল্লা ৬৫ মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। **'ট্যালস' একেবারে নিশ্চিত মৃত্যু।** একেবারে সাক্ষাৎ যম। এর হাত থেকে নিস্তার নেই। ছাড়ান ছোড়ান নেই। ৩০ ফুট লম্বা ৩০০০ পাউণ্ড ওজনের যমদূতটি শব্দের দুগুণের চেয়েও জোরে ওড়ে।

যেখানে পৌঁছে বোমারু থেকে বোমা ছেড়ে দিলে অভিকর্ষের টানে লক্ষ্যবস্তুতে ঠিক মতো পড়তে পারে, আকাশে সেই বিন্দুতে শত্রুর বোমারু পৌঁছবার অনেক আগেই, **শব্দাতিগ গতির মিসাইল 'টেরিয়ার' 'টার্টার'** আগন্তুক বোমারুকে ধরাশায়ী করবে।

কাছাকাছি এসে স্বেচ্ছাপতন বোমা, **ফ্রী-ফলিং বম** বা হাওয়া বাহিত টর্পেডো দিয়ে জুত হবে না। কাছাকাছি আসতে দেয়াই চলবে না। আকাশ থেকে হোক, সমুদ্র পৃষ্ঠের জাহাজ থেকে হোক, জলের তলার সাবমেরিন থেকে হোক, শত্রুকে মিসাইলের সাহায্যই নিতে হবে।

**সব চেয়ে ভয় শত্রুপক্ষের সাবমেরিনকে।** উড়োজাহাজ থেকে হামলা—তার কাছে কিছু না।

কতরকমের এ-এস-এম মিসাইল, নিয়ন্ত্রিত টর্পেডো, রকেট-চালিত ডেপথ চার্জ, কতো রকমের ব্রহ্মাস্ত্রই তো আছে। থাকলেও, পুরোপুরি নিমজ্জিত শত্রু-সাবমেরিনের উপস্থিতি বা অস্তিত্ব খুঁজে বের করা খুব শক্ত। অসম্ভবের গা ঘেঁষা। "সোনার" আওয়াজের সাহায্যে—অর্থাৎ শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে, সেই তরঙ্গকে সাবমেরিনের গায়ে প্রতিহত করিয়ে সাবমেরিনের অস্তিত্ব, উপস্থিতি, দিক, দূরত্ব সবই ধরতে পারে। কিন্তু "সোনার"-এর পাল্লা যে খুব কম। 'সোনার'-এর আওতার বাইরে থেকে শত্রুপক্ষের গাইডেড মিসাইল আমাদের নির্ভুল ঘায়েল করতে পারে। তা হলেও জলের তলার যন্ত্রপাতির নিখুঁতত্ব সর্বদাই, স্বাভাবিক কারণেই সীমিত—

১৯৬০ সালে একটি 'নাইক হারকিউলিস' Nike Hercules মিসাইল শব্দের তিনগুণ স্পীডের নিশানাকে ফেলে দিল। আর একটি 'নাইক হারকিউলিস্' আকাশে ১৫০,০০০ ফুট ওপরে উঠে নিশানাকে ঘায়েল করে এল।

তার মানে কি? গতি যতো বেশীই হোক, যতো ওপর দিয়েই উড়ুক এরোপ্লেন, আগামী দশকে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।—এ কথা বলে দেয়ার দরকার করে না।

## অষ্টম অধ্যায়

## প্রতিরক্ষার মিসাইল

শত্রু তার দেশে বসে' ৫৫০০ মাইল দূর থেকে একটি আন্তর্মহাদেশ মিসাইল ছাড়বে, এসে পড়বে আমাদের বুকে। আর, আমরা কী দাঁড়িয়ে মার খাবো? মুখ বুজে থেকেই মরে যাবো? একটু প্রতিবাদ, একটু রোখার চেষ্টাও করবো না? ব্যাক-টু-দি-ওয়াল যে শেষ-লড়া লড়ে, সে কি অমনি ছেড়ে দেয়। মৃত্যু-কালে একটা পিঁপড়েও তো কুটুস করে কামড়ায়!

বিষকে নষ্ট করতে আর-এক বিষ জন্মায়।

মিসাইল যেমন আছে, মিসাইল ধ্বংসী মিসাইল (অ্যান্টি-মিসাইল মিসাইলও) আছে। আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কার করতে হয়েছে। আই-সি-বি-এম মেরে দিয়ে নিরঙ্কুশ বেরিয়ে যাবে, তা হতে পারে না। তার মৃত্যুবাণও আছে।

একটি আন্তর্মহাদেশ মিসাইল মাটির মায়া কাটিয়ে সিধে উঠবে হাজার মাইল। অধিবৃত্তপথে পাঁচ সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল যাবে। তারপর নিশানার দিকে নামতে থাকবে সেকেণ্ডে চার মাইল হিসেবে। বায়ুমণ্ডল যতোক্ষণে তার গতিকে মন্থর করে দিতে থাকবে, ততোক্ষণে তার আর সব ফালতু জিনিস ঝরে গেছে। শুধু বিস্ফোরক বাহীটুকু দেদীপ্যমান। গরমের জন্যেই হোক, বাতাসের ঘষা লেগেই হোক, তখন সে ভাস্বর।

স্ট্রাটেজিক ব্যালিষ্টিক মিসাইলের জীবনে চারটি ঋতু আসে। দেখা যাক কখন তাকে প্রতি আক্রমণ করা সব চেয়েও সুবিধে—। সেই চারটি ঋতু হচ্ছে, প্রথম—শত্রুর দেশে মিসাইল তখনও মাটিতে বা সমুদ্র পৃষ্ঠে আছে। ছাড়া

হয়নি। দ্বিতীয়। শত্রু মিসাইলের ওড়ার প্রাথমিক অবস্থায়। তখনও ওপরে উঠে চলেছে। তৃতীয়। মিসাইলের যাত্রার মধ্য পথে। সীমাহীন শূন্যের মধ্যে দিয়ে চলেছে শত্রু মিসাইল। চতুর্থ। যাত্রার শেষ পর্বে। শত্রু মিসাইল যখন বায়ুমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশ করছে এবং শিকারের, তথা আমাদের কাছে এগোচ্ছে—

প্রথম পর্যায়। এই স্টেজএ এটিকে আবিষ্কার করাই প্রায় অসম্ভব। নিতান্তই অসম্ভব না-হলেও বেশ কঠিন। নিরেট (সলিড) জ্বালানী তৈরী হবার পর মিসাইল ছোড়ার মঞ্চ যেখানে-ইচ্ছে-সেখানে, যখন-ইচ্ছে-তখন সরিয়ে নেওয়া যায়। নেওয়া হয়। তাকে আবিষ্কার করা যাবে কি করে? তরল জ্বালানীর মিসাইল নিক্ষেপ-মঞ্চ আকারে বিরাট ব'লে স্থাবর। ভূপৃষ্ঠের বা সমুদ্র পৃষ্ঠের যেখানে ইচ্ছে সেখানে করা যেতে পারে। কিন্তু যখন তখন যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া চলবে না। নিরেট জ্বালানীর মিসাইল-মঞ্চ তো আরো অনেক ছোটো। আরো সহজে নড়ে-চড়ে বেড়াতে পারে মাটির উপরে। জলের তলায়। যেখানে খুশী ছোট্ট একটু জায়গায় তাকে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে।

কাজেই নিক্ষিপ্ত হবার আগে, যাত্রা সুরুর আগে তাকে আক্রমণ করার প্রশ্ন প্রায় হাস্যকর। শত্রুর মিসাইলের অবস্থানই তো জানা যাচ্ছে না—

দ্বিতীয় পর্যায়। এই অবস্থাতেই আক্রমণ করা খুব সোজা নয়। সে তো তখনও আক্রমণকারীর আকাশে। আক্রান্ত সেখানে হাত বাড়াবে কি করে? বায়ুমণ্ডল ভেদ করে চলেছে। চলেছে। উঠবে খাড়া হাজার মাইল। গতি মন্থর। যাত্রাপথ ঋজু। শত্রুকে এড়াবার জন্যে ঝুল কাটাবার চেষ্টায় এপাশ ওপাশ করছে না। সিধে উঠছে। লেজুড় রেখে যাচ্ছে দীর্ঘ, উজ্জ্বল একটি অগ্নিশিখার। আই-সি-বি-এম বলে চিনতে কষ্ট হয় না। আর, এই চকচকে শিখাটিকে লুকোবারও ব্যবস্থা নেই। বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ওঠার পথ টুকুতেই তার সমস্ত জালানীটুকু নিঃশেষে খরচা হয়ে যাবে। সেইজন্যই তখন সেটি ভাস্বর! অর্থাৎ জ্বালানী যতোক্ষণ জ্বলছে।

এই পর্যন্ত ঠিকই আছে। পৃথিবীর মায়া কাটাতে হচ্ছে বলে গতি তখনও মন্থর। তখনও সমস্তটুকু জালানীর ওজন কমিয়ে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে সূক্ষ্ম শরীরের হাল্কা নিয়ে মহাশূন্যের দিকে উঠেই চলেছে। তাকে পাঁচ হাজার মাইল যেতে হবে, তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এখান থেকে হবে কি করে? সে তো অন্য মহাদেশ! হাতের কাছে নেই তো!

ICBM মিশাইল চলেছে হাজার মাইল ওপর দিয়ে—স্পীড ঘণ্টায় ১৫০০০ মাইল।

তৃতীয় পর্যায়। এখানে স্মর্তব্য, আন্তর্মহাদেশ ব্যালিষ্টিক মিসাইলের জ্বালানীর অনেকটা ফুরিয়ে গেছে মহাকাশে পৌঁছতে গিয়েই। অনুভূমির সঙ্গে ৪৫° ডিগ্রী রচনা করে মহাশূন্যে চলেছে। এবার পাঁচ হাজার মাইল পরিক্রমা। একটি বিরাট 'চাপ' ( আর্ক ) বা বৃত্তাংশ রচনা করে চলেছে সে। শেষের ক'মাইল অনেকটা এঞ্জিন বিহীন গ্লাইডারের মতো। গতিবেগ ভেলসিটি সম্বল। মিসাইল একবার বায়ুমণ্ডলের পিছুটান কাটিয়ে মহাশূন্যে ওঠার পরই তার গতিবেগ ঘণ্টায় ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ মাইল।

**তার মানে, এক হাজার মাইল উঁচু দিয়ে চলেছে। গতিপথ অনুভূমিক নয়! বৃত্তের 'চাপ' আকার। ঘণ্টায় যাচ্ছে পনেরো হাজার মাইল।**

পাঁচ হাজার মাইল দূরে যদি নিশানা থাকে, তা হলে সীমাহীন শূন্যতায় তার স্থিতি **পনেরো থেকে বিশ মিনিট।**

এই সময়টা পাওয়া যাচ্ছে তাকে ঘায়েল করার জন্যে। সময় পেলে হবে কী? তখন সে মহাশূন্যে। অনেক উঁচুতে। অনেক দ্রুত তার গতি। তার এগজস্ট কিছু নেই, চরণ রেখাও রেখে যাচ্ছে না। স্পেস-এ চলেছে নিঃশব্দে। হাওয়ায় ভেসে। কোন গোলমাল করছে না। কোন শব্দও নেই। চেনার চিহ্ন পাচ্ছি না।

আপাত দৃষ্টিতে, সময় পাচ্ছি বটে পনেরো বিশ মিনিট, কিন্তু এই যাত্রাপথের এই তৃতীয় স্টেপ-এও সে ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

চতুর্থ পর্যায়। এই চতুর্থ স্টেপ-এ সেটি নেমে আসছে। শিকারের কাছাকাছি আসতেই হচ্ছে তাকে। নিজের ওজনেই নামছে।

এই সময়টুকুই তাকে ঘায়েল করবার সব চেয়ে উপযুক্ত। আমরা তো যথেষ্ট সময় আগেই ওয়ার্নিং পেয়ে গেছি। প্রস্তুত হয়ে আছি তাকে ঘায়েল করতে। এই একটুখানি সময় আগন্তুক মিসাইলের জীবনে মারাত্মক।

## কি করে ঘায়েল করা যায়

একটি পন্থা বলছি। পন্থাটি আমেরিকানদের। নাইক জিউস (Nike Zeus) ব্যবস্থা।

র‍্যাডার (radar) মানে রেডিও ডিটেক্টিং অ্যাণ্ড রেনজিং! অতি মাত্রায়

বেশী কম্পাঙ্কের বেতার তরঙ্গ পাঠিয়ে আগমনরত বস্তুর গায়ে প্রতিফলিত করে আনা হয়। তাকে মাটিতে রাখা গ্রাহক যন্ত্রে ধ'রে, আগমনরতের দূরত্ব এবং দিক নির্ণয় করে নেয়া হয়।

**জিউসের র‍্যাডার কয়েক শ মাইল ব্যাপী আকাশের আটটা দিকে বিদিকে তন্ন তন্ন করে মিসাইল বা এরোপ্লেন সন্ধান ক'রে ফেরে। কয়েক শ মাইল ব্যাস নিয়ে ব্যাপ্ত এর ক্ষেত্র।**

এই র‍্যাডারটির ছুটি প্রত্যঙ্গ। একটি বেতার তরঙ্গ প্রেরক। যেটি বেতার তরঙ্গের সংকেত নিয়ে কয়েক শ মাইল ব্যাসের আকাশ ঝেঁটিয়ে তল্লাস করে ফেরে। অপরটি, বিশাল গোলকাকার সংকেত গ্রাহক। যেটি কোন আগমন রত বস্তুর গায়ে প্রতিফলিত সংকেত গ্রহণ করে। অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ছাখে। বের করে তার দূরত্ব, নির্ণয় করে তার দিক।

আকাশ পথে আগন্তুক কিছু ধরা পড়লে দ্বিতীয় একটি র‍্যাডার আপনা আপনিই এবং তৎক্ষণাৎ কার্য স্বরু করে ছায়। এটিকে বলা হয় ডিসক্রিমিনেশন র‍্যাডার। আগন্তুক আই-সি-বি-এম, শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রায়শঃই ফাঁদে ফেলার টোপ বা মিথ্যে নিশানা ইত্যাদি ছেড়ে ছায়। এই বিশ্লেষক র‍্যাডার, কোন্‌টা প্রকৃত বিস্ফোরক আর কোন্‌টা বাজে, কোন্‌টা মিথ্যে ফাঁদ—তৎক্ষণাৎ আলাদা করে বলে দিতে পারে।

যদি প্রকৃত বিস্ফোরকবাহী আই-সি-বি-এম হয়! সে তো ঘণ্টায় দশ বারো হাজার মাইল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়ে আসছে। আমরাই আক্রমণ করব, সেই সময় সমাগত। এই অবস্থা হলে, আরো ছুটি র‍্যাডারকে কার্যকরী করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টি-মিসাইল মিসাইল একটি 'জিউস' আকাশে তুলে দেওয়া হয়। ছুটি র‍্যাডারের একটি আগন্তুক মিসাইলের পথরেখা অনুসরণ অপরটি আমাদের ছেড়ে দেওয়া 'জিউস' মিসাইলের পথ অনুসরণ করে। এই ছুটি অনুসরণকারী র‍্যাডারই একটি কমপিউটারকে সংকেত পাঠাতে থাকে। কমপিউটার 'গতিরোধে'র সমস্যা সঙ্গে সঙ্গে সমাধান তো করে-ই, ঠিক সময়মতো 'জিউস'টিকে ফায়ারও করে। জিউসটির চলার পথ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে কমপিউটার। সারা রাস্তা। জিউস' শিকারের কাছাকাছি পৌছলে কমপিউটারই সংকেত পাঠায়। পাঠিয়ে 'জিউস'কে বিস্ফোরিত করে। আগন্তুক আক্রমণকারী আই-সি-বি-এম এর বিস্ফোরকও আকাশে সশব্দে বিদীর্ণ হয়ে যায়।

সমস্ত কৃতিত্বটুকুই কমপিউটারের। ইলেকট্রনিক ব্রেন-এর প্রোগ্রামের।

সমস্ত ক্রিয়াটুকুই স্বয়ংক্রিয়। মামলা কয়েক সেকেণ্ডের। নিখুঁত। নির্ভুল অনেকগুলি 'জিউস' একই সঙ্গে আকাশে উঠতে বাধা তো নেই-ই, বরং সে-ব্যবস্থাও আছে। তার মানে, এক সঙ্গে একাধিক মিসাইলের আক্রমণ রুখতে পারে একটি র‍্যাডার স্টেশন।

'নাইক জিউস' (Nike Zeus) তিন পর্যায়ের এবং নিরেট জ্বালানীওলা (Solid Propellent) মিসাইল। নিরেট জ্বালানীর রকেট তরল জ্বালানী রকেটের চেয়ে কম পাল্লার হলেও নিরেট জ্বালানীর দাহিকা শক্তি তৎক্ষণাৎ। এ যেন রেডিও-র মেন সেট বনাম ট্রানজিষ্টার। ট্রানজিষ্টার সেট, ভালব গরমের সময়ের তথা বিকিরণের দরুণ দেরীর অপেক্ষা রাখে না। চাবি ঘোরালেই আওয়াজ। সলিড প্রপেল্যাণ্টও তা-ই। বলতে মাত্রই এক পায়ে খাড়া। প্রারম্ভিক সময় বলতে কিছু দরকার হয়না। এভাররেডি।

অন্তর্মহাদেশ মিসাইলের মধ্যে আমেরিকার "মাইনিউট ম্যান" মহাশক্তিশালী। তিন পর্যায়ের, নিরেট জ্বালানীর রকেট। চাঁদে অভিযাত্রী রকেটের মতন। একটি রকেটের জ্বালানী নিঃশেষ হয়ে গেলে তার নাক থেকে আর একটি রকেট বেরিয়ে চালু হয়। পুরোনটি পরিত্যক্ত হয়। ঐ মহাশূন্যেই সমাহিত হয় তার কর্মহীন মরদেহ। দ্বিতীয়টির জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে তৃতীয়টি চালু হয়। দ্বিতীয়টির খালি খোলটির ওজন আর কে বয়? সেটি তখন কাজ ফুরোলে পাজী ইত্যাদি। তাকেও ঐ মহাশূন্যেই ছেড়ে যাওয়া হয়।

"মাইনিউটম্যান" এর পাল্লা ৫৫০০ মাইল। এটির তৃতীয় পর্যায়ের রকেটের গতিবেগ বা ভেলসিটি হয় ঘণ্টায় ১৫০০০ মাইল। জাড্যাবস্থ (Minuteman) পরিচালন প্রণালীর (Inertial guidance system ইনার্শিয়াল গাইডেন্স সিষ্টেম)। নিশানা খুঁজে বের করতে অদ্ভুতভাবে নিখুঁত। পাল্লাটাও তো দেখতে হবে। সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল দূরে, এই পসারিনী মাথার পসরা নামাবে। অতো দূর দৌড়ে গিয়ে নিশানায় নিখুঁত হওয়া সোজা কথা নয়।

এর আগে আমেরিকার আন্তর্মহাদেশ মিসাইল ছিল 'অ্যাটলাস', 'টাইটান'। তার ছিল তরল জ্বালানীর। আকারে তাই ঢাউস।

নিরেট জ্বালানীর (Minuteman) মাইনি উটম্যান আকারে এতো

ছোট. এতো হাল্কা—ট্রাকে, ট্রেনে, এরোপ্লেনে যাতে খুশী নিয়ে যান না। যতোদূর খুশী নিয়ে যান না। মাটির তলার মড়াই থেকে, অস্থায়ী চলমান মঞ্চ থেকে, ফায়ার করুন না। মুহূর্তের মধ্যে ফায়ার করা যায়। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, ফেলে রাখুন না অযত্নে অবহেলায়। ডাক দেওয়া মাত্রই এক পায়ে খাড়া থাকবে এই পুরাতন ভৃত্য। হাল্কা হওয়ার, আকারে ছোট হওয়ার এই সুবিধা যে মাঝে মাঝেই জায়গা বদলে রাখতে পারবেন। শত্রুর সাধ্যও নেই খুঁজে বের করে। কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন আপনি মণি-মাথা ফণীটিকে।

এই তো গেল ডাঙ্গার হিসেব। জলের হিসেব নেওয়া যাক।

জলে আমেরিকার মিসাইল 'পোলারিস'। Polaris Slim জাতীয় (Solid Propellant)। নিরেট পদার্থের জ্বালানীর দুই পর্যায়ের এই মিসাইলটি সাবমেরিন থেকে ফায়ার করা যায়। জলের তলার সাবমেরিন থেকে হোক, ভাসমান সাবমেরিন থেকে হোক, পোলারিসকে ( 'বুস্ট' করে ) ঠেলে তুলে দেয়, হিলিয়াম, নিয়ন, আরগন, ক্রিপটন, জেনন জাতীয় কোন' নিস্ক্রিয় ( ইনার্ট ) গ্যাস। জলের তলা থেকে গ্যাসের সাহায্যে খাড়া উপরে উঠে গেলে, দুটি রকেট মোটরের প্রথমটি চালু হ'য়ে যায়। আর ১২০০ কিম্বা ১৫০০ মাইলের যাত্রা স্নুরু হয়।

একটি প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া খুব স্বাভাবিক। সাবমেরিন থেকে ফায়ার করা হলে জলের তলায় বা জলের উপরে থাকাকালীন সে তো নিজেই চলমান। যার পায়ের তলা থেকে মাটি অনবরত সরে যাচ্ছে, যে নিজেই চলছে, সে নিজেই তো দিগভ্রান্ত। সে অন্যকে দিক দর্শন করবে কি করে। সাবমেরিনের নিজেরই দিশার ঠিক নেই, সে নিজে চলে বেড়াচ্ছে সে অন্যের অর্থাৎ মিসাইলের দিশারী হবে কি করে? স্থানু-স্থাবর নিশ্চল জায়গা থেকে, কোন নিশ্চল ( বা ক্ষেত্র বিশেষে সচল ) লক্ষ্যবস্তুর অবস্থানের স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়। কিন্তু সাবমেরিন নিজেই তো চলছে। মিসাইলকে সে ফুট গজ ইঞ্চি, বা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম,নৈঋত বায়ু ঈশান অগ্নি কোণ ইত্যাদি বাতলে দেবে কি করে?

অনেকে ভাবেন, মিসাইলের মতন সর্বগ, সর্বত্রগামী ও ভয়ংকর, অ্যাটম বোমার মতন সর্বাত্মক মারণাস্ত্রের অবদান যে বিজ্ঞানের, সে বিশিষ্ট জ্ঞান আর

অগ্রসর না-হলেই ভাল। স্তব্ধ হয়ে থাক। আর অনুসন্ধান গবেষণায় কাজ নেই। আর মানুষ মারা কল আবিষ্কার করে কাজ নেই। খুব হয়েছে—

কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনেই কতো জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে যা মঙ্গলকর কাজে লাগানো হচ্ছে। কোনও জিনিসটাই নিছক অনিষ্টকর নয়।

**'সিনস'** (SINS) শিপস ইনার্শিয়াল নেভিগেশান সিষ্টেম-এর আদ্যক্ষর। দুটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক বিন্দুর নিরিখ পাচ্ছি না। অক্ষাংশ নিরক্ষরেখা মধ্যরেখ ইত্যাদির নিরিখ পাচ্ছি না। না-পেয়েও চলন্ত সাবমেরিন এই 'সিনস' এর সাহায্যে প্রতি মুহূর্ত্তের নিজের অবস্থান ক্ষেত্র জেনে, লিপিবদ্ধ করে রাখছে। নিজের অবস্থিতি জানতে পারলে, পোলারিস মিসাইলকে দিক ও দূর বেঁধে পাঠিয়ে দেওয়া শক্ত হবে কেন ?

অদ্ভুত আবিষ্কার এই **সিনস**। এর গোপন কথা, এর ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক ( জিওগ্রাফিকাল কো-অর্ডিনেট ) নির্ণয় করে নেবার প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার রহস্য ঠিক জানা নেই। অনুমান করি, নিজেদের আওতার সমুদ্রজলে বা ভূপৃষ্ঠে রাখা অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের ( ফ্রিকোয়েন্সির ) বেতার তরঙ্গ প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে কাজটা করা সম্ভব। ধরুন ডাঙ্গায় দুটি স্থির বিন্দুতে রাখা রেডিও ট্রানসমিটার থেকে উচ্চ কম্পাঙ্কের বেতার তরঙ্গ পাঠিয়ে। ডাঙ্গায় না হয়ে নিজেদের জলে স্থির বিন্দুর "বয়াও" হতে পারে।

'মাইনিউটম্যান' এর মতন 'পোলারিস'ও প্রাস ( প্রোজেক্টাইল ) এর পথ ধরে চলে। তাই উভয়েই ব্যালিষ্টিক (**Ballistic**)। প্রাচীন কালের যুদ্ধে বিরাট কাষ্ঠদণ্ডের ওপর 'ফিট' করা আড় ধনুক থেকে প্রস্তর খণ্ড ইত্যাদি ছোড়া হতো। এই ধনুকের নাম ছিল ব্যালিস্টা। ব্যালিষ্টিক মিসাইল হলো যন্ত্রের সাহায্যে তুলে দেয়া মিসাইল, যাকে উঠতে সাহায্য করে যন্ত্র, কিন্তু মাটিতে পড়ে যেটা আপনিই। প্রাসের পথ চিরকালই অধিবৃত্তের ( প্যারাবোলা ) আকার। পাথ অব এ প্রোজেক্টাইল ইজ এ প্যারাবোলা।

পোলারিস-এ নাবিক লাগে মাত্র দুজন। পোলারিস কিন্তু মিসাইল বহন করতে পারে ষোলটি পর্যন্ত।

মানুষে মানুষে সম্মুখ সমর তো কবেই গেছে। জাহাজে জাহাজে সম্মুখ সমর অথবা বোমারু জঙ্গী বিমান বনাম শত্রুপক্ষের বিমান বহরের সম্মুখ সমরও ইতিহাসের বিষয়বস্তু। কয়েক বছর পরে হবে গবেষণার বিষয়।

আগামী দিনের যুদ্ধ মিসাইলের। ৭০,০০০ ফুট উপরে আকাশের অন্তরীক্ষে মেঘের অনেক আড়ালে মেঘনাদদের যুদ্ধ হবে। হবে ২০,০০০ ফুট জলের তলায় (পৃথিবীর জলভাগের ৯৮ শতাংশই ২০,০০০ ফুটের গভীরতায় সীমাবদ্ধ)। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ৩৫,৮০০ ফুট বা সাত মাইল গভীর একটি গহ্বর (সমুদ্র কন্দর বলবো কি?) আছে। এটিই বোধ হয় মাটির বুকে গভীরতম ক্ষত। এখানেই ডঃ ডন ওয়াল্‌শ নেমেছিলেন।

সব বড় দেশই বিমান বহরের বোমারু বিমান, জঙ্গী বিমান বদলে প্রায় সবটাই মিসাইল যুদ্ধের উপযোগী করে ঢেলে সাজছেন।

মিসাইল যুদ্ধের কর্ণধার হলো র‍্যাডার। এই র‍্যাডারেরও কিঞ্চিৎ দোষত্রুটি আছে। এক, আকাশে উড়লে বন্ধুদেশের, বা নিজেদের বিমানের সঙ্গে শত্রুবিমানের তফাৎ বুঝবার ব্যবস্থা নেই। দুই, অতি সহজেই শত্রুর দেশ আমাদের র‍্যাডারের পথ রুখে দিতে পারে। বা বাধা সৃষ্টি করতে পারে। বা আমাদের র‍্যাডারকে নিষ্ক্রিয়ও করে ফেলতে পারে। তিন, র‍্যাডার ভূপৃষ্ঠের বঙ্কিমা বা বক্রতা অনুসরণ করতে পারে না। র‍্যাডারের শক্তি (এনার্জি) সিধে রাস্তায় চলে, বেঁকতে জানে না। এইসব ত্রুটির ফলে, অপরিচিত এরোপ্লেন হলেই ভূপাতিত হবার সম্ভাবনা। তাই, এরোপ্লেন বাহিত মানুষ চালক চিরকালই কিছু পরিমাণে থাকবেই। মানুষের বুদ্ধি, বিচার শক্তি, মানুষের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ইলেকট্রনিক 'ব্রেন'-এর কোনদিনই হবে না। রোবট, মানুষের কাজ পুরোপুরি করতে পারবে না কোনদিনই।

শব্দাতিগ বা শব্দোত্তীর্ণ (সুপারসোনিক) আকাশ যানের মধ্যে, চালক চালিত আমেরিকার বোমারু "ভ্যালকাইরি" আন্তর্মহাদেশ অস্ত্রের একটি ভালো উদাহরণ। ৭০,০০০ ফুট, তথা তেরো মাইল ওপর দিয়ে শব্দের তিনগুণ গতিতে এটি যায়। একটি বার মাত্র তেল নিয়ে ৬০০০ মাইল অবধি যেতে পারে। ব-দ্বীপ আকারের পশ্চাদ্ভাগওলা ২০০ ফুট লম্বা এই দৈত্য ৮০ জন সৈন্য নিয়ে পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় ঐ দ্রুততায় পৌঁছে যেতে পারে।

'আকাশ থেকে ভূ/সমুদ্রপৃষ্ঠে তিন রকমের এ-এস-এম মিসাইল হতে পারে।

(ক) নিয়ন্ত্রিত, অভিকর্ষ বোমা (কনট্রোলড গ্র্যাভিটি বম)।

(খ) এঞ্জিনবিহীন বিমান বাহিত বোমা (গ্লাইড বম)।

(গ) নিজের এঞ্জিনওলা মিসাইল (পাওয়ারড মিসাইল)।

এর প্রথম দুটি আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। অতীতের বস্তু। আজকের দিনে অচল।

তৃতীয়টির প্রথমতম এবং আদি পুরুষ বলা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিমান বাহিত জার্মানীর ভি-১ কে। লণ্ডনের ১৫০ মাইল দূরে, বোমারু বিমান থেকে ছাড়া হতো। ১৫০ মাইল অর্থাৎ সে আমলের লণ্ডনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আওতার বাইরে থেকে। এই ১৫০ মাইল পথ ভি-১ রকেট ২০০০ পাউণ্ড বিস্ফোরকের গন্ধমাদন বয়ে নিজের শক্তিতেই যেতে পারত।

আমেরিকার 'স্কাইবোল্ট'-কে এয়ার লন্চড ব্যালিষ্টিক মিসাইল পর্যায়ে ফেলা চলে। আসলে এটিও এ-এস-এম ই। বোমারুটি ১০০০ মাইল দূরে থেকে, মিসাইল ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে, স্বদেশে নিজ নিকেতনে ফিরে যেতে পারে। মিসাইলটি বাকি হাজার মাইল নিজের শক্তিতে উড়ে যায়। গিয়ে নিশানায় নিখুঁত ঝাপ দিতে পারে।

নিকিতা ক্রুশ্চেভ। ১৯৬০ সালের ৯ই জুলাই। কিউবার ব্যাপারে ঘোষণা করেছিলেন—আমেরিকা যদি আরো গোলমাল করে, তারা জেনে রেখে দিক —সোভিয়েট গোলন্দাজেরা তাদের রকেট শক্তি নিয়ে কিউবার জনসাধারণের সাহায্যে এগিয়ে যাবে। সোভিয়েট গোলার পাল্লা ১৩০০০ কিলোমিটার বা ৮১০০ মাইল। এই তথ্যটি আমেরিকানদের জানা না থাকলে, জেনে নিতে পারে।

আর প্রাচীন আমলের মামুলি কামানের পাল্লা—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের, জার্মানীর অতি খ্যাত "প্যারিস গান"। এর গোলা আশী মাইল দূরে যেতে পারত।

'বিগ বার্থা' (**Big Bertha**) কামান তার আকারের দানবত্বের জন্য চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে। কামানের নলটা লম্বায় প্রায় ১১২ ফুট, বেধ-এ সওয়া ৩ ফুট। কামানটার ওজন ২০ হাজার ২৫০ মণ। গোলাগুলোর ওজন ৩ মণের কিছু বেশি। ছুড়তে লাগতো ৪ মণের কিছু বেশি বারুদ। এই বারুদ ৫০০০ আবহ চাপ সৃষ্টি করত। ৫২° কোণে গোলাগুলো ছোড়া হতো। আকাশে বিরাট চাপ-এর (আর্ক) সৃষ্টি করে মাটি থেকে ২৫ মাইল উর্দ্ধে উঠে যেতো। প্যারিস ছিল ৭২ মাইল দূর। পৌঁছতে লাগতো সাড়ে ৩ মিনিট। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মে প্যারিসে ৩০০ গোলা ছাড়া হয়েছিল।

আকাশ থেকে ভূ/সমুদ্র পৃষ্ঠ এ-এস-এম শ্রেণীর মিসাইল খুব ভালো কাজ করে জাহাজ ডোবাতে। সেতু, কোন বড়ো ষ্ট্রাকচার অর্থাৎ ঘর বাড়ি কারখানার

মতো নিশ্চল নিশানায় খুব ফলপ্রসূ এই এ-এস-এম। যে সব নিশানাকে সহজে দূর থেকে বেছে বের করা যায় না, তাদের বিরুদ্ধে খুব ফলপ্রদ নয় এ-এস-এম।

প্রতিরক্ষায় বা বাধাদানের ব্যাপারে বলতে বসে কতো কথাই এসে গেল।

হাজার মাইল স্পীডে বোমারু আসছে। আমাদের জঙ্গী পাঠালাম রুখতে। তারো হাজার মাইল স্পীড। আপেক্ষিক গতিবেগ (ভেলসিটি)—হলো দু হাজার মাইল। এক মাইল আগে জঙ্গী বিমানের পাইলট বোমারুকে দেখতে পেল। তার মানে, দেখতে-না-দেখতে, চোখের পলক না-ফেলতে দু সেকেণ্ডের মধ্যে বোমারু একে পার হয়ে যাবে। আক্রমণের সময় পাবে মাত্র আধ সেকেণ্ড। এ তো গেল মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায়। আর, বোমারুর গতিপথের উল্লম্ব গতিপথে আসছে জঙ্গী বিমান। আগন্তুক জঙ্গী বোমারুকে আক্রমণের চেষ্টা করলে! সে তো পলক নয়, অনুপলের ব্যাপার।

এ ক্ষেত্রে আকাশ থেকে আকাশ এ-এ-এম মিসাইল ছাড়া নাস্তি গতিরন্যথা। ছাড়া হলে নীল আকাশের পটক্ষেপে আঁজি কেটে, এই যন্ত্রদানব প্রতিরোধের নির্ভুল পথে এগিয়ে যাবে। শব্দের কয়েক গুণ স্পীডে হানা দিয়ে শিকারকে অচিরেই কাবু করে ফেলবে।

ভূ/সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আকাশ ধরণের 'স্যাম' মিসাইল শত্রুপক্ষের বোমারু বিমানকে ঘায়েল করতে ব্রহ্মাস্ত্র।

স্যাম এর পাল্লা অনেক বেশী, স্পীড অনেক বেশী। অ্যাণ্টি এয়ার ক্রাফট কামানের চেয়ে স্যাম এর মারাত্মকতা অনেক বেশী। কারণ স্যাম এর বিস্ফোরক, পরিমাণে বেশী, গুণে অনেক গুরুতর। স্যাম-এর আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি আছে। যেগুলি আগন্তুককে অনেক দূর থেকে আবিষ্কার তো করে-ই, ঠিক সময়ে ফায়ারও করে। Ack Ack এক এক ব্যাটারীর গোলা অনেকগুলি তাগ করলে তবে যদি একটা লাগে, স্যাম ছাড়া হয় মোটে একটি। সেই একটিই অমোঘ—

শব্দের আর্ধেক স্পীডে এবং ৪০,০০০ হাজার ফুটের নিচে দিয়ে বোমারু এলে, তবেই কামানের গোলার কথা কোনো রকমে চিন্তা করা যেতে পারে। কিন্তু হাজার হাজার কামানের গোলা খরচা হবে একটি বোমারুকে ঘায়েল করতে।

আমেরিকার স্যাম, 'নাইক অ্যাজাক্স' পঁচিশ মাইল এগিয়ে গিয়ে ৬০,০০০ ফুট উঁচু দিয়ে আসা শব্দাতিগ (সুপারসোনিক) বিমান বা মিসাইলকে ধরাশায়ী করে দিয়ে আসতে পারে। আমেরিকার স্যাম 'নাইক হারকিউলিস'-এর ক্ষমতা

সর্বতোভাবে এর দুগুণ। স্ক্যাম এর মোটর সাধারণত নিকট পাল্লার জন্য, রকেট শ্রেণীর। দূর পাল্লার জন্য র‍্যাম জেট শ্রেণীর মোটরই আদর্শ।

এই র‍্যাম জেট শ্রেণীর 'বোম-আর্ক' দুশো মাইল ধাওয়া করে এগিয়ে যায়। হাওয়াই প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করতে হলে—অনুসন্ধান যন্ত্রপাতির পাল্লা হতে হবে বহুদূর, নিদেন কয়েক শ' মাইল বিস্তীর্ণ। অবশ্য সবটাই হওয়া চাই স্বয়ংক্রিয়।

আক্রমণের দিক থেকে বোমারু বিমান বনাম মিসাইলের তুলনা করলে দেখা যাবে, মিসাইল যে কোন বায়ুভক বা হাওয়া-আশ্রয়ী বিমানকে যে কোন স্পীডে যে কোন উচ্চতায় ঘায়েল করতে পারে। বোমারুর চেয়ে মিসাইলের স্পীড অনেক গুণ বেশী হওয়াতে আক্রান্ত ওয়ার্নিংই পায় না। বোমারুর আর এক বিপদ। একবার রওনা হয়ে পড়লে বোমারুকে বোমাগুলি যেখানে হোক ওগরাতেই ( Jettison করতেই ) হবে। বোবা নিয়ে land করা যায় না। ল্যাণ্ডিং-এর impact বা সংঘর্ষে বোমাগুলি বিস্ফোরিত হবে। বোমারুর আছে চালক, সহকারী ইত্যাদি লোকজন। আছে বোমা, অন্যান্য গুলী গোলা, হাওয়া ভরা কেবিন, নামবার ব্যবস্থার সাজসরঞ্জাম। সবই উড়ে বরবাদ হয়ে যাবে।

অপরপক্ষে মিসাইল এক মুখো যাত্রী। সেটি একবারই ওড়ে। ফেরার প্রশ্ন নেই। তাতে লোকজন লাগে না। খরচের দিক থেকে একটি বোমারুর দামে দশটি মিসাইল তৈরী হতে পারে। সব চেয়ে বড়ো কথা—মিসাইল নিশ্চিত নির্ভুল। অপরপক্ষে বোমারু অনিশ্চিত।

তারও চেয়ে বৃহত্তর বিবেচনা—বোমারুতে অন্তত দুটি অমূল্য মানব প্রাণ বিসর্জিত হবে। মিসাইলে নরবলি নেই।

## মিসাইলের স্পীড

দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ার উপকূলের একটি ঘাঁটি থেকে ৬টি বিস্ফোরকহীন ওআরহেড দিয়ে ২২ মিটার ( ৭০ ফুট ) লম্বা একটি আন্তর্মহাদেশ (ICBM) MX মিসাইল ছাড়া হয়েছিল। সেটি নিখুঁতভাবে তার লক্ষস্থল—প্রশান্ত মহাসাগরের Kwajalein পর্বতমালার নির্দিষ্ট বিন্দুতে আঘাত করে। স্থান দুটির দূরত্ব ৬৫৯৯ কি. মি. তথা ৪১২৫ মাইল। পৌঁছতে সময় লেগেছিল প্রায় ৩০ মিনিট।

অর্থাৎ, এই মিসাইলের কার্যকরী স্পীড
ঘণ্টায় ৮২৫০ মাইল।

## নবম অধ্যায়

# সর্বাধুনিক কিছু মিসাইল, কিছু সমরোপকরণ

ভারতীয় বিমান বাহিনী তাদের **জাগুয়ার জঙ্গী বিমান** বহরকে আধুনিকতম অস্ত্রসজ্জায় ঢেলে সাজাচ্ছেন। জাগুয়ার তৈরি করছে হিন্দুস্থান এরোনটিকস লিমিটেড। জাগুয়ারে থাকবে, টমসন অ্যাগেভ র‍্যাডার। এই র‍্যাডারের সাহায্যে আকাশ থেকে আকাশে এবং আকাশ থেকে সমুদ্রবুকে অর্থাৎ জাহাজে আক্রমণের কার্যক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

জাহাজ আক্রমণের জন্য ফরাসী একসোসেট ( Exocet ) এ-এম ৩৯ অথবা ব্রিটিশ "সী ঈগল" জাতের জাহাজ মারা মিসাইল বসানো হচ্ছে। ব্রিটেন ৪০ খানা জাগুয়ার তৈরি সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। এই জাগুয়ার শ্রেণী হাওয়াই আক্রমণের বর্শা ফলক রচনা করবে।

জাগুয়ার স্কোয়াড্রনের বিমানগুলির স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য আম্বালায় কমপিউটার ও অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক মেরামতি কারখানা খোলা হয়েছে।

ভারতে নির্মিত জাগুয়ারে কী কী থাকছে : নাকের ডগায় থাকছে ফেরান্টি লেসার ( laser ) রেঞ্জার ও পূর্বচিহ্নিত নিশানা সন্ধানী। এঞ্জিন থাকছে অ্যাডুর ( Adour ) টার্বোফ্যান শ্রেণীর। টার্বোফ্যান = টারবাইনে সরাসরি ফিট করা ফ্যান। এই ফ্যান দিয়ে ঠাণ্ডা করা, বায়ু চলাচল এবং দহনে সাহায্য সবই হয়। যে সব জেট এনজিনে টার্বোফ্যান লাগানো থাকে, তারাই সংক্ষেপে টার্বোফ্যান নামে পরিচিত। এতাবৎ কাল ব্রিটিশ এরোস্পেস সরবরাহ করছিল টার্বোফ্যান এনজিন। সেই এনজিনের চেয়ে ৪০% চল্লিশ শতাংশ বেশি থ্রাস্ট যুক্ত এই অ্যাডুর। জাগুয়ারের ডানার ওপরের খুঁটিতে ( pylon ) 'মাটারা ৫৫০ ডগ ফাইট মিসাইল' বসিয়ে পরীক্ষা করে সাফল্য লাভ করা গেছে। ( ডগ ফাইট হল বৈমানিকদের এলোমেলো লড়াই। )

ভারতে নির্মিত জাগুয়ারে আরো কী কী থাকছে : (১) দুই ডানার ওপরের পাইলনে 'মাটারা ৫৫০' আকাশ থেকে আকাশ মিসাইল (২) চারটি মাটারা এফ এল pod ( শুঁটি আধার ) প্রত্যেকটিতে ১৪৪টি করে ৬৮ মিমি ( প্রায় পৌনে তিন ইঞ্চি ব্যাসের ) আকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠ শ্রেণীর অনিয়ন্ত্রিত

(uuguided) রকেট। এদের মধ্যে কতোগুলি থাকছে বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের (runway) কংক্রিট ফেঁড়ে ফেলবার, 'মাটারা ডুরাণ্ডাল' Dibber' নিড়ানি বোমা (৩) 'হান্টিং বি এল ৭৫' পুঞ্জ বোমা (cluster bomb) (৪) দুটি ৩০ মিমি ( প্রায় সওয়া ইঞ্চি ) 'ডেফা' কামান।

সাধারণ বোমা, গোলা বা রকেট ফাটে সংঘাত লেগে। এদের ঝাপটা দালান কোঠা, যুদ্ধযান এবং সেনা ছাউনি ধ্বংস করে। বোমা, গোলা বা রকেটের শক্তি ব্যয় হয়ে যায় জিনিসপত্র টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলতে। প্রাণহানি আনুষঙ্গিক মাত্র।

পুঞ্জ বোমা (cluster bomb) মানুষ মারা বোমা। কঠিন বস্তুর সঙ্গে সংঘাতের প্রয়োজন হয় না পুঞ্জ বোমার। পুঞ্জ বোমা ভূমিষ্ঠ হয় আস্তে। যেন নরমভাবে আলতো করে তোয়ালের ওপর বাচ্চাকে শুইয়ে দেয়া হচ্ছে। ৫০০টি ছোট ছোট বোমা, একটি খোলের মধ্যে থাকে। সেগুলি নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকাটা জুড়ে। একটি পুঞ্জ বোমায় তিন রকমের বোমা থাকে। এক সাঁজোয়া পাত বিদীর্ণ করার, যেগুলি সাঁজোয়া গাড়ির পাত ছিঁড়ে ফেলতে পারে। দুই, নাপাম বা শ্বেত ফসফরাস ধরণের আগুনে বোমা, যেগুলি দিকে দিকে আগুন জালিয়ে দেয়। তিন, খণ্ডীকরণ (fragmentation) বোমা যেগুলি মানুষের মেদ ছিঁড়ে কুটে ফেলে। এবং এই পুড়ে যাওয়া মেদ-মাংসের কোন চিকিৎসা নেই।

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক বোমা, বা গোলা অথবা সাঁজোয়া পাত ছিঁড়ে ফেলার শেল—এগুলি হ'ল সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য বস্তুতে ব্যবহৃত, point weapon। অর্থাৎ নিশানাটি ছোট্ট এলাকার। আর cluster bomb হ'ল area weapon যার এলাকা বিস্তীর্ণ। মোটামুটি অনির্দিষ্ট।

লক্ষ করুন, জাগুয়ারের মিসাইল, নিশানা খুঁজে নেয়। জাগুয়ারের নাকে ফিট করা র‍্যাডার দিয়ে। যেমন, ক্রুজ মিসাইল। যেমন ট্যাঙ্কে ফিট করা ক্রোটেল মিসাইল। এইসব মিসাইলেরই নিজ নিজ র‍্যাডার আছে।

অর্থাৎ মাটিতে রাখা র‍্যাডার নিশানা খুঁজে দেবে—সে যুগ আর নেই। বিমানের নাকের ডগায় বা মিসাইলের মুখেই বসানো আছে র‍্যাডার। লক্ষ্যবস্তু খুঁজে পাওয়া এবং ফায়ার একই সঙ্গে—

ভারত রাশিয়া থেকে সর্বাধুনিক বিমান বহর ও সমরোপকরণ আমদানী

করছে। মিগ বিমান, যুদ্ধজাহাজ, মিসাইল বোট, সাবমেরিন, ট্যাঙ্ক, সৈন্য ও রসদবাহী বিমান এবং মিসাইল।

পাকিস্তান আমদানী করছে মার্কিন এফ ১৬ বিমান। এই এফ ১৬-র সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে পারে রাশিয়ার কাছে এমন বিমান চেয়েছে ভারত। ম্যাকডনেল ডগলাস এফ/এ ১৮ হর্নেট বিমানের মতো। এক আসনের, যমজ এঞ্জিনওলা, ম্যাক সংখ্যা হওয়া চাই অন্তত ২।

এমনি বিমান হল মিগ ২৯। ওড়ার সময় এই একাসনী জঙ্গী বিমানের ওজন থাকবে ১৭০০০ কেজি। এর সমর-সম্ভারের মধ্যে থাকবে ৩০ মিমি (প্রায় সওয়া ইঞ্চি) কামান একটি, আকাশ থেকে আকাশ শ্রেণীর মিসাইল আটটি। এবং দেখতে পাওয়া মাত্র গুলী বর্ষণের অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি র‍্যাডার।

হাল (হিন্দুস্থান এরোনটিকস লিমিটেড) এর নাসিকস্থিত কারখানায় ২০০ খানা মিগ ২৭ 'অ্যাসেমব্‌ল' করা হবে।

মিগ ২৫কে ন্যাটো বলে ফকসব্যাট। লম্বায় ৬৯ ফুট, ৮০ হাজার ফুট পর্যন্ত অনায়াসে উঠে যেতে পারে। ৩৬ হাজার ফুট উঠতে সময় নেয় মাত্র আড়াই মিনিট। সর্বোচ্চ গতিবেগ—ঘণ্টায় ২৯২০ কিমি (১৮১৫ মাইল।)।

হাওয়াই প্রতিরক্ষার জন্য, ভারত পাচ্ছে এক প্রজন্ম অগ্রসর হওয়া ভূ-সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে আকাশ শ্রেণীর মিসাইল।

মিগ ২৩-র অঙ্গ-উপাঙ্গ তো পেয়েই গেছি আমরা। উপাঙ্গ সংযোজনের (অ্যাসেমব্লির) কাজ সুরুও হয়ে গেছে নাসিকে। সৈন্য বা উপকরণ স্থানান্তরের কাজে ৯৫ খানা মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট এআরক্রাফট সরবরাহ করছে রাশিয়া।

টি ৭২ ট্যাঙ্ক এক রেজিমেণ্ট তো পেয়েই গেছি। আর পেয়েছি টি ৭২-র শক্তিশালী এঞ্জিন তৈরির হুকুম। এগুলি তৈরি হবে মাদ্রাজের আবাদীস্থিত কারখানায়।

টি-৭২র চেয়ে শক্তিশালী হ'ল টি-৮০ ট্যাঙ্ক। এগুলি আমরা পাইনি। পাবো ১৯৮৫-র পর।

রাশিয়ার সর্বাধুনিক সাঁজোয়া গাড়ী আই সি ভি (ইনফ্যান্ট্রি কমব্যাট ভীইকল) তৈরি হবে ভারতে। এগুলিতে আছে ট্যাঙ্ক ধ্বংসী মিসাইল। ডেস্ট্রয়ার তো আগেই দিয়েছে রাশিয়া। কাশিম ১১ শ্রেণীর দুটি। আমরা নাম রেখেছি

রাজপুত আর রাণা। এই দুটিকে সাজানো হচ্ছে ভূ-সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূ-সমুদ্রপৃষ্ঠ মিসাইল দিয়ে এবং আরো শক্তিশালী **র‍্যাডার** দিয়ে।

পাকিস্তান পাচ্ছে মার্কিন অস্ত্রসম্ভার।

সর্বপ্রথম ধরা যাক হারপুন মিসাইল। নির্মাতা—ম্যাকডোনাল্ড ডগলাস। একটি হারপুনের দাম দশ লক্ষ ডলার।

অত্যন্ত মারাত্মক অস্ত্র। সম্প্রতি দেওয়া হল/হবে পাকিস্তান এবং ঈজিপ্টকে। এর আগে ন্যাটোর বাইরে পেয়েছে মাত্র ইজরায়েল, সৌদি আরব, জাপান আর দক্ষিণ কোরিয়া।

হারপুনের চেয়ে মারাত্মক মিসাইল নেই। এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূপৃষ্ঠ, এবং আকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠ উভয় শ্রেণীর।

হারপুন যেতে পারে ৯৫ কিলোমিটার। এর অত্যুচ্চ স্পীড এবং সূক্ষ্ম গাইডেন্স সিস্টেম—হারপুনকে দ্রুত ধাবমান ও দিক পরিবর্তনকারী নিশানাকে খুঁজে বের করে। নিশানায় জমে যাওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা আছে হারপুনের।

হারপুন ছোড়া যায় সাবমেরিন থেকেও। হারপুন জাহাজ মারতে অতুলনীয়।

হারপুন বসানো যায় জাহাজে, হাইড্রোফয়েলে, মিসাইল বোটে, সাবমেরিনে। এমন কি এ-৬ বা এফ-৪ ফ্যানটম বিমানের এবং পি-৩ ওরিয়ন বিমানের ডানার তলায়। পাকিস্তান নৌবাহিনীর অগাস্টা ও ডাফনে শ্রেণীর সাবমেরিনে এবং গিয়ারিং ডেস্ট্রয়ারেও বসানো হবে / হচ্ছে।

এর গাইডেন্স সিস্টেম কী, তা বলা হয় নি। বীম রাইডার নিশ্চয়ই। তবে সেটা র‍্যাডার কি ইনফ্রারেড কিম্বা লেসার—এই তিনটের একটা হতেই হবে।

( হাইড্রোফয়েল এক রকমের দ্রুতগামী মোটর বোট। যার পেটের তলায় দুদিকে দুটি, মাথা উঁচু করা ঢালু লোহার পাত থাকে। স্পীড বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মোটর বোটটি জল থেকে উঁচু হয়ে আলগা হয়ে যায়। শুধু ঐ পাতের ওপর ভাসতে ভাসতে চলে।)

পাকিস্তান স্প্যারো মিসাইল কিনছে।

স্প্যারো হল সর্বাধুনিক আকাশ থেকে আকাশ মিসাইল। এবং মাঝারি পাল্লার। মার্কিন থেকে কেনা এফ.৬ জঙ্গী বিমানে এবং মিরাজেও বসানো হবে।

দৃষ্টি গোচরতার বাইরে ৩০ কিলোমিটার দূর থেকে স্প্যারো লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুল আঘাত হানতে পারে।

ইজরায়েলীরা ১৯৮২ সালের জুন মাসে সিরীয় যুদ্ধে বেকা উপত্যকায় এই এ-এ-এম ৭ বা স্প্যারো মিসাইল দিয়ে ৮৯ খানা সিরীয় বিমান ভূপাতিত করেছিল।

পাকিস্তান মার্কিন থেকে ম্যাভেরিক মিসাইল কেনার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ম্যাভেরিক আকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠ শ্রেণীর মিসাইল। এ-এস-এম।

হারপুন এবং ম্যাভেরিক এই দুরকমের মিসাইলে সমৃদ্ধ পাকিস্তান আকাশে এবং সমুদ্রে প্রচুরতর ক্ষমতাসম্পন্ন হবে।

ম্যাভেরিক গোষ্ঠীতে অনেক কিসিমের মিসাইল। এ-এস-এম।

ম্যাভেরিক ছাড়া হয় মাঝারি পাল্লার আক্রমণকারী বিমান থেকে। ম্যাভেরিকের বাহাদুরি হ'ল, কঠিন লক্ষ্যবস্তু ভেদে। কংক্রিটের প্রাকার, গুমটি, বাঙ্কার, সাঁজোয়া যান, জাহাজ। এবং সবচেয়ে যেটা মারাত্মক—র‍্যাডার বা মিসাইল ছাড়ার ঘাঁটি নষ্ট করা।

ম্যাভেরিকের গাইডেন্স সিস্টেম—অবলোহিত রশ্মি, ইনফ্রারেড।

র‍্যাডার সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান না থাকলে মিসাইলের নাকের ডগায় র‍্যাডার ফিট করার সার্থকতা বোঝা যাবে না। ক্রুজ মিসাইলের নাকেও র‍্যাডার অল্টিমিটার অ্যানটেনা লাগানো হচ্ছে।

র‍্যাডার **RADAR** = রেডিও ডিটেকশান অ্যাণ্ড রেনজিং এর আগুক্ষর।

মনে রাখতে হবে, দিগন্তব্যাপী আকাশে এক ফোঁটা বৃষ্টির বিন্দুকে খুঁজে বের করতে পারে র‍্যাডার। এক ফোঁটা বৃষ্টির আয়তন—ব্যাসে এক সেন্টিমিটারের দশমাংশ।

আলোর তরঙ্গ দৃশ্য। দেখা যায়। রেডিও তরঙ্গ অদৃশ্য। চোখে দেখা যায় না। আলোর গতি ও বিদ্যুৎ তরঙ্গের গতিবেগ কিন্তু একই। সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ (এক লক্ষ ৮৬ হাজার) মাইল। সেকেণ্ডে ৩×১০$^{৮}$ মিটার—৩০০০০০০০০ মিটার।

এই দ্রুতগতি রেডিও তরঙ্গ আকাশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চারটি দিক চারটি বিদিক এবং উর্দ্ধ—এই ন'টি দিক আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়ায় এই তরঙ্গ। কোথাও বাধা পেলে, প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে র‍্যাডার যন্ত্রে।

র‍্যাডার যন্ত্রে মূলতঃ কী কী থাকে। এক অ্যানটেনা বা এরিয়েল অর্থাৎ

আকাশ তার। এই অ্যানটেনা দিয়েই দূর দূর দিগন্তে রেডিও তরঙ্গ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দুই, ট্রান্সমিটার। অত্যন্ত শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র। এইটিই র‍্যাডারের প্রাণ। এই প্রেরকের শক্তি এতো বিপুল হতে পারে যে স্বল্প ক্ষণের জন্য ছোটখাটো একটি নগরকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। তিন, রিসিভার। প্রেরিত বেতার তরঙ্গ কোথাও প্রতিহত হলে, সেটি ফিরে আসে র‍্যাডার সেট-এ। প্রতিফলিত স্পন্দন ফিরে এসে ধরা পড়ে এই রিসিভারে। রিসিভার সেটি পাঠিয়ে দেয় 'স্কোপ'-এ। চার, স্কোপ। স্কোপ-এর ঘষা কাচে সেটি প্রতিবিম্বিত হতে থাকবে। এবং স্কোপ-এর গ্রাফ পেপারে সেটি চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে থাকবে।

ট্রান্সমিটারে একটি স্পন্দন ( pulse ) সৃষ্টি হয়। ইলেকট্রনিক স্যুইচের মধ্যে দিয়ে সেটি যায় অ্যানটেনায়। অ্যানটেনা সেই স্পন্দনটি ছুড়ে দ্যায় আকাশে। আকাশে কোথাও বাধা পেলে সেখানে সেটি প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে র‍্যাডারের গ্রাহক যন্ত্র বা রিসিভারে। ইলেকট্রনিক স্যুইচটি একটি মাত্র স্পন্দন, ট্রান্সমিটার থেকে অ্যানটেনায় পৌঁছে দ্যায়। দেবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সমিটারের দরজা বন্ধ ক'রে রিসিভারে পৌঁছবার রাস্তা খুলে রেখে দ্যায়। প্রতিফলিত স্পন্দনটি এতো ক্ষীণ যে, সেটিকে প্রবর্ধন না-করলে তাকে টের পাওয়া সম্ভব নয়। আরো একটি কারণে, ট্রান্সমিটার থেকে স্পন্দনটি অ্যানটেনায় পৌঁছবার সময়, ইলেকট্রনিক স্যুইচটির, রিসিভারের দিকটা বন্ধ রাখা প্রয়োজন। ট্রান্সমিটার সঞ্জাত শক্তি অত্যন্ত প্রবল। রিসিভারে প্রাপ্ত প্রতিহত স্পন্দনটি অতিমাত্রায় দুর্বল। স্পন্দনটি আকাশে পাঠাবার সময় রিসিভারের দিকটা খোলা থাকলে ট্রান্সমিটারের প্রবল শক্তিতে রিসিভারটি পুড়ে যাবে। প্রতিফলিত স্পন্দনটি রিসিভারে প্রবর্ধিত বা অ্যামপ্লিফায়েড হয়ে স্কোপ-এ চলে যায়। প্রাপ্ত ছবিটির প্রতিবিম্ব একটি পর্দায় পড়ে এবং ঐ ছায়াটিই কাগজেও বিধৃত হয়ে থাকে।

প্রথম স্পন্দনটি প্রত্যাহত হয়ে ইলেকট্রনিক স্যুইচের মাধ্যমে রিসিভারে ফিরে গেলে ট্রান্সমিটার দ্বিতীয় স্পন্দন আকাশে উৎসারিত করে দ্যায়।

২০ মাইল দূরের লক্ষ্য বস্তুতে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে সময় লাগে কতোটুকু ? আসা ও যাওয়া মিলে মাত্র ২১৫ মাইক্রো সেকেণ্ড।

স্কোপ সাধারণতঃ তিন রকমের। এক 'এ' স্কোপ। দুই, পি পি আই—

প্ল্যান পোজিশান ইণ্ডিকেটার। তিন, আর এইচ আই—রেঞ্জ হাইট ইণ্ডিকেটার।

যে সব র‍্যাডার স্কোপ সাক্ষী রাখে তার মধ্যে সব চেয়ে সহজ 'এ' স্কোপ। 'এ' স্কোপে পাওয়া যায় শুধু দূরত্ব। টেলিভিশানের ছবির টিউবের মতনই ব্যাপারটা প্রায়। টি ভি টিউবে ঘন সন্নিহিত অসংখ্য অনুভূম রেখায় চিত্রটি ফুটে ওঠে। এখানে একটি মাত্র অনুভূম রেখা প্রেরিত স্পন্দনের ও ফিরে আসা স্পন্দনের ( রিসিভারের দৌলতে বহুগুণে বর্ধিত ) সঙ্গে যোগাযোগে কাজ করে। এরোপ্লেনে ব্যাহত হয়ে সিগনালটি ফিরে এলে স্কোপের টিউবের স্বাভাবিক অনুভূমিক গতিতে একটি আলোড়ন জাগে। সেই আলোড়ন খাড়াইর দিকে প্রতিসরণ বা বিক্ষেপ ঘটায়।

'এ' স্কোপে দূরত্ব আঁকা স্কেল আছে।

পি-পি-আইতে দূরত্ব ও দৃষ্টিকোণ দুইই আছে।

আর-এইচ-আইতে দূরত্ব এবং উচ্চতার স্কেল আঁকা থাকে।

প্রয়োজন ভেদে অ্যানটেনার চেহারা আলাদা রকমের হয়। কোনটি বর্তুলের অংশ আকার, কোনটি কলার খোলার মতো দেখতে। প্রত্যেকটিই অবতল বা কনকেভ। পালিশ করা উজ্জ্বল ধাতুর পাতে তৈরি।

কলার খোলার মতো দেখতে অ্যানটেনাকে খাড়াভাবে রাখলে, রশ্মি খাড়াই দিকে লম্বা আর পাশের দিকে ছোট হবে।

প্রতিফলিত হয়ে যে সিগন্যালটুকু র‍্যাডারে ফিরে আসে তার যৎসামান্যতা ভাবলে অবাক লাগে। $\frac{১}{\text{চৌদ্দটা শূন্য ৮}}$। এইটুকুকেই প্রবর্ধিত করার ক্ষমতা রাখে রিসিভার!

সব জাহাজে, উড়োজাহাজে নিজস্ব র‍্যাডার থাকে। যুদ্ধের প্রয়োজনে নাই হোক, ঝড় ঝঞ্ঝার পূর্বাভাসও তো পেতে হবে তাদের।

অ্যানটেনা যতো বৃহৎ, রশ্মি ততো জোরালো—তীক্ষ্ণ হবে পেন্সিলের মতো এবং হবে একাগ্র।

এরোপ্লেনের র‍্যাডার সেট-এর অ্যানটেনা সাধারণতঃ ফুট তিনেকের চেয়ে বড়ো হয় না।

মাটিতে রাখা বা এরোপ্লেনের অ্যানটেনাকে ঝড় ঝঞ্ঝার হাত থেকে বাঁচাতে র‍্যাডোম নামক টি কোজি ( tea cozy ) জাতীয় ঢাকা দিয়ে রাখা হয়। বলা

বাহুল্য, এই ঢাকা বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গের যাতায়াতের কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারে না।

ত্রিশ চল্লিশ মাইল সামনে একটি উত্তাল ঝড় আসন্ন। এরোপ্লেনকে যেতে হবে সেই এলাকা দিয়ে। এইসব ক্ষেত্রে এরোপ্লেনের অ্যানটেনাকে একবার খাড়াভাবে একবার অনুভূমিক চালাতে হয়। তা হলেই মাটি থেকে ঝড়ের উচ্চতা এবং এরোপ্লেন থেকে ঝড়ের দূরত্ব জানা যাবে।

আজ ইলেকট্রনিকসের যুগে অতো ঢাউস অ্যানটেনার দরকার নেই, পি-পি-আই পেতে দরকার নেই উল্লম্ব দণ্ড-কে কেন্দ্র করে অ্যানটেনাকে মসৃণ ভাবে ঘোরাবার।

র‍্যাডার আজ ছোট্ট একটুখানি পদার্থ, মিসাইলের নাকের ডগায় অনায়াস আসন তার।

মিসাইল আজ রশ্মি বাহন। বীম রাইডার। সে রশ্মি র‍্যাডারের হোক, অবলোহিতই হোক বা লেসারেরই হোক।

র‍্যাডার একটি ক্ষেত্রে আগন্তুক এরোপ্লেনের ট্রেসপাস বা অনধিকার প্রবেশের আগাম খবর দিতে পারে না। এই বেলায় সে দৃষ্টিহীন অন্ধ। সেটি হল—

প্লেন যদি ট্রি-টপ লেভেল বা বৃক্ষশীর্ষ উচ্চতায় আসে। বৃক্ষ শীর্ষ উচ্চতা বলতে তাল নারকেলের মাথার ৩০/৩৫ মিটার উঁচু পর্যন্ত। (বর্তমান লেখকের এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়লে হৃৎকম্প আজও থামতে চায় না। সাইরেন হয়েছে, অল ক্লিয়ার হয়ে গেছে। কারখানার বিভিন্ন শপ ঘুরে ঘুরে 'পাওয়ার অন' করে বেড়াচ্ছি, শ্রমিক ভাইদের কাজ শুরু করতে অনুরোধ করে বেড়াচ্ছি। একটি শপ-এ ঢুকতে যাবো, হঠাৎ মাথার ওপর ছাই রঙের খোলা তলোয়ার। পূর্ব পাকিস্তানের 'সেব্‌র্' জেট। আওয়াজ পাইনি। এসেছে চিমনির মাথা প্রায় ছুঁয়ে। আওয়াজ পাবো কী করে। 'সেব্‌র্' সুপারসোনিক জেট। শব্দাতিগ বিমান। ম্যাক সংখ্যা ১·৫ এর কাছাকাছি।)

মাটিতে রাখা র‍্যাডার-এর নজর উঁচু। সম্ভবতঃ, ২৫০/৩০০ ফুটের নিচে তার নজর যায় না। এই লেভেলের নিচু দিয়ে সুপারসোনিক প্লেন এলে, র‍্যাডারে ধরা পড়বে না, প্লেনের আওয়াজ পাবার অনেক আগেই মাথার ওপর প্লেন এসে গেছে।

ট্রি টপ লেভেল বিমান আক্রমণের বিষয়ে বলতে গেলে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা এসে পড়ে।

## বোমা-শেল-রকেট-মিসাইল

একই ওজনের রকেট বা মিসাইলের চেয়ে, বোমার বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা অনেক বেশি, সন্দেহের অবকাশ নেই। ৮০-র দশকে বোমার উপকারিতা ( না অপকারিতা ? ) নিঃসন্দেহে প্রমাণিত।

রকেট ছোড়া হয় দূর থেকে। তাকে ছুড়তে জ্বালানী লাগে প্রচুর। সেই জ্বালানীর ওজন বাদ দিলে রকেটে বিস্ফোরকের পরিমাণ যায় ক'মে!

মিসাইলে তো আরও। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পথ প্রদর্শক বা নিয়ামক ব্যবস্থা—গাইডেন্স সিস্টেমের সরঞ্জামই তো মিসাইলের ওজন খেয়ে নেয়। ফলে, মিসাইল, বিস্ফোরক বইতে পারে কতোটুকু ?

আক্রমণোদ্যত বিমান লক্ষ্যস্থলের খুব কাছাকাছি আসার আগেই ধরা পড়ে যায়। ধরা পড়ে যায় র‍্যাডারে।

গত দুই দশকে, মিসাইলের উন্নতি হয়েছে অবিশ্বাস্য পরিমাণে। বিমান মারা কামান ( অ্যাক অ্যাক গান ) বা রকেটের নাগালের বাইরে থেকে মিসাইল ছাড়া যায়।

তারও প্রতিষেধক আবিষ্কৃত ও চালু হয়েছে। ইলেকট্রনিক দিয়ে এমন কৌশল তৈরী হয়েছে যা দিয়ে আগন্তুক মিসাইল বা অন্য ধ্বংসাস্ত্রের গতিমুখ বদলে দিতে পারা যায়।

তারও আবার প্রতিব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে যা দিয়ে ধোঁকা দেওয়া যায়। ধোঁকার টাটি সৃষ্টি করা যায় এবং আগমনশীল অস্ত্রের আবিষ্কার বিলম্বিত করা যায়। আমার পাঠানো অস্ত্র আক্রান্ত হলে, আমার অস্ত্র আবিষ্কার করতে দেরী করিয়ে দেবো।

৭০-এর দশকে এমন সব শব্দাতিগ বিমান তৈরী হয়েছে যারা অনেক নিচু দিয়ে আসতে পারে। আসতে পারে অনেক দূর থেকেই। এবং র‍্যাডারে ধরা না প'ড়ে। এই সমস্ত বিমান থেকে বোমা বর্ষণে অনেক ভালো ফল পাওয়া যায়। অনেক দূর থেকে ছাড়া মিসাইলেরা,—ফায়ার করে ভুলে যাও—মা ফলেষু জাতের।

র‍্যাডার লেভেলের নিচে দিয়ে আক্রমণ করা, আক্রমণকারীর পক্ষে অনেক নিরাপদ। র‍্যাডারের আওতার বাইরে ব'লে তারা শত্রুর নজরে পড়তে দেরি হয়। শত্রু পক্ষ তাদের দেখে ফেলার অনেক আগেই তারা কম্ম সেরে পালিয়ে যেতে পারে।

প্রত্যেক কাজেরই সুবিধা অসুবিধা দুইই থাকে।

র‍্যাডার লেভেলের নিচে দিয়ে এলে ধরা পড়ার আশঙ্কা নেই-ই বলা চলে। কিন্তু এই আনত আক্রমণে ফল পাওয়া যায় কতোটুকু! নিচু এলাকা দিয়ে প্লেন এতো দ্রুত বেরিয়ে যায়, পাইলটের পক্ষে লক্ষ্যস্থল খুঁজে বের করবার অবকাশ থাকে না।

এই অসুবিধার প্রতিকার হ'ল পুঞ্জবোমা (cluster bomb)। পুঞ্জবোমা নিঃশব্দে পড়ে। প'ড়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। মসৃণ কোনো সমতলে কয়েক ফোঁটা তেল—ধরুন পেট্রলের মতন। পুঞ্জবোমা হল এরিয়া (area) উইপন। এর ধ্বংসকার্য দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে যায়। এর ধ্বংসকার্য অত্যন্ত ব্যাপক।

এই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে আক্রমণকারী বিমানের ক্ষতি না হয়। অর্থাৎ প্লেন তো র‍্যাডার লেভেলের নিচু দিয়ে এসেছে, পুঞ্জবোমা ফেটেছে মাটিতে। চোখের পলক ফেলার আগে ছড়িয়ে পড়েছে বহু বহু দূর। এতো দূর যে, সেই এলাকা পার হয়নি তখনও প্লেন। পুঞ্জবোমার অগ্নিকাণ্ড বা মাটি থেকে ছিটকে ওঠা বোমার কুচি, আক্রমণকারী প্লেনকেই আচ্ছন্ন করে না ফ্যালে।

এর ওষুধ হল ব্রিটিশ বম রিটারডিং সিস্টেম। পুঞ্জবোমার ভূমিষ্ঠ হবার ক্রিয়াকে বিলম্বিত করা। যাতে আক্রমণকারী প্লেন পালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সময় পায়।

রেগান বলছেন—প্রতিরক্ষা হিসেবে আমার মিসাইল মারার ব্যবস্থা ভূপ্রদক্ষিণ করতে থাকবে।

রেগান বলছেন—আমার কৃত্রিম উপগ্রহে, আমি লেসার কামান স্থাপনা করবো।

রাশিয়া বলছে—আমরাও নিশ্চয় পড়ে পড়ে মার খাবো না। কোনো দেশই এক তরফা মার খায় না। আমরাও ল'ড়ে যাবো। বোঝা যাচ্ছে রেগান "স্টার ওআর" চায়। অস্ত্রের ঝনঝনা নিয়ে যেতে চায় মহাকাশে। আমরা তৈরি—

রাশিয়া বলছে—ন্যাটো যদি "পারশিং ২" আর ক্রুজ মিসাইলের ঘাঁটি পশ্চিম ইওরোপে স্থাপনা ক'রে আমার দেশে ১০ মিনিটে পৌছবার ব্যবস্থা করে—আমাদেরও আছে এস এস ২০। এক্ষুণি অবশ্য এস-এস-২০র আমার দেশ

থেকে ইউ-এস-এ পৌঁছতে ১৬ মিনিট লাগবে। তা, সেটাকে ১৬ মিনিট থেকে কমিয়ে ১০ মিনিটে আনার ব্যবস্থাও প্রায় সম্পূর্ণ। আমার এস-এস-২০ মাঝারি পাল্লার রকেট নয়, দূর পাল্লারই।

রেগান বলছেন—মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ মারার মিসাইল বানিয়ে ফেলেছি। সময়মতো স্যাটেলাইট ধ্বংসের কাজে হাত দেবো।

মহাকাশে আইনী কৃত্রিম-উপগ্রহ—৯০টি। বেআইনী চোরাগোপ্তা আরও আন্দাজ ১৯১০টি। এই স্যাটেলাইট পৃথিবী পরিক্রমা করতে করতে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার ছবি তুলে চলেছে। তিনটি ক্যামেরা। একটি দিনের আলোয় ছবি তোলার, একটি মাইক্রোওয়েভ, তৃতীয়টি রাত্রে ছবি তোলার জন্য ইনফ্রারেড।

এই গুপ্ত স্যাটেলাইটের দুই তৃতীয়াংশ রাশিয়ার, এক তৃতীয়াংশ আমেরিকার। এদের আয়ু—কারো কয়েকদিন, কারো কয়েক মাস, কারো কয়েক বছর। তেমন ভালো ক'রে তৈরি করলে, স্যাটেলাইট ১০০০ বছরও থাকতে পারে মহাকাশে।

ওই ক্যামেরা অত্যন্ত সংবেদনশীল **sensitive**। ১৫০ কিলোমিটার ওপর থেকে তার শ্যেন চক্ষু খবরের কাগজের ওপর রাখা একটি সিগারেটের প্যাকেট অবধি দেখতে পায়। ময়দানের আমসভায় একটি শ্রোতার জ্বর আসছে—তাও টের পায় স্যাটেলাইট। বিকিরণ-গত যে-কোন পরিবর্তনই স্যাটেলাইট বুঝতে পারে—তা সে-বিকিরণ তাপীয়ই হোক বা আলোরই হোক। স্যাটেলাইটের ক্যামেরা ২০ ফুট বালির স্তরের তলায় মরানদীর ছবি তুলেছে। সাধারণ স্যাটেলাইটের ক্যামেরার **frame** ভূ-পৃষ্ঠের ২০ কিলোমিটার বাই ৫ কিলোমিটার জায়গার ছবি তুলতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষ ভূপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটার বাই ৭ কিলোমিটার ছবি তোলাও সম্ভব। প্রতি এক্সপোজার এ ৭০০ বর্গকিলোমিটার এলাকার।

মোটের পর আকাশের এই গুপ্তচরদের কাজই ছবি তোলা এবং দেশে পাচার করা। **Reconnoitering**। যদিও মুখে বলেন—আবহাওয়ার খবর নিচ্ছি। অরণ্যসম্পদ জরীপ করছি। কোন মাটির তলায় তেল আছে খুঁজে দেখছি। রেগান সাহেব দেখছেন—তার যা স্যাটেলাইট আছে, রাশিয়ার আছে, তার দ্বিগুণ। ৭০০ বর্গ কিলোমিটারের টুকরো টুকরো ছবি **piece out** করে গোটা ইউ এস এর সদর-অন্দর গুপ্ত-প্রকাশ্য সব ছবিই ইউ. এস. এস. আর-এর পকেটে।

যে কোন এলাকার ছবি কমপিউটারের ভাষায় অনুবাদ করে একটি আন্তর্মহাদেশ ব্যালিষ্টিক মিসাইলের **brain** এ পুরে দিলেই হল।

স্যাটেলাইটের ওপর রেগান্ সাহেবের তাই এতো রাগ।

ক্যালিফর্ণিয়ার এডওয়ার্ডস এআর ফোর্স বেস থেকে উড়ে আমেরিকার এফ ১৫ জঙ্গী বিমান স্যাটেলাইট ধ্বংসের পরীক্ষা সম্পূর্ণ করে এসেছে।

আগামী দিনের সম্মুখ সমর পুরাকালের সম্মুখ সমরের মতো মোটেই নয়। কোনো অঞ্চল বা কোনো শহর বা সৈন্য ছাউনি দখল নেবার সময় শত্রু-সৈন্যের মুখোমুখি পড়ে যেতে হতে পারে। ইনডিভিডুয়াল একজনকে বা ছোট্ট দলকে বশে আনতে তখন পিস্তল নয়, তলোয়ার নয়, রাইফল মেশিনগান কিছুই নয়—আমেরিকা ব্যবহার করবে **c-claw** 'সি'-'ক্ল' অথবা লেসার গান। (তবে, রেগান সাহেব অতো অমানুষ নন)। এই 'সি' 'ক্ল' প্রাণে মারবে না। চোখ দুটি কানা করে দেবে লেসার দিয়ে।

## পরিশিষ্ট ১

এতো কথা আলোচনার পরও আমার নিজের মনেই কিছু প্রশ্ন কিছু জিজ্ঞাসা জমা হয়েছে যার বিশদকরণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিষয়টিকে প্রাঞ্জলতা দেবার চেষ্টাতেই এই অতিকথন। এই সুযোগে, কুতূহলীর কাছে কিছু তালিকাও পেশ করলাম।

**রকেটের** বহুমুখী ব্যবহার—(১) মিসাইল উৎক্ষেপণ (২) এরোপ্লেন চালানো (৩) মহাকাশযান চালানো / ভূমিত্যাগে সাহায্য করা (৪) সাবমেরিন / টর্পেডো চালানো (৫) যুদ্ধের ট্যাঙ্ককে খাত / পরিখা পার করিয়ে দেওয়া (৬) এমন কি প্রস্তরীভূত কঠিন সমতলে, থাম পোঁতার জন্য গর্ত তৈরী করা ইত্যাদি। সমস্ত প্রত্যঙ্গ সমেত জার্মানীর ভি-২ ( নামান্তরে এ-৪ ) এর রকেট মোটরের ওজন মাত্র ১ টনের মতো হলেও চরমতম দ্রুতিতে ( speed ) ৬০০,০০০ ঘাত অশ্বশক্তি উৎপাদন করত। ( জেট এরোপ্লেন, রকেট ইত্যাদির বেলায় **thrust horse power** = ঘাত অশ্বশক্তি বলা হয় )। প্রফেসর ওয়ার্নহার ফন ব্রাউন ভি ২ ( বা, এ-৪ ) এর জনক। এ-৪ এর ভিতরকার যান্ত্রিক জটিলতার ছবি দেওয়া হলো।

ভি ২ গাইডেড না হলেও প্রথম সার্থক মিসাইল। এবং নিঃসন্দেহে মিসাইলদের আদি পুরুষদের অন্যতম।

রকেটও একরকমের জেট এনজিনই। জেট এর সূচীছিদ্র দিয়ে নিষ্ক্রমণরত এগজস্ট গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় চলা-ই রকেটেরও পাথেয়। জেট এনজিনের প্রকার ভেদ ছবিতে দেখানো হ'লো। জেট এনজিনের মধ্যে সবচেয়ে চলতি হ'ল টার্বো জেট। এতে, যন্ত্র চালিত কমপ্রেসার, আবহাওয়ার বাতাসকে টেনে এনে সংনমন ( কমপ্রেস ) করে নেয়। বাইরে থেকে আনা এই বাতাসের একাংশে জ্বালানী জ্বালানো হয়। পরিণতিতে যে দুরন্ত তাপ জন্মায়, সেই তাপ বাদ বাকি ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। এই সবটা ব্যবহার করে একটি টারবাইন চালানো হয়। এই টারবাইনই কিন্তু পূর্বোক্ত কমপ্রেসারকে চালায়। উচ্চ চাপের গরম এগজস্ট গ্যাস ঐ ঘাত **thrust** সৃষ্টি করার ফলে টার্বো জেটের ঐ গতিবেগ প্রাপ্তি।

র‍্যাম জেট কিন্তু অনেক সরল। এগোবার ফলে হাওয়াটা সংনমিত (কমপ্রেসড) হয় ফলে র‍্যামিং বা দুরমুশ ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, র‍্যাম জেট সেই র‍্যামিং ব্যাপারটাকে কাজে লাগায়। স্বভাবতঃ সেইজন্যেই এতে কমপ্রেসার বা টারবাইনের প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু অতি মাত্রায় বেশী স্পীড ছাড়া র‍্যাম জেট তা-ই কাজও করবে না।

পালস জেট ঐ মূলনীতিতেই চলে। একে কম স্পীডেও কাজ করানোর ব্যবস্থা আছে। মূল নালী ( duct ) বা প্যাসেজের মধ্যে জ্বালানী এবং হাওয়ার মিশ্রণের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই বিস্ফোরণের ফলে ডগার মুখের দিককার কতোগুলি কবাটিকা ( ভাল্‌ভ ) বন্ধ হয়ে যায়, ফলে একমাত্র পিছনদিকে ছাড়া, গ্যাসের বের হওয়ার আর পথ থাকে না। ঘাত ( thrust ) সৃষ্টির এইটাই মূলনীতি। নালীটি এমন ভাবেই ঘোরানো যে বিস্ফোরণের ঢেউ নির্গমন পথে পেঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই তনুকরণ ( rarefaction ) এর নতুন ঢেউ, ডগার দিককার কবাটিকা ( valve ) গুলি খুলে দেয়। নতুন হাওয়া ঢুকে পড়ে সামনের দরজা দিয়ে এবং আবার তাতে জ্বালানী বিস্ফোরণ করা হয়। ক্রিয়াচক্র এই ভাবেই পুনরাবৃত্ত হয়।

এরপর রকেট। আগেকার তিন রকমের সঙ্গে রকেটের মৌলিক পার্থক্য সহজেই ধরা যায়। টার্বো জেট, র‍্যাম জেট, পালস জেট বাইরের আবহাওয়ার হাওয়াকে ব্যবহার করে। রকেট কিন্তু তা নয়। সে জ্বালানী ও অক্সিজেন দুই-ই বয়ে নিয়ে চলে এবং বাইরের হাওয়ার ধার ধারে না। (ক) নিরেট উৎক্ষেপক (solid propellant) এর রকেট-এ, দহন প্রকোষ্ঠ (combustion chamber) এর মধ্যেই উৎক্ষেপকটি থাকে। (খ) তরল বলেই উৎক্ষেপকটি দহনপ্রকোষ্ঠে নিরবচ্ছিন্ন অন্তঃক্ষেপ ( inject ) করে যায়, ছেদ পড়ে না। তরল উৎক্ষেপকের এনজিনের এইটেই সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা।

রকেটের সবচেয়ে বড়ো সুবিধেই তো এই—(ক) সম্পূর্ণ স্বনির্ভর, কারো কাছে কিছুর জন্যে হাত পাততে হয় না (খ) অগ্রগামী স্পীডের ওপর ঘাত ( thrust ) নির্ভর করে না (গ) সব সময় সব উচ্চতা altitude-এ, এমন কি সম্পূর্ণ বায়ুশূন্যতায়, পুরো ঘাত তৈরী করে এগোতে পারে। রকেট এনজিনের অসুবিধের মধ্যে পয়লা নম্বর হচ্ছে খোরাক এর রাক্ষুসে। অসম্ভব ( প্রপেল্যাণ্ট ) উৎক্ষেপক খরচ হয়। দু নম্বর অসুবিধে, কোন-না-কোনো আকারে অক্সিজেন বয়ে নিয়ে

যেতে হয়। সেটাই তো এর বিরাট অস্থবিধা। ম্যাক সংখ্যা ১ ( **Mach Number** )-এ হিসেবে ধরা যাক। প্রতি ঘণ্টায় প্রতি পাউণ্ড থ্রাস্ট-এ, খরচ পড়বে টারবো জেট-এ যদি ১'৫ পাউণ্ড, র‍্যাম জেট—৪'০ পাউণ্ড, রকেট—১৫ পাউণ্ড। ( তুলনামূলক এই তালিকাটি অনেক পুরনো )। রকেট এনজিনের জ্বালানী ও অক্সিজেন তার মানে প্রপেলেণ্টের খরচ একদিন হয়তো কমানো যাবে, তাই বলে টার্বো জেট কোনোদিনই রকেটের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবে না। অল্প ওজনে বা সীমিত স্থমুখ-আয়তনের সঙ্গে যেখানে প্রচণ্ড থ্রাস্ট দরকার, দরকার যেখানে শব্দাতিগ গতি, উড়তে হবে যেখানে সীমাহীন উচ্চতায় সেখানে —রকেট ছাড়া নান্যঃপন্থা।

**তরল** ( প্রপেলেণ্টের ) **উৎক্ষেপকের** প্রথম ব্যবহার।

১৯২০ সালে তরল অক্সিজেন নিয়ে, আর ১৯২৬ সালে পেট্রল নিয়ে হাতে কলমে কাজ স্থরু করেন আর এইচ গডারড। তাঁর তরল উৎক্ষেপক চালিত রকেট ২'৫ সেকেণ্ডে ১৮৪ ফুট, তার মানে ঘণ্টায় গড়ে ৬০ মাইল যেতে পারল। হারম্যান ওবর্থকে বলা হতো "অ্যাসট্রোনটিকস"-এর জনক। বলবে না-ই বা কেন? ১৯২৩ সালে আজ থেকে ৬২ বছর আগে, তাঁর "দি রকেট ইনটু ইনটারপ্ল্যানেটারি স্পেস" নামের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ২৩শে জুলাই ১৯৩০ তারিখে তাঁর তৈরী দহন প্রকোষ্ঠে ( কমবাশচান চেম্বার ) সর্বপ্রথম তরল অক্সিজেন এবং পেট্রোলের দহন সম্পন্ন হয়। এই তরল উৎক্ষেপকের ব্যবহারে ১৫ পাউণ্ড থ্রাস্ট স্থষ্টি হয়েছিল।

ফ্রান্সে—অন্য এক রাসায়নিক প্রপেলেণ্ট—টেট্রানাইট্রোমীথেন চেষ্টা করা হয়েছিল। এবং কৃতকার্য হওয়া গিয়েছিল।

ইটালীতে—১৯২৯ সালে লুইগি ক্রকো ( **Luigi Crocco** ) দ্বিরাসায়নিক প্রপেলেণ্ট চেষ্টা করলেন। এতে রাসায়নিক দুটি ছিল নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড আর পেট্রল।

১৯৩৩-৩৫—আবার নাইট্রোমীথেন নিয়ে নাড়াচাড়া করা হল।

**নিরেট উৎক্ষেপকের** রকেট মোটর।

আভাস:

উৎক্ষেপক—নিরেট উৎক্ষেপকের রকেট মোটর, নির্মাণ কৌশলে সবচেয়ে সাদা মাটা। বস্তুত, নিরেট উৎক্ষেপক হলো জ্বালানী ( **fuel** ) এবং অক্সিজেন

জোগানদার কোন রাসায়নিকের ( oxidant ) সমসত্ব মিশ্র ( homogeneous mixture )। অক্সিজেন জোগানদার আলাদা অবয়বে না থেকে, জালানীর সঙ্গে মিশিয়ে এক অবয়ব করে নিরেট উৎক্ষেপক তৈরী হতো।

প্রজ্বালক ( Igniters )—আতসবাজী তৈরীর মতন মসলা দিয়েই নিরেট উৎক্ষেপকের দাহন সম্পন্ন করা হতো। প্রজ্বালকটি উৎক্ষেপকের কণিকাগুলিকে দহন-তাপে তাপিত করার সঙ্গে সঙ্গে, দহন প্রকোষ্ঠের ভিতরের চাপ বৃদ্ধি করে বিক্রিয়াকে আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌছে দিত। সাধারণত, দুরকমের প্রজ্বালক সংযুতি ( composition ) ছিল।

একটি—বারুদ এবং কোন ধাতু।

অপরটি—বারুদ এবং অক্সিজেন-যোগানদার মিশ্র ( মিকশ্চার ) অর্থাৎ ম্যাগনেশিয়াম / পটাশিয়াম পারক্লোরেট।

কয়েকটি নিরেট উৎক্ষেপকের সংযুতি (১০০ ভাগে)

১। ব্ল্যাক পাউডার—পটাশিয়াম নাইট্রেট—৬১·৬, অঙ্গার (কাঠকয়লা)-২৩, গন্ধক-১৫·৪।

২। কর্ডাইট—নাইট্রোসেলুলোজ-৪১, নাইট্রোগ্লিসারিন-৫০, কার্বামাইট ( ডাই-ঈথাইল ফিনাইল ইউরিয়া )-৯।

৩। জে-পি-এন ( ইউ এস এ ) নাইট্রোসেলুলোজ-৫১·৫, নাইট্রো-গ্লিসারিন-৪৩, ডাই-ঈথাইলফথালেট-৩·২৫, কার্বামাইট-১, পটাশিয়াম সালফেট-১·২৫, অঙ্গারক-০·২, ক্যাণ্ডেলিলা ওয়াকস-০·০৮।

৪। গ্যালসিট ( ইউ এস এ ) পটাশিয়াম পারক্লোরেট-৭৫, জ্বালানী ( একপ্রকার আলকাতরা, আর সামান্য তেল জাতীয় পদার্থ )-২৫

৫। এন-ডি-আর-সি ( ইউ এস এ )-অ্যামোনিয়াম পিক্রেট-৪৫, সোডিয়াম নাইট্রেট-৪৫, রজন-১০।

৬। এক্সপেরিমেণ্টাল ( ইউ এস এ )—থিওকল-২০, টলুয়ীন-২০, পটাশিয়াম পারক্লোরেট-৬০, লেড পারক্লোরেট-সামান্য।

### তরল উৎক্ষেপক

রকেট বুস্টার দিয়ে ঠেলে তুলে ( boost = ঠেলে তোলা ) যে সমস্ত টারবো জেট এনজিনওলা জঙ্গী বিমানকে প্রাথমিক দুরন্ত গতি পাইয়ে দেয়া হতো, সেই রকেট মোটরে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হতো কেরোসীন। তার অক্সিজেন

জোগানদার ছিল—তরল অক্সিজেন। অথবা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড কিম্বা নাইট্রিক এসিড। গবেষণা কাজের রকেটকে অনেক উঁচুতে উঠতে হয়। সেইসব রকেটে অক্সিজেন জোগানদার ছিল ফ্লুওরিন। জ্বালানী হতো হাইড্রাজিন। এই দুটি পদার্থই যেমন মূল্যবান, নাড়াচাড়া করে ব্যবহার করতে তেমনি কঠিন।

রকেট উৎক্ষেপক সংযুতিতে দুটি উপাদান থাকেই। এক জ্বালানী, দুই অক্সিড্যান্ট, অক্সিজেন জোগানদার। সাধারণত, এই দুটি আলাদা তরল, পৃথক আধারে রাখা থাকে এবং আলাদা আলাদাই দহন প্রকোষ্ঠে অন্তঃক্ষেপ করা হয়। এটিকে বলা যায় দ্বিরাসায়নিক উৎক্ষেপক।

বিকল্পে, জ্বালানী এবং অক্সিজেন একই তরলের অবয়বে থাকতে পারে। এটি একটি রাসায়নিকে হতে পারে যথা নাইট্রোমীথেন। অথবা অ্যামোনিয়া আর নাইট্রাস অক্সাইড দুটি রাসায়নিককে একই অবয়বে ধরে রাখা যেতে পারে। এক অবয়বে দুই রাসায়নিকের উৎক্ষেপকের পদ্ধতিকে মনোপ্রপেলেণ্ট সিস্টেম বলা হতো।

মনোপ্রপেলেণ্ট ( এক-রাসায়নিক উৎক্ষেপক )

দ্বিরাসায়নিক উৎক্ষেপকের চেয়ে এক-রাসায়নিক উৎক্ষেপকের সুবিধা এই যে এক রাসায়নিকে বন্দেজ বন্দোবস্ত অনেক সরল। দহন প্রকোষ্ঠে সূক্ষ্ম শীকর আকারে তরলটিকে অন্তঃক্ষেপ করলেই চলে। দুটি রাসায়নিককে মেশানোর নজল বা সূচীছিদ্র, জেট, কোনটারই দরকার নেই। ট্যাঙ্কের, পাম্পের নিয়ন্ত্রণের, সরবরাহের ( feeding ) ঝুট ঝামেলা এক রাসায়নিকের উৎক্ষেপকের বেলায় আর্দ্ধেক। দ্বিরাসায়নিক উৎক্ষেপকে অক্সিজেন জোগানদার ও জ্বালানীর একটা নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় রাখতে এবং দ্রুতি ভেদে / উচ্চতা ভেদে এই অনুপাতের পরিবর্তন ব্যবস্থা করতে হিমসিম খেতে হয়।

অসুবিধা—এক রাসায়নিকের তাপ এবং ধাক্কা (শুক) বিষয়ে স্পর্শকাতরতা থাকায় নাড়াচাড়া করা বিশেষ বিপজ্জনক। দহন প্রকোষ্ঠ আকারে অনেক বড়ো, দহন কার্যে উত্তাপ অনেক বেশী, দহন ক্রিয়ার বৃহত্তর জায়গা প্রয়োজন।

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড—এর ব্যবহার প্রচুর। রকেট মোটরে উৎক্ষেপকের কাজে। টারবো পাম্প চালানোর প্রয়োজনে। উচ্চ তাপ বাষ্প তৈরীর জনক হিসেবে। সাবমেরিনেও এককালে শক্তির আধার হিসেবে এর ব্যবহার ছিল। গাঢ়তা প্রয়োজন—শতকরা ৮০ থেকে ৯০। অনুঘটক (catalyst) ক্যালশিয়াম অথবা সোডিয়াম পারম্যাঙ্গানেট।

## দ্বি-রাসায়নিক উৎক্ষেপক ( বাইপ্রপেলেন্ট )

এক রাসায়নিক-ওলা উৎক্ষেপকের চেয়ে অনেক নির্ভরযোগ্য। কর্মক্ষমতা ও কার্যকারিতায় অনেক বেশী বলেই অনেক বেশী এর ব্যবহার। দ্বি-রাসায়নিক উৎক্ষেপক দু রকমের হয়—স্বপ্রজ্বালক ( সেলফ ইগনাইটিং ) আর স্ব-প্রজ্বালক নয়। গোড়ার দিককার ব্যবহারকেরা যেমন ওবর্থ গডার্ড স্ব-প্রজ্বালক নয় এমন দ্বিরাসায়নিক উৎক্ষেপক দিয়ে কাজ করলেন ; এগুলিতে বাইরেকার তাপের উৎস দিয়ে জ্বালন ( ইগনিশন ) সুরু করাতে হত। ত্রিশের দশকের শেষভাগে আবিষ্কৃত হল যে, কিছু কিছু রাসায়নিক আছে যারা (১) গাঢ় ( কনসেনট্রেটেড ) নাইট্রিক এসিডের (২) হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের (৩) ধূমায়িত লাল নাইট্রিক অ্যাসিডের ( রেড ফিউমিং ) সঙ্গে এনিলিনের মিশ্রের অথবা (৪) হাইড্রাজিন হাইড্রেট এবং হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের মিশ্রের সংস্পর্শে এলে আপনিই জ্বলে ওঠে।

তরল উৎক্ষেপকের কার্যকারিতা

| অক্সিজেন জোগানদার ( অক্সিডেন্ট ) | জ্বালানী ( ফুয়েল ) | মিশ্র এর প্রকৃতি | মিশ্রনের অক্সিড্যান্ট/ফুয়েল | দহন এর তাপমাত্রা সেন্টিগ্রেডে |
|---|---|---|---|---|
| তরল অক্সিজেন | তরল হাইড্রোজেন | স্ব-প্রজ্বালক নয় | ৩.৪ | ২,৩০০ |
| ” | পেট্রল | ” | ২.৫ | ৩,১০০ |
| ” | ঈথাইল অ্যালকোহল (১০০%) | ” | ১.৫ | ২,৯০০ |
| ” | তরল অ্যামোনিয়া | ” | ১.২ | ২,৬০০ |
| ” | হাইড্রাজিন | ” | ০.৮ | ২,৮০০ |
| ধূমায়িত লাল নাইট্রিক এসিড | এনিলিন | স্ব-প্রজ্বালক | ৩.০ | ২,৭০০ |
| ” | ঈথাইল অ্যালকোহল (১০০%) | স্ব-প্রজ্বালক নয় | ২.৮ | ২,৬০০ |
| নাইট্রিক এসিড (১০০%) | হাইড্রাজিন | ” | ১.২ | ২,৫০০ |
| হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (৮৩%) | 'সি'-ষ্টফ * | স্ব-প্রজ্বালক | ২.৮ | ১,৯০০ |
| × | নাইট্রোমিথেন | এক রাসায়নিক উৎক্ষেপক | — | ২,২০০ |

* 'সি-ষ্টফ একটি সাংকেতিক ব্যবসায়িক নাম এতে আছে হাইড্রাজিন হাইড্রেট-৩০% মিথাইল অ্যালকোহল ৫৭% জল-১৩%

## উৎক্ষেপক নির্বাচন

রকেট পরিচালিত এনজিনের উৎক্ষেপক ( প্রপেলেন্ট ) নির্বাচনে সব চেয়ে গুরু বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, জ্বালানীর জন্যে কতোটা জায়গা লাগবে এবং তার ওজনই বা হবে কতো ! সেই মাপের জায়গা এবং সেই ওজনের ব্যবস্থা রাখা—। আমরা দেখেছি, তরল জ্বালানীর ব্যাপারে—( যে কোন জ্বালানীকে জ্বালতে বা সাহায্য করতে ) অক্সিজেন অনিবার্য প্রয়োজন। জ্বালানী হিসেবে তরল হাইড্রোজেনের ভূমিকাও উপেক্ষণীয় নয়। এই দুটি রাসায়নিক সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার।

## তরল অক্সিজেন

হাল্কা নীল রং।—১৮৩° ফারেনহীটে স্বাভাবিক বায়ুর চাপেই ফুটতে থাকে। স্ফুটনাঙ্ক ( বয়েলিং পয়েন্ট ) খুব কম। অন্তরিত ( ইনসুলেটেড ) পাত্রে তো রাখতে হয়ই, তা সত্ত্বেও নিরবচ্ছিন্ন বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। ম্যাগনেশিয়াম কারবোনেট বা 'গ্লাস উল' দিয়ে অন্তরিত বিপুলাকার ট্যাঙ্কে রাখতে হয়। পাত্রান্তর কালে সব চেয়ে বেশী নষ্ট হয়। "এ ফোর" এর ব্যবহারের কালে ৫০% পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে। মিসাইলে ব্যবহারের জন্য কিন্তু অন্তরণের প্রয়োজনই নেই। ট্যাঙ্কের বাইরের পিঠে, পাতলা তুষারের যে আস্তরণ পড়ে, সেই অন্তরণই যথেষ্ট। প্রয়োজনমতো যে কোন জায়গায় ব'সে তৈরী করা যায়। শরীরের ওপর পড়লে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং দ্রুত বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। কোনো বিষক্রিয়া ( টক্সিন ) তো নেই-ই ক্ষতিও কিছু করে না; তবে মানুষের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তরল অক্সিজেনে বেশিক্ষণ ডুবে থাকলে দুরন্ত তুষার ক্ষতের চর্মপ্রদাহ হয়। জৈব পদার্থের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ, তরল বা গ্যাস আকারের তরল অক্সিজেন, অনায়াসে শুষে নেয়। এবং তখন দুরন্ত বেগে জ্বলতে থাকে, জ্বালিয়ে দিলে দুরন্ত বিস্ফোরণ ঘটায়। আবহাওয়ার মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ যতোটুকু, তরল অক্সিজেনে, অক্সিজেনের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি। তাই, হাওয়ার চেয়ে, তরল অক্সিজেনে যে কোন জিনিসের জ্বলনাঙ্ক ( ইগনিশন পয়েন্ট ) অনেক কম। অনবরত বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আগুন লেগে গেলে আর নিস্তার নেই। কী দুরন্ত তাপে যে 'কোন ধাতু এবং সব কিছু জ্বালিয়ে গালিয়ে দেয় তা অবর্ণনীয়। এর আগুন আয়ত্তে আনার উপায় আজও বের হয় নি। তরল

অক্সিজেনের সঙ্গে অন্য কোন মিশ্র অতি সহজেই দাহ্য। একটি সাদামাটা স্পার্কপ্লাগ দিয়ে তরল অক্সিজেন ও ঈথাইল অ্যালকোহলের মিশ্র-এর স্রোত (প্রতি সেকেণ্ডে বহুল পরিমাণে) দাহন করা সম্ভব। "ভি-টু"তে তো সেই আতস বাজীর কৌশলে (পাইরোটেকনিকস) জ্বালানো হতো। এরোপ্লেনে প্রাক দহন প্রকোষ্ঠ (প্রিকমবাশচান চেম্বার) আছে, মিসাইলে তা নেই। মিসাইলে তাই একটি বার দহন স্থরু করলেই আর দরকার হয় না।

## হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড

এর চেয়ে ভালো অক্সিজেন জোগানদার খুঁজে পাওয়া শক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীতে ৮২-৮৩% গাঢ় হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বছরে ১৬০০০ টন পর্যন্ত অগ্নিমূল্যে বিক্রী হতো। (১৯৫৮ সালেও দর ছিল টন প্রতি ১৫০ পাউণ্ড) এইচ২ ও২ র কোন বিষক্রিয়া নেই। গায়ে পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেললে সাময়িক ভাবে শ্বেতীর মতো দাগ হয়। বেশীক্ষণ থাকলে চামড়া উঠে আসে। ন্যাকড়া জাতীয় জিনিসের ওপর পড়লে স্বতঃই আগুন ধরে যায়। তাই পাত্রান্তরের সময় হুঁশিয়ার। এর আগুন সহজেই বাগে আনা যায়। এমনকি শুধু জল দিয়েই। হাতের কাছে প্রচুর জলের সংস্থান রেখে, চোখে চশমা আর কিছু অঙ্গত্রাণ overalls পরে পাত্রান্তর করুন না! কিছু কিছু জিনিস আছে যা পড়লে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, জল এবং অক্সিজেনে ভেঙ্গে যাবে। সেটা বড়ো কথা নয়। তার সঙ্গে যে দুর্ধর্ষ তাপ সৃষ্টি হবে তা সত্যি দুর্দম। ফসফরিক এসিডের মতো স্টেবিলাইজার দিয়ে কমানো যায়। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের বিশ্লেষ (ডিকমপোজিশন) ঠেকানো প্রায় অসম্ভব। বিমান ধ্বংসী মিসাইলে তাই সীল মোহর করা আধারই ব্যবহার করতে হয়।

**বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থবিধা**—অনুঘটকের (ক্যাটালিস্ট) সাহায্যে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডকে ভেঙে টারবাইন চালানোর উপযুক্ত তাপের বাষ্প এবং অক্সিজেন এর মিশ্র—অতি সহজেই আদায় করে নিতে পারি। উৎক্ষেপক পাম্প করার কাজ তাই জলবৎ সরল হয়ে গেছে। আর এটিকে তো একক রাসায়নিক উৎক্ষেপক হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি।

**রেড ফিউমিং নাইট্রিক এসিড**—এতে ২০% পর্যন্ত নাইট্রোজেন পারঅক্সাইড থাকে। অতিমাত্রায় বিষক্রিয়া উৎপাদক। অতিমাত্রায় ক্ষয়কারক

( করোসিভ )। কলার ( টিস্যু ) ওপর প্রতিক্রিয়া ভীষণ বিপজ্জনক। শরীরে কোথাও পড়লে ভীষণ পুড়িয়ে দেবে যদি না সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলা যায়। অণুমাত্র, এই এসিড চোখের পক্ষে সর্বনাশের হেতু। এসিডের মধ্যেকার নাইট্রোজেন পারঅক্সাইড, কারবন মনক্সাইডের মতো উগ্র বিষক্রিয়া উৎপাদক। কোন কিছুর ওপর পড়লে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলুষিতও করে।

**তরল উৎক্ষেপক ব্যবহারকারী মোটরের প্রত্যঙ্গ**

ব্যাপারটির জটিলতায় যাবার অবকাশ নেই। দুচার কথায় কিছু আভাস দিয়ে যাই।

রকেটগুলিকে হতে হবে হাল্কা, প্রত্যঙ্গগুলি তাই হতে হবে ঠাসা মজবুত।

চারটে প্রধান অঙ্গ হচ্ছে—দহন প্রকোষ্ঠ ( কমবাশচান চেম্বার ), টারবাইন, পাম্প ( নানারকম ) ভালব ( নানারকম )

এদের হৃদপিণ্ড কমবাশচান চেম্বারে আছে মূলত তিন প্রধান—ইনজেকটর ( অন্তঃক্ষেপক ), মূল কমবাশচান চেম্বার এবং নজ্‌ল্ ( পাইপ ইত্যাদির সূচীমুখ )। দহন প্রক্রিয়াটিতেও কয়েকটি স্তর—(১) যান্ত্রিক প্রস্তুতি, এবং শীকরীকৃত উৎক্ষেপককে ( প্রপেলেণ্ট ) পরমাণুতে বিভাজন ( অ্যাটমাইজেশন বাই স্প্রেয়িং ), (২) উৎক্ষেপক মিশ্রণ, (৩) জ্বালন তাপে প্রাক-উত্তাপন (৪) এবং প্রতিক্রিয়া। (ক) উৎক্ষেপকের তরলটিকে পরমাণবিকরণ। (খ) বিভিন্ন পরমাণুর মিশ্রণ ( আর না-হলেও, দুটো তো আছেই—অক্সিজেন জোগানদার, আর জ্বালানী ), (গ) উত্তাপন এবং (ঘ) বাষ্পীকরণ। উপরোক্ত, চার রকমের প্রক্রিয়া হতে হতেই দহন গ্যাসগুলির বেগ ( ভেলসিটি ) সেকেণ্ডে ৪০০ ফুট পৌঁছে যায়। এমন কি দাহন শিখার মুখোমুখি হবার আগেই।

অন্তঃক্ষেপক ( ইনজেকটর ) এর দুটি কাজ। পরমাণবিকরণ, আর মিশ্রণ। উৎক্ষেপকের তরল দুটি মিশ্রণের দুটি উপায়। অক্সিজেন জোগানদার এবং জ্বালানীকে একসাথে সবেগে ছুড়ে মারা ( ইমপিঞ্জ )। একে যাতে অপরকে অন্তর্ভেদ করতে পারে। আর দুই, বহুসংখ্যক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিন্দু থেকে অন্তঃক্ষেপ।

এ-ফোর ( বা ভি-টু ) এর অন্তঃক্ষেপক ছিল বিশেষ নাম করা। উৎক্ষেপক ছিল স্বপ্রজ্বালক নয় এমন শ্রেণীর ( তরল অক্সিজেন এবং ৭৫% ঈথাইল অ্যালকোহল )। অন্তঃক্ষেপণ হতো, সাদামাটা গর্ত, এবং চক্রাকারে আবর্তিত

জেট-এর সূচীছিদ্র দিয়ে। ১৯৫৮ সাল অবধি সর্ববৃহৎটি ছিল ওয়ালটার প্রবর্তিত ১১০,০০০ পাউণ্ডের ঘাতওয়ালা 'ঠাণ্ডা' পারঅক্সাইড যন্ত্রটি। প্রখ্যাত আমেরিকান রকেট বিশেষজ্ঞ ডঃ ম্যালিনা মনে করতেন ১২ ফুট ব্যাসের প্রকোষ্ঠ, ৫ ফুট ব্যাসের কণ্ঠওয়ালা মোটর দিয়ে তিনি ১,০০০,০০০ পাউণ্ডের ঘাত তৈরী করতে পারবেন। টার্বো পাম্প সংযুতিকে ১০৯-৫০৯ এ ২ মার্কা এনজিনের টারবাইনে, মিনিটে ১৬০০০ পাক এবং ১২০ অশ্বশক্তি পাওয়া যেত। এই ধরনের টারবাইনে একমাত্র কেন্দ্রাতিগ ( সেন্ট্রিফিউগাল ) পাম্পই থাকে। এতো স্পীড এবং এতো অশ্বশক্তি আর কোন পাম্পের পক্ষে জোগানো সম্ভব নয়। গাঢ় হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড এমনই একটি রাসায়নিক যা থেকে বিনাক্লেশে টারবাইন চালানোর স্টীম পেতে পারি। যে সব এনজিনে অক্সিজেন জোগান স্থায় অন্য সামগ্রী, সেখানেও কিন্তু টাররাইন চালানোর স্টীমের জন্য হাইড্রোজেন পার অক্সাইড থাকে-ই।

যে সমস্ত তরল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয় তাদের মধ্যে ঢোঁড়া সাপের মতো নিরীহ গ্যাসও আছে ( নাইট্রোজেন বা হাওয়া ), জাত কেউটের মতো ফুটন্ত বা ক্ষয়ানক এসিডও আছে তরল অক্সিজেন বা নাইট্রিক। কার্যকর তাপমাত্রাও '—১৮৩°' ফারেনহীট ( তরল অক্সিজেন এর ) থেকে কয়েক শ ডিগ্রী ( টারবাইন গ্যাস-এর ) পর্যন্ত হতে পারে। কবাটিকাই ( ভালব ) বা কতো রকমের। স্টপ ভালব, থ্রট্‌ল্ ভালব, নন রিটার্ন বা একরোখা ভালব, প্রেশার কনট্রোলড বা চাপ নিয়ন্ত্রিত ভালব। তাদের ক্রিয়াই বা কতো রকমের। ১০ থেকে ২০ মিলিসেকেণ্ড সময়ের মধ্যে পুরো বন্ধ থেকে পুরো খোলা। স্টপ ভালব বা রুখে দেওয়া ভালবের মধ্যে সবচেয়ে সহজটি হচ্ছে বার্স্টার ভালব। তরলটির গতিপথে পাতলা ঝিল্লী সদৃশ চাকতি দিয়ে রুখে রাখা। তরলটি একটি নির্ধারিত চাপে পৌছলে এই চাকতি ফেটে গিয়ে তরলটিকে যাবার রাস্তা করে দেয়। এগুলি কিন্তু মিসাইলে ছাড়া চলবে না। ওষধি বৃক্ষের মতো একবারই কাজ করে। মূল প্রপেলেন্টকে নিয়ন্ত্রিত করতে ইলেকট্রিকে নিয়ন্ত্রিত সলিনয়েড ভালব, গ্যাস চালিত নিউম্যাটিক ভালবও থাকে।

এ-ফোর মিসাইলের চালন ব্যবস্থায় ১৯টি বিভিন্ন ধরণের ৩৩টি ভালব লাগত।

জার্মান বিমান ধ্বংসী ( অ্যান্টি এয়ার ক্রাফ্‌ট্ ) মিসাইল

(১) তাইফুন—তরল দ্বিরাসায়নিক উৎক্ষেপক—স্যালবী (জার্মানীর সাংকেতিক নাম, আসলে ৯৮—১০০% গাঢ় নাইট্রিক এসিড ) এবং ভিসল ( ভিনাইল ইথারের জ্বালানী )। দহন সময়—মাত্র ২২ সেকেণ্ড

(২) ওয়াসারফল—তাইফুনের চেয়ে সব দিকেই বড়ো

(৩) ওয়ান্টার ১০৯-৭২৯—স্মেটারলিং গোষ্ঠীর। এটি ০.৭৫ ম্যাক সংখ্যায় অবিচল থাকতে পারত। উৎক্ষেপক ছিল—নাইট্রিক এসিড আর পেট্রল, এদের স্বপ্রজ্বালক করার জন্য, প্রচুর % কারফেরাইল অ্যালকোহল সমন্বিত 'ফ্যান্টল', জ্বালানীর লাইনে, বার্স্টার ডিসক-এ ভরে রাখা হতো। এই ফারফেরাইল অ্যালকোহল নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হলে স্বপ্রজ্বালক হয়।...ঘাত ( থ্রাস্ট ) নিয়ন্ত্রিত করা হতো, অন্তঃক্ষেপক পাঠানোর দুই প্রস্থ ছিদ্রাবলীর সাহায্যে। এক সেট ছিদ্রে সর্বক্ষণই পুরো প্রবাহ থাকত। অন্য সেট ছিদ্রের প্রবাহ সার্ভোমোটরের সাহায্যে কম বেশী করা যেতো। এবং ঐ প্রকারে প্রার্থিত ম্যাক নাম্বারে সুস্থিত করা সম্ভব হ'তো—

## অদূর পাল্লার মিসাইল

### নিরেট উৎক্ষেপক ( সলিড প্রপেলেন্ট )

এই পর্যায়ের মিসাইলের রীতি প্রকৃতি, পরিচালন ব্যবস্থা খুব সহজ ও সরল। সেই প্রসাদে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এর ব্যবহারের অন্ত ছিল না। সুপরিচিত বাজুকা, আকাশ থেকে আকাশে, আকাশ থেকে মাটিতে ব্যবহার্য, বিমান ধ্বংসী রকেট-এ, ৯০ মাইল পাল্লার বহুস্তর (Rheinbot) রাইনবোট-এ প্রচুর ব্যবহার হয়েছে এই নিরেট উৎক্ষেপক।

**তরল উৎক্ষেপক** ( লিকুয়িড প্রপেলেণ্ট )

এই পর্যায়ের মিসাইলের কর্মক্ষমতা প্রচুর, পাল্লা সুদূর হলেও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথেষ্ট জটিল। পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত মিসাইলের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। তাইফুন ছিল জার্মানদের অপরিচালিত ( আনগাইডেড ) তরল উৎক্ষেপকের বিমানধ্বংসী মিসাইল। মাসে ২,০০ ,০০০টি তৈরীর আয়োজন হ'তে হ'তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তাইফুন তৈরীর কার্যসূচীর খেলও খতম হয়ে যায়।

**স্থল থেকে আকাশের** মিসাইল ( স্যাম )

উচ্চমার্গের বোমারুকে জব্দ করতে বিমানধ্বংসী মিসাইল সে-আমলে অপরিচালিত ব্যারেজ ধরনের বা পরিচালিত ( গাইডেড ) উভয়ই হতো। ডুব মারা বোমারু **dive bomber** তখন বন্দরের জাহাজগুলিকে বড়ো উত্যক্ত করছিল। হাওয়াই মাইন সম্বলিত ৩ ইঞ্চি ব্যাসের রকেট ব্যবহারে খুব সুফল পাওয়া গিয়েছিল।

**নিরেট উৎক্ষেপককে** ভাঁড়ার-জাত করতে এবং দীর্ঘকাল অবিকৃত রাখতে খুব সহজ। হাল্কাও বটে। দহন কাল কম বলে নিয়ন্ত্রিত ( গাইডেড ) মিসাইলে অচল। উড়ন্ত বা চলন্ত লক্ষ্যবস্তুর ক্ষেত্রে লক্ষ্য বনাম মিসাইলের একটা সময় সম্পর্ক অবশ্যই না থাকলে চলে না। তরল উৎক্ষেপক নিরেট উৎক্ষেপকের চেয়ে অনেক সহজে অথচ দীর্ঘতরকাল ব্যাপী দহনের যোগ্য বলেই তরলের এই উৎকর্ষ।

জাপানী আত্মঘাতী বোমারু "বাকা"র বিরুদ্ধে ব্যবহার হতো "লিটল জো" আর "স্টুজ"। উপরের আইনের ব্যতিক্রম করে এই দুটি কিন্তু **নিরেট উৎক্ষেপকে** চলতো।

"লিটল জো" ( আমেরিকান )—উঁচু বেদী থেকে, গুলতি ছোড়া করা হতো। ৪টি বুস্টার ছিল। সর্বোচ্চতা—১০,০০০ ফুট। সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০০ মাইল। পরিচালনা—হুকুম মানা ( কম্যাণ্ড গাইডেন্স )। বিস্ফোরকের পরিমাণ—১০০ পাউণ্ড। উৎক্ষেপক নিরেট।

"স্টুজ" ( ব্রিটিশ )—চালকহীন বিমান। রাডার **Rudder** ( র‍্যাডার নয় ) নেই। উত্তোলক ( এলিভেটর ) এবং এইলিরন এর সাহায্যে চালানো হতো।

উঁচু মঞ্চ থেকে গুলতি ছোড়া, ৪টি বুস্টার, এক সেকেণ্ডের জন্য ৫৬০০ পাউণ্ড ঘাত (থ্রাস্ট), হুকুম মানা পরিচালনা, ধাওয়া করা চোখে দেখে। চার স্তর রকেটের সাহায্যে স্পীড পাইয়ে দেওয়া হতো। **উৎক্ষেপক নিরেট।**

"তাইফুন" ছিল তরল উৎক্ষেপক সিরিজে সব চেয়ে সরল। ৭ সেন্টিমিটার (পৌনে তিন ইঞ্চি) বহির্ব্যাসের খোলটি ছিল "ড্র"করা ইস্পাতের। ডানা ইস্পাতের পাতের, মূল শরীরের সঙ্গে ওয়েলডিং করা। ভিতরে পোরা থাকত রকেট, বিস্ফোরক আর ফিউজ। উচ্চ মার্গের "ফোরট্রেস" বোমারু যুথ আটকাতে ব্যবহার করা হতো। স্পর্শ টাইপের (কনট্যাক্ট) ফিউজ ছিল বলেই মাত্র ১·১ পাউণ্ড বিস্ফোরক নিয়ে যেতো। কাজ না হলে অবাঞ্ছিত জায়গায় ভূমিষ্ঠ হয়ে যাতে লণ্ডভণ্ড 'সেম সাইড গোল' না করতে পারে তার জন্য আত্মনাশী ফিউজ দেওয়া থাকত। **সব নিয়ন্ত্রিত / পরিচালিত মিসাইলে তাই আত্মনাশী ফিউজ দেওয়া থাকে।**

"এনজিয়ান"—হুকুম মানা নিয়ন্ত্রণ (কম্যাণ্ড কনট্রোল)। দুটি টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখা-পথ অনুসারী। র‍্যাডার দিয়ে লক্ষ্যবস্তু আবিষ্কার ক'রে, অনুসরণকারী টেলিস্কোপ লক্ষ্য বস্তুকে নজরে রাখত। মিসাইল নিয়ন্তা চালকের টেলিস্কোপটি থাকত পিছনে। মিসাইলটি লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌছলে, লাল উজানী (ইনফ্রা রেড) একটি প্রক্রিয়া, হুকুম-মানা প্রক্রিয়ার হাত থেকে কার্যভার গ্রহণ করতো। সব শেষে একটি সান্নিধ্য (প্রক্সিমিটি) ফিউজ বিস্ফোরণ ঘটাতো। লক্ষ্য মিস করলে দূর থেকেই বিস্ফোরণ ঘটাবার ব্যবস্থা ছিল। উঁচু মঞ্চ থেকে ছোড়া হতো। নিরেট প্রক্ষেপক চালিত চারটি বুস্টার গতিবেগ পাইয়ে দিত।

"ওয়াসারফল' শব্দাতিগ (সুপারসোনিক)। ৩ ফুট ব্যাস, ২৬ ফুট লম্বা, বুস্টার ছাড়াই মাটির মায়া ত্যাগ ক'রে সেকেণ্ডে ২৬০০ ফুট বেগে (ভেলসিটি) ৬০,০০০ ফুট উঁচুতে উঠতে পারত। দূর থেকে ৩০ মাইল পর্যন্ত একে নিয়ন্ত্রণ করা যেতো।

"রাইন টকটর-এক" নিরেট উৎক্ষেপক রকেট চালিত। দহন কাল ২½ সেকেণ্ড। ঘাত (থ্রাস্ট) ৩৫০০০ পাউণ্ড। ০·৬ সেকেণ্ড ব্যাপী ১৬,৫০০ পাউণ্ডের বুস্ট এর সাহায্যে ঘণ্টায় ১১০০ মাইলের ত্বরণ (একসিলারেশন) পাইয়ে দিতে সক্ষম হতো। "রাইনটকটর-তিন" পরে তরল উৎক্ষেপক ব্যবহার করে ৪৫ সেকেণ্ড ব্যাপী ৩৯০০ পাউণ্ড ঘাত সংগ্রহ করতে সম্ভব করেছিল।

## আকাশ থেকে আকাশে মিসাইল AAM

আকাশ থেকে আকাশের রকেট ছিল সহজ সরল। নিরেট উৎক্ষেপক চালিত, বিস্ফোরক ছিল উগ্র। যুদ্ধের শেষাশেষি জার্মানদের "এক্স ফোর" তৈরী সম্পন্ন হয়। চুরুট আকারের গতর, সর্বাধিক ব্যাস ৯ ইঞ্চি, ৬ ফুটের ওপর লম্বায়। পরিচালনা ছিল দুই ডানার ডগায় পিয়ানো অয়্যার (তার) দিয়ে। সে এক মান্ধাতার আমলের ব্যাপার। ঘাত (থ্রাস্ট) ৩০০ পাউণ্ডে সুরু হয়ে ১৭ সেকেণ্ডে নেমে নেমে গিয়ে ৭০ পাউণ্ডে দাঁড়াত। পাল্লা ৬০০০ ফুট। সর্বোচ্চ স্পীড—সেকেণ্ডে ৭০০। ফুট ফোরট্রেস বিমান বহরের যম বলে গণ্য হতো। ১৩০০টি তৈরী হয়েছিল—কাজে লাগেনি।

"শ্‌মেটারলিং"—বিমানধ্বংসী। একটি ছোট্ট এরোপ্লেনের ধাঁচে ৩০ রকমের মডেল তৈরী হ'লো। ওপরে-নিচে একটির সঙ্গে আর একটি জোড়া লাগানো দুটি ফিউজিলেজ (এরোপ্লেনের মূল 'বডি') দিয়ে তৈরী। নিচেকারটিতে রকেট আর পাওয়ার সাপ্লাইর জন্য উইণ্ডমিল জেনারেটার। ওপরেরটিতে বিস্ফোরক এবং পরিচালনার সাজসরঞ্জাম।

"রিয়ান ফায়ারবার্ড"—আকাশ থেকে আকাশের নিয়ন্ত্রিত মিসাইল। ১৯৪৯ সালে তৈরী হতে দুটি বছর লাগল। খরচ পড়ল ২,০০০,০০০ ডলার। মূল 'বডি' ব্যাসে ৬ ইঞ্চি, লম্বায় ৭ ½ ফুট, বুস্ট নিয়ে ১০ ফুট। অদূর পাল্লা। মুক্ত করার আগে লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হ'তো। বাহক এরোপ্লেনে থাকত সন্ধানী র‍্যাডার। লক্ষ্য আবিষ্কৃত হলে, তাগ করে মিসাইল ছোড়া হতো।

## আকাশ থেকে স্থলে মিসাইল ASM

এইচ এস ২৯৩ এসি—শ্‌মেটারলিং এর মতনই প্রায় সব বিধি ব্যবস্থা। ওজন এক টন। সর্বাধিক স্পীড ঘণ্টায় ৩৭৫ মাইল। ১৯৪৩ গ্রীষ্মকালে প্রথম ব্যবহৃত। এইচ এস ২৯৪ প্রকৃতপক্ষে ডানাওয়ালা। চালন ব্যবস্থা দুটি চালনাকারী যন্ত্র সম্বলিত টরপেডো। লম্বায় ২০ ফুট, চওড়ায় ১৩ ফুট, ওজনে ২ টন। জলের সারফেসে, জলের নিচের টরপেডোর আচরণ। স্পীড ঘণ্টায় ৫০০ মাইল, পাল্লা ৯ মাইল। প্রথমে তরল পরে নিরেট উৎক্ষেপক চালিত।

## স্থল থেকে স্থলের মিসাইল SSM

অনিয়ন্ত্রিত। নিরেট উৎক্ষেপক। জারমানীর তার ( অয়ার ) নিয়ন্ত্রিত একন সেভেন। মাত্র ২০ পাউণ্ড ওজন। বিস্ফোরকই ৫½ পাউণ্ড। গত বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত। ১০,০০০ গজ পাল্লার। উগ্র বিস্ফোরকওয়ালা। ৩ ইঞ্চি এবং ৫ ইঞ্চি ব্যাসের নিরেট রকেট। জাহাজ থেকে তীরে এবং মাটি থেকে মাটিতে খুব সফল-ভাবে বোমাবাজিতে সক্ষম হয়েছিল।

## দূর পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল ICBM

আমেরিকার কনভেয়ার বি ৩৬ ডি, ১০,০০০ পাউণ্ড ওজনের বোমা নিয়ে ৮,০০০ মাইল যেতে পারে।

বহুস্তর রকেট দিয়ে যে কোন গতিবেগ, যতোদূর ইচ্ছে পাল্লা পাওয়া যেতে পারে।

নিম্নতম স্তরের রকেটটিতে সর্বপ্রথম অগ্নিসংযোগ করা হয়। এটি উপরের স্তরগুলির ঘাত ( ইমপালস ) সরবরাহ করে। উৎক্ষেপকের জ্বালানী নিঃশেষ হলে নিম্নতম স্তরটি বাতিল হয়ে যায়। এবং এর ওপরের স্তরটি কর্মভার গ্রহণ করে। এ ই ভা বে উপরিতমটিকে যতোদূর ইচ্ছে যতো বেগে ইচ্ছে পাঠানো সম্ভব। কিন্তু অসুবিধে এই যে, মূল ওজন গুণোত্তর শ্রেণী ( জিওমেট্রিক সিরিজ )-তে বাড়তে থাকে।

| "এ ফোর" সিরিজ ভিত্তিক | | |
|---|---|---|
| স্তরের সংখ্যা | ওজন, টন-এ | পাল্লা, মাইল-এ |
| ১ | ১২·৫ | ৩৪০ |
| | ৪৯ | ১,৩৪০ |
| ৩ | ১৮৩ | ৩,০২০ |

গত যুদ্ধে দুটি মাত্র ব্যবহার হয়েছিল "এ ফোর" আর রাইনবোট।

জার্মানীর পীনেমুণ্ডি গবেষণা কেন্দ্রে ফন ব্রাউনের নেতৃত্বে ১৯৩৩ সালে "এ ফোর" সিরিজের কাজ সুরু হয়েছিল।

## ‘এ’ সিরিজ মিসাইলের ক্রমোন্নতি

| | সালে শুরু | সমগ্র ওজন —পাউণ্ডে | দৈর্ঘ্য —ফুটে | ‘বডি’র ব্যাস —ফুটে | মন্তব্য | ঘাত—পাউণ্ডে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৯৩৩ | ৩৩০ | ৪·৬ | ১ | মৌলিক গবেষণার নমুনা। খাড়া উল্লম্ব উৎক্ষেপণ। নাকের ডগায় বিশাল জাইরো দ্বারা সুস্থিতকরণ। অসফল | ৬৬০ |
| ২ | ১৯৩৪ | ৩৩০ | ৪·৬ | ১ | সবই উপরোক্তের মতো। নাকের ডগা থেকে সরে জাইরো এলো মাঝখানে। সর্বোচ্চতা ৬,৫০০ ফুট | ৬৬০ |
| ৩ | ১৯৩৮ | ১.৬৫০ | ২৫ | ২·৫ | ‘এ-৪’ এর মতন। ব্যয়িত গ্যাসের স্রোতে ‘রাডার’ স্থাপন। সর্বোচ্চতা—৪০,০০০ ফুট। পাল্লা -১১ মাইল | ৩,৩০০ |
| ৪ | ১৯৪০ | ২৮,০০০ | ৪৬ | ৫·৪৪ | ব্যবহারিক। পাল্লা ১৮০-২২০ মাইল | ৫৬,০০০ |
| ৫ | ১৯৩৮ | ১ ৬৫০ | ২৫ | ২·৫ | গাইডেন্স পরীক্ষার্থে, ছোট মাপের ‘এ-৪’। সর্বাধিক পাল্লা -৫৯,০০০ ফুট | ৩,৩০০ |
| ৬ | | | | | নকশার সাফল্য পরীক্ষামূলক | |
| ৭ | ১৯৪১ | ১,৭৪৩ | ২৫ | ২·৫ | ডানা সমন্বিত ‘এ-৫’। ‘এ-৯’ এর পরীক্ষার বাহন | ৩,৩০০ |
| ৮ | ১৯৪২ | ৪৯,৩০০ | ৫৪·৩ | ৫·৫ | ‘এ-৪’ ভিত্তিক। উৎক্ষেপক-নাইট্রিক এসিড ও ডিজেল তেল। পাল্লা—৩০০ মাইল। নকশামাত্র। | ৬৬,০০০ |
| ৯ | ১৯৪১ | ২৮,০০০ | ৪৬ | ৫·৪ | ডানা সমন্বিত ‘এ-৪’। পাল্লা -৩০০ মাইল। নকশা মাত্র। | ৬৭,০০০ |
| ১০ | ১৯৪১ | ১,৯২,০০০ | ৮৫ | ১৩ ৬ | ‘এ-৯’ ‘এ-১০’ এর সংযুতি। পাল্লা —৩,০০০ মাইল। নকশা মাত্র | ৪,৪০,০০০ |

* * * *

**সার্থক ‘এ-৪’ এর উপাত্ত ( ‘ডাটা’ )॥** “এ-৪” ই অন্য নাম “ভি-২” তে বিখ্যাত। দ্বিরাসায়নিক তরল উৎক্ষেপক—৭৫% গাঢ় ঈথাইল অ্যালকোহল আর তরল অক্সিজেন।

| | |
|---|---|
| সর্বমোট লম্বা | ৪৬ ফুট |
| সর্বাধিক ব্যাস, 'বডি'র | ৫ ফুট ৫'৩ ইঞ্চি |
| ডানার জায়গার ব্যাস | ১১ ফুট ৮ ইঞ্চি |
| গুরুভার সমেত ওজন | ১২'৫ টন |
| বিস্ফোরকের ওজন | ২,১৫০ পাউণ্ড |
| কাঠামোর ওজন | ৩,৮৬৫ পাউণ্ড |
| উৎক্ষেপণ কলকব্জার ওজন | ২,২৩৫ পাউণ্ড |
| নিয়ন্ত্রণ কলকব্জার ওজন | ৬৫০ পাউণ্ড |
| উৎক্ষেপক তরলাদির ওজন | ১৯,৩১০ পাউণ্ড |
| আনুষঙ্গিক তরলাদির ওজন | ৪০০ পাউণ্ড |
| সমুদ্রপৃষ্ঠে সর্বাধিক ঘাত ( থ্রাস্ট ) | ৫৬,০০০ পাউণ্ড |
| গড় স্পেসিফিক ঘাত ( থ্রাস্ট ) | ২১০ সেকেণ্ড |
| দহন কালের দৈর্ঘ্য | ৬০-৬৫ সেকেণ্ড |
| টারবাইনের 'ক্ষমতা'র উৎপাদন (আউটপুট) | ৪৬৫ অশ্বশক্তি |

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় অল্প ক'টি লোক দিয়ে সামান্য সময়ে, নির্মানস্থল থেকে নিয়ে যাওয়া যেতো। রকেটটিকে খাড়া দাঁড় করানোর ব্যবস্থাগুলা, টেনে নিয়ে যাবার ট্রলী, জ্বালানী সরবরাহকারী লরী, উৎক্ষেপন মঞ্চ, অগ্নিসংযোগের একটি শকট—ভারী সাজ সরঞ্জাম বলতে দরকার তো এ-ই।

দিগংশে ( এজিমাথ ) পৌছে গতিবেগ, রোল, পিচ নিয়ন্ত্রণ করতো স্বয়ংক্রিয় বিমানচালক। স্বয়ংক্রিয় এই ব্যবস্থা আর কিছুই নয়—একটি অপরটির লম্ব-এ স্থাপিত, ইলেকট্রিক পরিচালিত **দুটি জাইরোস্কোপ**। একটি, গতিপথের অক্ষ বরাবর। অপরটি তার লম্ব-এ। প্রথমটি পূর্বনির্দিষ্ট মতলব অনুসারী, পিচ নিয়ন্ত্রণ করতো। দ্বিতীয়টি নিয়ন্ত্রণ করতো 'রোল' এবং 'ইঅ'। পূর্বনির্দিষ্ট পথের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ধরা পড়তো ( ফাইন অয়ার ) পোটেনশোমিটার এ। সেই ভুলভ্রান্তি অ্যামপ্লিফায়ার এ বর্ধিত হয়ে সার্ভোমোটর-এ পৌছত, সার্ভোমোটর, রাডারগুলিকে তোলা নামানো, ঘোরানো ফেরানো করে ভুল শুধরে দিত।

## রাইনবোট মিসাইল ( নিরেট উৎক্ষেপক )

| | |
|---|---|
| সর্বমোট লম্বা | ৩৬·৬ ফুট |
| সমগ্র ওজন | ৩,৬৪৩ পাউণ্ড |
| ১ম স্তর ওজন | ১,৫৬২ পাউণ্ড |
| ২য় স্তর ওজন | ৮৩৬ পাউণ্ড |
| ৩য় স্তর ওজন | ৭৯২ পাউণ্ড |
| ৪র্থ স্তর ওজন | ৩৬৫ পাউণ্ড |
| বিস্ফোরক বাদে | |
| বিস্ফোরক | ৮৮ পাউণ্ড |
| ১ম স্তর ঘাত ( থ্রাস্ট ) | ৮৩,৬০০ পাউণ্ড |
| ২য় স্তর ঘাত | ১২,৩০০ পাউণ্ড |
| ৩য় স্তর ঘাত | ১২,৩০০ পাউণ্ড |
| ৪র্থ স্তর ঘাত | ৫,২৮০ পাউণ্ড |
| দহন কাল ম স্তর | ১ সেকেণ্ড |
| দহন কাল ২য় ৩য় ৪র্থ স্তর | ৫ সেকেণ্ড ক'রে |
| সর্বাধিক পাল্লা | ৯৬ মাইল |

উৎক্ষেপক—নিরেট। চার স্তর। অনিয়ন্ত্রিত। ৮৮ পাউণ্ড বিস্ফোরক হ'লে পাল্লা ৯৬ মাইল। ৪৪০ পাউণ্ড বিস্ফোরক হলে পাল্লা ৪০ মাইল। প্রথম স্তরে– ক্ষেপণ মঞ্চ থেকে ইলেকট্রিক সাহায্যে অগ্নি সংযোগ করা হয়। বাকি স্তরগুলি ঘাড়-নিয়ন্ত্রিত ফিউজ দ্বারা অগ্নি সংযোজ্য। একটি স্তরে দাহন শুরু হ'লে, ব্যয়িত গ্যাসের ধাক্কায় আগেরটি বাতিল হয়ে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। ১ম ২য় এবং ৩য় স্তর ক্ষেপন মঞ্চ থেকে ২, ৫ এবং ১২ মাইল দূরে নিক্ষিপ্ত হ'তো।

## বাকা—পৃথিবী বিখ্যাত জাপানী আত্মঘাতী বোমারু ( নিরেট উৎক্ষেপক )

| | |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য | ১৯·৮, ফুট |
| প্রস্থ | ১৬ ৪ ফুট |
| ঘাত ( থ্রাস্ট ) | ৪,৩০০ পাউণ্ড |
| সর্বসমেত ওজন | ৪,৫৩৬ পাউণ্ড |
| ডানার ওপর ভার | স্কয়ার ফুটে ৭০ পাউণ্ড |
| সর্বোচ্চ স্পীড | ঘণ্টায় ৫৩৫ মাইল |
| সর্বাধিক পাল্লা | ৬০ মাইল |

বিমানচালক যে বিমান সহ লক্ষ্যবস্তুর ওপর ঝাঁপ মেরে উভয়ই নিশ্চিহ্ন হতো। দেশমাতার পায়ে উৎসর্গীকৃত প্রাণই শুধু নয়, দেহও। হারিকিরির দেশ জাপানেই এই আত্মবলি সম্ভব। শাবাশ! বস্তুত একে নিয়ন্ত্রিত মিসাইলই তো বলবো। নিয়ন্তা বিমানচালক স্বয়ং।

কাঠের তৈরী ডানা এবং পুচ্ছ। ফিউজিলেজ তৈরী সংকর এলুমিনিয়ামে। বিস্ফোরকের ওজন মোট ২,৬৪৫ পাউণ্ড। ২৭,০০০ ফুট উঁচুতে উড্ডীয়মান এরোপ্লেন থেকে মুক্তি দেওয়া হতো। ঘণ্টায় ২৩০ মাইল স্পীডে হাওয়ায় ভেসে যেতো, 'গ্লাইড' ক'রে। এইবার রকেট ব্যবহার করে ঘণ্টায় ৫৩৫ মাইল স্পীড তোলা হ'তো। ডুব মেরে লক্ষ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় স্পীড হতো ঘণ্টায় ৬২০ মাইল। কার্যকরী পাল্লা ৬০ মাইল।

## পরিশিষ্ট ২

### নিয়ন্ত্রিত মিসাইল সম্পর্কে

### নিত্য ব্যবহৃত শব্দাবলী

**GUIDED MISSILE**=নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র॥

অ্যাক্সিলারোমিটার **(Accelerometre)**—ত্বরণ **(acceleration)** মাপার যন্ত্র। আকাশে উড়ুক্কুদের তিনটি গতি—ওপর-নিচ, সামনে, ডাইনে-বাঁয়ে। মানুষ যতোক্ষণ জলে বা স্থলে আছে তখন তার মাত্র দুটি গতি, উপরোক্তের শেষের দুটি। আকাশে তিনটি গতির তিন দিককার ত্বরণ মাপার জন্য তিনটি আলাদা অ্যাক্সিলোরোমিটার থাকে, এই যন্ত্রের সাহায্যেই দূরত্ব মাপা হয়।

এআরোডায়নামিকস **(Aerodynamics)**—তরল পদার্থ বলবিজ্ঞানের সেই শাখা যেটি বাতাস এবং অন্যান্য সংকোচনশীল তরলের গতি ও বেগ ইত্যাদি গবেষণা করে।

এআরোপ'জ **(Aeropause)**—পৃথিবীর ঊর্দ্ধে বাতাস এবং মহাশূন্যের মধ্যবর্তী ৬০ থেকে ৯০ মাইলের একটা এলাকা যেখানে হাওয়ার পরিমাণ ব্যোমযানদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নিবিড়, অথচ ভাসিয়ে রাখার পক্ষে অপর্যাপ্ত। এই মাধ্যমটি না বাতাস না মহাশূন্য।

আফটার-বার্ণার **(Afterburner)**—টার্বোজেট এঞ্জিনে টারবাইনের পিছনে দাহক সরঞ্জাম। যেটি জেটের স্রোতে অতিরিক্ত জ্বালানী অন্তর্নিক্ষেপ **(inject)** ক'রে সেই জ্বালানী দাহন ক'রে অতিরিক্ত ঘাত **(thrust)** সৃষ্টি করে।

মিসাইল—স্বনিক্ষিপ্ত নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র। আমরা এতৎপর সংক্ষেপে, আদ্যক্ষর গঠিত স্বনি-ক্ষেপ বলব।

এ-আই-সি-বি-এম (AICBM)—অ্যান্টি ইণ্টার কণ্টিনেণ্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল—ভূপৃষ্ঠ বা জলপৃষ্ঠ থেকে আকাশশ্রেণীর স্বনি-ক্ষেপ। আই-সি-বি-এমকে ঘায়েল করার মিসাইল। অন্তর্মহাদেশ মিসাইল ঘায়েলকারী মিসাইল।

এআর স্পেস (Air space)—ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬০ মাইল উর্দ্ধাকাশের এলাকা। এর ওপরে গেলে ব্যোমযানের ভেসে থাকার উপযুক্ত পর্যাপ্ত হাওয়া পাওয়া যায় না। হাওয়া আছে এখানেও। যবক্ষারযান (nitrogen) : অম্লযানের (oxygen) অনুপাত এই পর্যন্তও ৮০ : ২০। হাওয়ায় ঘনত্ব কম।

এ-এল-বি-এম (ALBM)—এআর লঞ্চড ব্যালিস্টিক মিসাইল। আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত স্বনি-ক্ষেপ। আকাশ থেকে ভূ/সমুদ্র পৃষ্ঠ শ্রেণীর।

অ্যাটিচিউড (গাইডেড মিসাইলের)—Attitude—ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে উর্দ্ধাধ অথবা অন্য কোন পূর্ব নির্দিষ্ট কোণে স্বনি-ক্ষেপের আবর্তন, বা আবর্তিত অবস্থা।

অ্যাক্সিয়াল-ফ্লো * টার্বো জেট (Axial-flow * Turbo jet)—গ্যাস চালিত টারবাইন এঞ্জিন ( জল চালিত নয় )। কেন্দ্রের মেরুদণ্ডে যুক্ত অসংখ্য ফলকের সাহায্যে যার সংনমক (compressor), কাজ করে। হাওয়ার প্রবাহ মেরুদণ্ডের সমান্তরাল হওয়ায় এঞ্জিনের মুখ বা সমুখের আকার ছোট হওয়া সম্ভব।

বীম রাইডার (Beam Rider)—লক্ষ্যবস্তুতে কোন রকম অদৃশ্য বিদ্যুৎ চুম্বক জাত রশ্মি ফেলতে থাকা হয়। সেই রশ্মি আবিষ্কার ক'রে সেই রশ্মি পথ ধরে চালিত হবার অভ্যন্তরীণ সরঞ্জাম সমন্বিত স্বনি-ক্ষেপ।

বুস্টার (Booster)—স্বনি-ক্ষেপের সঙ্গে যুক্ত অতিরিক্ত ঠেলা দেবার ব্যবস্থা। স্বনি-ক্ষেপটিকে যাত্রার সুরুতে অতিমাত্রায় ত্বরণ পাইয়ে উঁচুতে তুলে দ্যায় বুস্টার। জ্বালানী নিঃশেষ হলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। boost কথাটির অর্থ হলো, পেছন থেকে ঠেলে তোলা।

ক্যানার্ড (Canard)—মিসাইলের ডগার দিকে যে সব কব্জা আঁটা ঝাঁপ ভূমিত্যাগ ( take off ) করায়, তারও সামনে আর এক 'সেট' ঝাঁপ থাকে।

চেন রিঅ্যাকশান (Chain reaction)—কেউ কেউ বলেন শৃঙ্খল বিক্রিয়া। আমার নিরবচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া বলতে ভালো লাগে। কিম্বা ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া। দুটি কথার মধ্যেই অবিচ্ছিন্নতার সুরটি আছে।

পারমাণবিক বিভাজন fission বা একত্রীকরণ **fusion** ঘটানোর নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা। সক্রিয় পদার্থটিতে, শুধু এক দফা বিভাজন বা একত্রীকরণ স্বরু করে দিলেই হলো। প্রথম দফার মুক্তি পাওয়া শক্তি ও পরমাণু, পরের দল পরমাণুকে বিভাজন / একত্রীকরণ করে নতুন শক্তি ও পরমাণুর মুক্তি দিচ্ছে। মুক্তি পাওয়া এই পরমাণুরা আবার পরের 'সেট'কে নতুন পরমাণু ভাঙা ও তদ্বারা শক্তির মুক্তি দিতে মদত দিচ্ছে। এমনি চলেছে অনন্ত প্রবাহ।

খুব বিশ্বস্ত অনুবাদ না হলেও air-কে হাওয়া atmosphere-কে আবহাওয়া বলব। অভিধানে, Air হলো নাইট্রোজেন, অক্সিজেন মিশ্রিত গ্যাস, যা পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে। Atmosphere যে কোন গ্রহ নক্ষত্রকে বেষ্টনকারী গ্যাসের পুঞ্জ / পৃথিবীকে বেষ্টনকারী যাবতীয় গ্যাসের রাশি।

কেমোস্ফিয়ার—Chemosphere—ভূপৃষ্ঠের উর্দ্ধে ২০ থেকে ৬০ মাইলের আবহাওয়ার স্তর।

সিসলুনার—Cislunar—চাঁদের এই ( কলঙ্কিত ) পিঠ, যেটাই শুধু পৃথিবী থেকে দেখা যায়। চাঁদ বা চাঁদের কক্ষপথ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত বিষয়ক।

কমবাসচান—Combustion—প্রকৃত প্রজ্বলন ignition ॥ জ্বালানীর ও অক্সিজেন মিশ্রের দহন ক্রিয়া। এই ক্রিয়া স্থলবিশেষে স্বতঃস্ফূর্ত, স্থলবিশেষে সংঘটিত।

( অক্সিজেন দুটি জিনিসকে বাঁচিয়ে রাখে। মানুষকে, আগুনকে। )

কনট্রোল, গাইডেড মিসাইল—Control, Guided Missile—স্বনিক্ষেপকে স্বপথে রাখার কিম্বা গতি পরিবর্তনের নিয়ামক।

ক্র্যাশ প্রোজেক্ট—Crash Project—অতিমাত্রায় জরুরী কার্যক্রম। যার অর্থের ব্যয় বরাদ্দ, আনুষ্ঠানিক ব্যয় বরাদ্দ পদ্ধতির অনিবার্য বিলম্বের জন্য বসে থাকতে পারে না।

ডিফিউজার—Diffuser তরল ( বা গ্যাসের ) গতিবেগ কমিয়ে চাপ বাড়াবার জন্য ক্রমহ্রস্বমান বা ক্রমবর্ধমান আয়তক্ষেত্রের প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট তরল গ্যাসবাহী নালী। শব্দানুগ মিসাইলের ক্ষেত্রে প্রবাহ অভিমুখী এই ( নালীর ) ক্ষেত্রফল ক্রমবর্ধমান, শব্দাতিগের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রস্বমান। বায়ুভুক এঞ্জিনের প্রশ্বাস গ্রহণের পথে ব্যবহৃত।

ডপলার এফেক্ট (DOPPLER EFFECT)—আওয়াজের উৎস গতিশীল

এবং গ্রাহক বা শ্রোতাও গতিশীল। এদের আপেক্ষিক গতি **motion** পরিবর্তনে সিগনালের কম্পাঙ্কের স্পষ্ট পরিবর্তন হয়।* স্বনি-ক্ষেপে বেতার কম্পাঙ্কের উৎস রেখে এবং মাটিতে গ্রাহক স্থাপন করে, স্বনি-ক্ষেপের গতিবেগ নির্ধারণ করা হয়। অথবা মাটিতে স্থাপিত উৎসের সিগনালকে চলন্ত মিসাইল থেকে প্রতিফলিত করিয়ে আনা।

ড্র্যাগ **(Drag)**—যে তরলকে মাধ্যম করে স্বনি-ক্ষেপ অগ্রসর হচ্ছে, স্বনি-ক্ষেপের ওপর সেই তরলের সামগ্রিক বল **(force)**, যেটি স্বনি-ক্ষেপকে অগ্রগমনে বাধা দেয়।

ড্রোন **( Drone )**—চালকবিহীন দূর-নিয়ন্ত্রিত ব্যোমযান। মানুষের উপস্থিতি যে সব বিমানে অবাঞ্ছিত, যেমন বিমানধ্বংসী কামানের নিশানা। এবং অন্যান্য বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে এর ব্যবহার। চালকহীন বিমানও বলা হয়।

এলিভেটার **(Elevator)**—উত্তোলক। এর কব্জা আঁটা ডানা ঘোরাতে পারা যায়। অনুভূমিক সমতলে **(horizontal plane)** এ থেকে 'পিচ' বা ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করে।

এক্সোস্ফিয়ার **(Exosphere)** – পৃথিবীর ওপরকার আবহাওয়ার শেষতম স্তর। ৬০০ মাইলের ওপর থেকে সুরু করে, কখন এক জায়গায় স্পেস-এ বিলীন হয়ে যায় যখন তাকে আর স্পেস থেকে আলাদা করে চেনা যায় না। সেখানে গ্যাসের কণাগুলি এতো দূর-বিন্যস্ত যে তারা পরস্পরের গায়ে ধাক্কাধাক্কি না ক'রে যে যার মনে ঘুরে বেড়ায়।

এফ-বি-এম **(FBM)**—ফ্লীট ব্যালিস্টিক মিসাইল জাহাজ থেকে নিক্ষিপ্ত, জল থেকে স্থল ধরনের স্বনি-ক্ষেপ, গমন পথ ব্যালিস্টিক।

[ ব্যালিস্টা, **ballista** হলো প্রাচীন কালের সমরাস্ত্র। একটা দীর্ঘ পোক্ত কাঠের দণ্ডের ওপরে দাঁড় করানো আড়ধনুক। এই ধনুক থেকে বড়ো বড়ো প্রাস ছোড়া হতো। ব্যালিস্টিকস—উড্ডুক্ক প্রাসের **projectile**-এর গতি বিজ্ঞান। ]

---

* উল্টোদিক থেকে একটি ট্রেণ সিটি দিতে দিতে আসছে। যতোক্ষণ আপনাকে পার না হচ্ছে তখনকার আওয়াজ, আর যেই আপনাকে পার হয়ে পিছনে চলে গেল—এই দুটো আওয়াজের তারতম্য—খেয়াল করে দেখেছেন?

ফ্লেম হোল্ডার (Flame holder)—বায়ুভুক জেট এঞ্জিনে দহন ক্রিয়া স্থিতিশীল করার যন্ত্রাংশ। এঞ্জিনের অভ্যন্তরে বাতাসের উচ্চ গতিবেগে এঞ্জিনের শিখাটিকে নিভে যাবার হাত থেকে বাঁচায়।

গাইডেন্স (Guidance)—স্বনি-ক্ষেপের সঠিক গমন পথ স্থির করার এবং সেই পথে চালু রাখার উপায়।

গাইডেড মিসাইল (Guided Missile)—চালকবিহীন বিস্ফোরকবাহী ব্যোমযান, যার গমন পথ, মিসাইলের অভ্যন্তরীণ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তন করা যায়। মিসাইলের ভিতরকার ঐ কলকব্জাগুলি, ব্যোমযানের বাইরে থেকেও বেতারতরঙ্গের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ ক'রে গমন পথ নিয়ন্তাদের ইচ্ছাধীন করা সম্ভব।

আই-সি-বি-এম (ICBM)—Inter Continental Ballistic Missile—স্থল/জল থেকে স্থল/জল শ্রেণীর আন্তর্মহাদেশ স্বনি-ক্ষেপ। চরম পাল্লা ৮০০০ কিলোমিটার বা ৫০০০ মাইলেরও অধিক।

আয়নোস্ফিয়ার Ionosphere—পৃথিবীর উর্দ্ধে ৬০ মাইলের উপর থেকে ২৫০ মাইল বায়ুস্তর। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য—এখানে দূরে দূরে ছিটানো আছে অম্লজান oxygen ও যবক্ষার যানের nitrogen অণু, তৎসহ আয়ন এবং স্বাধীন ইলেকট্রনও।

আই-আর-বি-এম (IRBM) Intermediate Range Ballistic Missile—স্থল / জল থেকে স্থল / জল শ্রেণীর মাঝারি পাল্লার স্বনি ক্ষেপ। চরম পাল্লা ২৫০০ কিলোমিটার বা ১৫০০ মাইল।

কিলোটন (Kiloton)—পারমাণবিক বোমার শক্তির একক। কিলো অর্থাৎ ১০০০ টন রাসায়নিক বিস্ফোরকের শক্তির সমতুল।

লুনার অপারেশান (Lunar Operation)—চন্দ্রের পৃষ্ঠে বা কাছাকাছি ক্রিয়া কাণ্ড।

ম্যাক নাম্বার (Mach Number)—কোনো মাধ্যমে কোনো গতিশীল বস্তুর গতিবেগের সঙ্গে সেই মাধ্যমে শব্দের গতিবেগের অনুপাত। শব্দের গতিবেগ কিন্তু আকাশ পাতাল তফাত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠে ঘণ্টায় ৭৬০ মাইল ( ১১২০ ফুট প্রতি সেকেণ্ডে ) হ'লে ৫০০০০ ফুট উপরে যেখানে উত্তাপ অনেক কম, সেখানে শব্দের গতি ঘণ্টায় মাত্র ৬৬০ মাইল। সমুদ্র পৃষ্ঠে ম্যাক নাম্বার ২ মানে হবে,

মিসাইলের গতি ঘণ্টায় ১৫২০ মাইল। ৫০০০০ ফুট উঁচুতে ম্যাক নাম্বার ২ হলে মিসাইলের গতি ঘণ্টায় ১৩২০ মাইল।

মাস রেশিও (Mass Ratio)—ওড়ার সময় যে ওজন নিয়ে যাত্রা করেছিল, তার সঙ্গে, সমস্ত জ্বালানী পুড়ে যাবার পর তার যা ওজন রইল, সেই অনুপাত।

মেসোস্ফিয়ার (Mesosphere)—পৃথিবীর উর্দ্ধে ২৫০ মাইল ওপর থেকে ৬০০ মাইল পর্যন্ত আবহাওয়ার স্তর। এই এলাকায় মেসন (meson) ও অন্যান্য মহাজাগতিক (cosmic) রেণু পাওয়া যায়।

এম-আর-বি-এম (MRBM) Medium Range Ballistic Missile—স্থল/জল পৃষ্ঠ থেকে স্থল/জল শ্রেণীর মাঝারি স্বনি-ক্ষেপ। পাল্লা ১৫০০ কিলোমিটার, ৯৫০ মাইল।

নিয়ার স্পেস (Near space)—ভূপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তথা চারহাজার মাইল উঁচু পর্যন্ত এলাকা।

নজ্‌ল্ (Nozzle)—জেট এঞ্জিনের নির্গমন স্রোতের গতিবেগ বাড়াবার জন্য বিভিন্ন প্রস্থচ্ছেদের (cross section) নল। এই প্রস্থচ্ছেদ কমতে কমতে কণ্ঠ (throat) নামক পয়েন্টে অবমে (minimum) পৌঁছে, বহির্গমন দ্বারের মুখে হঠাৎ প্রশস্ত হয়ে যায়।

নিউক্লিয়ার ফিশান (Nuclear fission)—এক রকমের পারমাণবিক রূপান্তর, যাতে সমধিক সংখ্যক নিউক্লিয়ন সমন্বিত ভারী জাতের একটি পরমাণুকে, দুই বা ততোধিক পরমাণুতে বিভাজিত করা হয়। ফলস্বরূপ যে পরমাণু দুটি/গুলি পাওয়া যায় তাদের নিউক্লিয়নগুলির সংযোজন combination আরো বলবান হওয়ার ফলে, খোয়া যাওয়া ভর বা mass মুক্তিপ্রাপ্ত শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

নিউক্লিয়ার ফিউশান (Nuclear fusion)—বিভাজনের আগে অপেক্ষাকৃত ন্যূনসংখ্যক নিউক্লিয়ন সমন্বিত দুই বা ততোধিক হাল্কা পরমাণুকে সংযুক্ত করে একটি ভারী জাতের পরমাণুতে রূপান্তরিত করা হয়। ফলস্বরূপ যে পরমাণুটি পাওয়া যায়, পূর্বের চেয়ে তার নিউক্লিয়নগুলির সংযোজন আরো জোরদার হওয়ায় ফলে খোয়া যাওয়া ভর বা mass মুক্তিপ্রাপ্ত শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

আউটার স্পেস (Outer space)—পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান অর্থাৎ চার হাজার মাইল ওপর থেকে এলাকা।

পাইলটলেস এআরক্রাফট (Pilotless aircraft)—চালক বিহীন ব্যোমযান। ড্রোনও বলে। ড্রোন এর অন্য অর্থ পুরুষ মৌমাছি। খায় দায় ঘুমোয়, মধু সংগ্রহ করে না। অলস অকর্মন্য ব্যক্তি।

পালস জেট (Pulse jet)—সাদাসিধে বায়ুভুক হাওয়ার প্রশ্বাস নিয়ে কাজ করা জেট এঞ্জিন। যেটি সবিরাম হাওয়া টেনে এবং হাওয়া ও জালানীর দহন দিয়ে ঘাত thrust সৃষ্টি ক'রে এগোয়।

র‍্যাম জেট (Ram jet)—সাদাসিধে বায়ুভুক হাওয়ার প্রশ্বাস নিয়ে কাজ করা জেট এঞ্জিন। যেটি মিসাইলের দ্রুত গতির সময়, হাওয়ার দুরমুশ করার ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে বাতাসকে সংনমন করে নেয়। এই জাতীয় জেট এঞ্জিনে কোন যান্ত্রিক সংনমক দরকার হয় না। ( টার্বোজেট তুলনীয় )

রিজেনারেটিভ কুলিং (Regenerative Cooling)—পুনর্জনক বা পুনরুৎপাদক শীতলকরণ। দহন প্রকোষ্ঠে জ্বালানীকে পাঠাবার আগে, মোটরের গায়ের ঠাণ্ডা করার জামার মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে, তরল জালানীর রকেট মোটরকে ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা।

স্যাটেলাইট (Satellite)—কৃত্রিম উপগ্রহ। অন্য কোন আকাশচারী গ্রহ নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমার উদ্দেশে, উপযুক্ত সংস্থান ও গতিবেগ সম্বলিত ব্যোমযান।

শক ওয়েভ (Shock wave)—একেবারে ভিন্ন ঘনতা, ভিন্ন চাপ, ভিন্ন তাপ, ভিন্ন গতিবেগওলা দুটি এলাকার মধ্যে চলন্ত সীমানা। বাতাসের মতো সংকোচনশীল তরলের মাধ্যমে জন্ম। কোন মাধ্যম যে গতিবেগে শব্দ চালান করতে পারে তার চেয়ে দ্রুততর গতিতে চলনশীল কোন পদার্থ, সেই মাধ্যমে যে সংকোচনশীল ঢেউয়ের সৃষ্টি করে। গিলে-করা হাওয়া।

এস-এল-আই-এম (SLIM)—স্লিম। সাবমেরিন লঞ্চড ব্যালিস্টিক মিসাইল। সাবমেরিন থেকে ছোড়া আন্তর্মহাদেশ স্বনি-ক্ষেপ। জল থেকে স্থল শ্রেণীর। কোন মহাদেশের নিকটস্থ দরিয়া থেকে সেই মহাদেশের যে কোন জায়গায় পাঠাবার মতো ৩০০০ কিলোমিটার বা ১৮০০ মাইল পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র।

সোনিক ভেলসিটি (Sonic Velocity)—শব্দ সমান গতিবেগ। সমুদ্র পৃষ্ঠে উষ্ণ হাওয়ায় এই গতিবেগ আনুমানিক ঘণ্টায় ৭৬০ মাইল ( সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট ) ; ৪০০০০ ফুট উর্দ্ধে শীতল হাওয়ায় ঘণ্টায় আনুমানিক ৬৬৪ মাইল।

স্পেস (Space)—পৃথিবীর আবহমণ্ডলের ওধারে, কিম্বা সৌরজগতেরও বাইরে। স্পেস-এর নিম্নতম সীমানা, পৃথিবীর প্রায় ৯০ মাইল ওপরে, যেখানে আবহাওয়ার টান ( আকর্ষণ ? ) পৃথিবীর নকল উপগ্রহকে নিজ কক্ষে চলার বাধা জন্মায়।

স্পেস ডিফেন্স (Space defense)—নকল উপগ্রহের এবং অন্য ব্যোমযানের হাত থেকে ভূপৃষ্ঠের জিনিসপত্র এবং ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষা।

স্পেস অফেন্স (Space offense)—ওপরের স্পেস থেকে পার্থিব লক্ষ্য বস্তুর ওপর হামলা। ভূপৃষ্ঠে সমুদ্রবক্ষে বা অন্তরীক্ষে অবস্থিত শত্রুকে ( এক্ষেত্রে মানুষ এবং পৃথিবীর স্থান বা কলকারখানা ) বাইরের নকল উপগ্রহ, অন্য ব্যোমযান বা চান্দ্রদেশ থেকে আক্রমণ চালানো।

স্পেস সার্ভেল্যান্স (Space surveillance)—সমস্ত নকল উপগ্রহ এবং অন্যান্য ব্যোমযানের গোয়েন্দাগিরি, পিছু ধাওয়া, সনাক্তকরণ এবং তালিকাভুক্তি। নকল উপগ্রহ থেকে পাঠানো তথ্যের হিসাব রাখা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, পর্যবেক্ষক বিমান থেকে পাঠানো ইলেকট্রনিক সংবাদ বা ফোটোগ্রাফ অথবা খবর জোগানদার উপগ্রহের পাঠানো সংবাদও এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

স্পেস ভীইকল (Space Vehicle)—পৃথিবীর আবহাওয়ারও ওপরে মনুষ্য নির্মিত ব্যোমযান যা অন্তরীক্ষে ঘুরে বেড়ায়। এই ব্যোমযান পরিচালিত হতে পারে নাও পারে। সওয়ারী সমেত হতে পারে, সওয়ারী হীনও হতে পারে। কক্ষপথে ঘুরতে পারে, কক্ষপথে না থাকলেও চলে। স্পেস পাড়ি দিয়ে ভূপৃষ্ঠেই কোনো নিশানায় যে সব স্বনি-ক্ষেপ সামিল হয় কিম্বা স্বনি-ক্ষেপ হন্তা পাল্টা স্বনি-ক্ষেপ—স্পেস ভীইকল এর আওতায় আসে না।

স্পেসিফিক ইম্পালস (Specific Impulse)—প্রতি সেকেণ্ড প্রতি পাউণ্ড জ্বালানী ও অক্সিজেন মিশ্রক ব্যয়ে কতো পাউণ্ড ঘাত জন্মাল। রকেট এঞ্জিনের ক্ষমতার মাপকাটি।

এস-আর-বি-এম (SRBM)—শর্ট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল নিকট পাল্লার ভূ/জল পৃষ্ঠ থেকে ভূ/জল পৃষ্ঠ শ্রেণীর স্বনি-ক্ষেপ। পাল্লা ১০০ কিলোমিটার বা ৬২ মাইল।

এস-টি-ঈ-এম ॥ স্টেম (STEM) স্পেস টু আর্থ মিসাইল—অন্তরীক্ষ থেকে ভূপৃষ্ঠের নিশানায় নিক্ষিপ্ত স্বনি-ক্ষেপ।

স্ট্রাটোস্ফিয়ার (**Stratosphere**)—পৃথিবীর ঊর্দ্ধে ৬ মাইল থেকে সুরু করে ২০ মাইল অবধি স্তর। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য এখানে বাতাস অকম্প্র। এই বাতাসের মতিগতি বোঝা যায়। উত্তাপ এখানে ৬৭° ফারেনহীট। একদম বাইরের প্রান্তে উত্তাপ ১৭০° ফা।

টেলিমিটারিং (**Telemetering**)—বেতার মারফত অন্তরীক্ষের উত্তাপ, চাপ, ইত্যাদি সংগ্রহের যন্ত্র। যন্ত্রগুলি স্বনি-ক্ষেপ বা উপগ্রহে স্থাপিত থাকে। তাদের কাছে যে সব ঘড়ি থাকে তাদের কাঁটা থাকে মাটিতে।

থ্রাস্ট (**Thrust**)—ঘাত। জেট এঞ্জিনের প্রতিক্রিয়ার বেগ, পাউণ্ডে বলা হয়। খাড়া উল্লম্ব গতি স্বনি-ক্ষেপের পক্ষে, স্বনি-ক্ষেপের পুরো ওজনের চেয়ে এই ঘাতের পরিমাণ অবশ্যই বেশী হওয়া চাই।

ট্রান্সলুনার (**Translunar**)—চাঁদের ও পিঠের।

ট্রোপোস্ফিয়ার (**Troposphere**)—আবহাওয়ার নিম্নতম স্তর। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৬ মাইল পর্যন্ত। এই স্তরে যতো উঁচুতে ওঠা যাবে, ততো দ্রুত চাপ ও তাপ কমতে থাকে।

টার্বোজেট (**Turbojet**)—প্রকৃতির হাওয়া টেনে যান্ত্রিক সংনমকের সাহায্যে সংনমন ক'রে চলা জেট এনজিন। ( র‍্যাম জেট তুলনীয় )

## পরিশিষ্ট ৩

### এক নজরে

### সংজ্ঞা

**গাইডেড মিসাইল**—চালকহীন ব্যোমযান। এর ভিতরকার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, গমনপথের 'পিচ' 'ইয়' 'রোল' এর যে কোন বেচাল অপনি শুধরে নেয়।

**ব্যালিস্টিক মিসাইল**—স্বয়ংগামী, স্বয়ংচালিত, স্বনিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র। যার আরোহণের এবং ধনুকাকৃতি গমন পথের ক্রিয়াটুকু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। নামার পথ—স্বাধীন, অনিয়ন্ত্রিত, অভিকর্ষের আইন মানা।

মিসাইলের বাইরের চেহারা যতো সাদামাটাই হোক না, ভিতরে অজস্র জটিল যন্ত্র, মাপক, নিয়ন্ত্রক, নানা আকার প্রকারের টিউব, ভালব ( কবাটিকা ) থাকে।

'ওয়াসারফল'-এর প্রস্থচ্ছেদ চিত্রটি দেখুন :

**Proximity Fuse**—লক্ষ্যবস্তুর কাছে গিয়ে পৌঁছলে ফিউজটি জ্বলে যায় এবং বিস্ফোরণ ঘটায়। **Fuel Tank** আছে **Oxidant Tank** আছে—তার মানে তরল জ্বালানির জেট।

**Control Equipment**—দূরে বসে ৩০ মাইল পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা যেতো। **Remote control** তো বটেই। **Radio Receiver**-টা যখন আছে, দূর নিয়ন্ত্রণ তখন, বেতার তরঙ্গ দিয়ে।

**Gyroscope, Servo motor** তো থাকতেই হয়। **Servo-motor** মনে আছে তো ? কম শক্তি দিয়ে বেশি শক্তিকে চালানো !

মিসাইল স্বয়ংগামী কারণ, তার নিজস্ব চালক শক্তি—**Pulse jet/Ram jet/Turbo jet**—এনজিন আছে।

স্বনিয়ন্ত্রিত—কারণ, মিসাইলের নিম্নবর্ণিত যন্ত্রাংশ আছে :

**য়্যাক্সিলারোমিটার Accelerometre** ত্বরণ মাপার যন্ত্র

আকাশযানের বা মিসাইলের তিনটি গতি—ওপর নিচ, সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে। এই তিনটি গতির, তিনদিককার ত্বরণ মাপার জন্য তিনটি আলাদা য়্যাক্সিলারোমিটার থাকে। এই যন্ত্র তিনটির সাহায্যে দূরত্ব মাপা হয়। দূরত্ব নিয়ন্ত্রণও করা হয়।

## গাইডেড মিসাইল কনট্রোল

মিসাইলকে ঠিক পথে চালনা বা গতি পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে।

**জাইরোস্কোপ**—লম্বভাবে অবস্থিত দুই অক্ষের (axes এর) আল (pivot) এ স্থাপিত জাইরোস্কোপ। দ্রুত আবর্তনশীল এবং ভারী এর চাকা। নিজে সর্বদাই অনুভূমিক থেকে, মিসাইলের তিনটি গতির কোনটিতে বেচাল দেখা দিলে শুধরে দেয়।

**রোটর**—আকাশযানকে উড়ন্ত রাখছে যে-শক্তি তার প্রায় সবটাই আসছে রোটর-এর অনুভূমিক ব্লেডগুলির ঘূর্ণন থেকে।

অলটিচ্যুড বা উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করে **অলটিমিটার** ভুল করলে আপনি শুধরে দেয়। ১৭নং রেখাচিত্র, সম্বলিত ব্যাখ্যা।

পিছন বা সামনে থেকে অপ্রত্যাশিত আকস্মিক দমকা হাওয়া বা ঝড় এলেও মিসাইলের গতিবেগ বাড়ে না কমে না। বাধা দেয় এবং গতিবেগের সমতা বজায় রাখে এই যন্ত্রাংশটি। ৭ নম্বর রেখাচিত্র।

# পরিশিষ্ট ৪

## রেখাচিত্রের শিরোনাম

রেখাচিত্র পৃষ্ঠা সংখ্যা

(2) স্টিলের খোলস (3) শ্রাপনেল গুলিকা (4) কেন্দ্রীয় নল (5) "গান কটন" (6) ঝুরো বারুদ।

(গান কটন Gun Cotton = cellulose nitrate, গাঢ় নাইট্রিক ও সালফিউরিক এসিডে ভিজানো তুলার ছাঁট। উগ্র বিস্ফোরক)।

২২ খণ্ডাত্মক বিস্ফোরকবাহীটি বিস্ফোরণের ফলে নিজেও শতধা বিদীর্ণ হয়ে যায়। ৬৬

---

# পরিশিষ্ট ৫

## আলোকচিত্রের শিরোনামা

১৯৬২-র আগেকার **কিছু মিসাইল** মূলনীতি এখনও বদলায় নি

চিত্র নং

১। একটি মিসাইল, পাশে মানুষের ছবি। আকারে কতো বড়ো—

২। বহুদূর পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল 'এ-৪'
( বাঁ দিকে ) উড়ন্ত ( ডাইনে ) প্রস্থচ্ছেদ

৩। গ্লস্টার মিটিঅর বিমানের পেটের তলায়
বিমান থেকে বিমানে শ্রেণীর রকেট

৪। বিমানধ্বংসী মিসাইল 'ওয়াসারফল'

৫। বিমান থেকে বিমানে শ্রেণীর—**HS 298** মিসাইল

৬। বিমান থেকে বিমানে শ্রেণীর—**X4** মিসাইল

৭। বিমানধ্বংসী মিসাইল 'ওয়াসারফল' এর প্রস্থচ্ছেদ

৮। বিমান থেকে বিমানে ( এআর-টু-এ আর ) শ্রেণীর :—
**HS 293 AC** মিসাইল

৯। বিমান ধ্বংসী মিসাইল 'রাইনটকটার-১'

১০। ভারতের ফক্সট্রট শ্রেণীর সাবমেরিন 'খাণ্ডেরি'

১১। ভারতের নৌবাহিনীর মিসাইল বোট থেকে ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূপৃষ্ঠ মিসাইল ছাড়া হচ্ছে।

১২। পাকিস্তানের আয়ত্তে সর্বাধুনিক **SUBMARINE 5 × 404**

১৩। স্পীড উদ্দীপক "এ-৪" বুস্ট মোটর ( প্রস্থচ্ছেদে দেখা যাচ্ছে ) সমন্বিত মিসাইল।

১৪। তিন রকম জেট এঞ্জিনের ক্রিয়ার মূলনীতির স্থূল আভাস
আধুনিক সমর সজ্জার কিছু

১৫। বিমান থেকে বিমানে শ্রেণীর—'বিয়ান ফায়ার বার্ড' মিসাইল

১৬। বিমান ধ্বংসী মিসাইল 'লিটল জো'

১৭। ( উপরে ) বিমানধ্বংসী মিসাইল 'ফেয়ারি স্টুজ'
( নিচে ) বিমানধ্বংসী মিসাইল 'তাইফুন'

১৮। পাকিস্তানের আয়ত্তে সর্বাধুনিক **TANK**

চিত্র নং

১৯। পাকিস্তানের আয়ত্তে ক্রোটেল মিসাইল

ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের উৎস মুখে নিশানা সন্ধানী র‍্যাডার যন্ত্র যুক্ত থাকায় শত্রুপক্ষের অনুচ্চ লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান পাবার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় ক্ষেপণাস্ত্র **CROTALE** আপনি নিক্ষিপ্ত হয়।

২০। আত্মঘাতী ডুব-বোমারু ( ডাইভ বম্বার )

জাপানীদের "বাকা"

২১। ভারতের আয়ত্তে একাসনী জঙ্গী-বোমারু/প্রতিরোধী বিমান

**MIRAGE-III RD**

৩৯,৩৭৫ ফুট উচ্চতায় সর্বোচ্চ স্পীড ঘণ্টায় ১৪৬০ মাইল, ম্যাক-২·২। লক্ষ্যের মুখোমুখি হবার স্পীড ঘণ্টায় ২১১ মাইল। অবতরণের স্পীড ১৮০ মাইল ঘণ্টায় ৩৬ হাজার ফুট উঠতে ( ম্যাক ০·৯ ) ৩ মিনিট। ৪৯ হাজার ২শ ফুট উঠতে ( ম্যাক ১·৮ ) ৬ মিনিট ৫০ সেকেণ্ড। ভূপৃষ্টে আক্রমণের কর্মক্ষেত্র ৭৪৫ মাইল।

২২। ভারতের আয়ত্তে উন্নততর **MIG 25**

প্রতিরোধকারী তো বটেই, সেই সঙ্গে উচ্চমানের পর্যবেক্ষক বা রিকনিসান্স (reconnaisance) বিমান। স্পীড ঘণ্টায় প্রায় ১৮৬৪ মাইল। যন্ত্রাদির মধ্যে আছে **Doppler navigation system** এবং পার্শ্ব নজর সক্ষম হাওয়া বাহিত র‍্যাডার **side looking airborne radar**। সর্বোচ্চ স্পীডে ম্যাক সংখ্যা ৩·২। চারটি **ACRID** মিসাইল ও ৫০% জ্বালানী সমেত-ম্যাক সংখ্যা ২·৮৩। নিচু অলটিট্যুডে ঐ সব সরঞ্জাম সহ ম্যাক সংখ্যা-০·৮৫। অবতরণের স্পীড ঘন্টায় ১৬৮ মাইল। ওপরে ওঠার স্পীড মিনিটে ৪০ হাজার ৯৫০ ফুট। ৩৬ হাজার ফুট উঠতে লাগে ২ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড। সাধারণভাবে কম-ক্ষেত্রব্যাসার্ধ ৭০০ মাইল। লড়াইর ক্ষেত্র ব্যাসার্ধ ৯০০ মাইল।

২৩। ভারতের আয়ত্তে বিশ্ববিশ্রুত সর্বদক্ষ **MIG 23**

এই লড়িয়ে বোমারুর সর্বোচ্চ স্পীডে ম্যাক ২·৩৫ অবধি পাওয়া যায় লড়াইর ব্যাসার্ধ ৫৬০ - ৮০৫ মাইল।

চিত্র নং

২৪। ভারতের আয়ত্তে **MIRAGE 2000**

একাসনী প্রতিরোধী জঙ্গী বিমান। সর্বোচ্চ স্পীডে ম্যাক সংখ্যা ২·৩ অবিরাম স্পীডে ম্যাক সংখ্যা ২·২। নিচু অলটিট্যুডে, ৮টি ২৫০ কিলো বোমা এবং ২টি ম্যাজিক মিসাইলের বোঝা সমেত, সর্বোচ্চ স্পীড ঘণ্টায় ৬৯০ মাইল। লক্ষ্যের মুখোমুখি হবার স্পীড ঘণ্টায় ১৬২ মাইল। আরোহনের স্পীড মিনিটে ৪৯ হাজার ২শ ফুট। চারটি ২৫০ কিলো বোমা সমেত লড়াই ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধ ৯২০ মাইল।

২৫। ভারতের আয়ত্তে বিশ্ববিশ্রুত **JAGUAR**

হানায় মদৎদার ও দ্বিতীয় ভূমিকায় আক্রমণের বিমান। সমভূম স্পীড ম্যাক সংখ্যা ১·১ ঘণ্টায় ৮৪০ মাইল। ৩৬ হাজার ফুট উচ্চতায় সর্বোচ্চ সমভূম স্পীড, ম্যাক ১·৬ ঘণ্টায় ১ হাজার ৫৬ মাইল। অবতরণ স্পীড ঘণ্টায় ১৩২ মাইল। নিজস্ব জ্বালানী ট্যাঙ্ক নিয়ে সর্বোচ্চ স্পীড ( উচ্চতা ভেদে ) ৫৩০/৩৩৪ মাইল ঘণ্টায়। অতিরিক্ত জ্বালানী ট্যাঙ্ক নিয়ে ( উচ্চতা ভেদে ) ঘণ্টায় ৮৭৫/৫৭০ মাইল। দূরগমনের সীমানা ২ হাজার ১৯০ মাইল।

২৬। ভারতের আয়ত্তে একাসনী হাল্কা ওজনের লড়িয়ে জঙ্গী **F 16A**

৪০ হাজার ফুট উচ্চতায় সর্বাধিক স্পীড ম্যাক ২ এর বেশি। উঠতে পারে ৫০ হাজার ফুট। কর্মক্ষেত্রের ব্যাস ৫৭৫ মাইল

২৭। ভূপৃষ্ঠে আক্রমণ চালাতে ভারতের আয়ত্তে **MIRAGE 5**

সবই মিরাজ থ্রি আর-ডির মতন। অধিকন্তু ২০০০ পাউণ্ড বোমার বোঝা নিয়ে লড়াইর ব্যাসার্ধ ৮০৮/৪০৪ মাইল।

২৮। ভারতের আয়ত্তে **MIG 27**

একাসনী ভূপৃষ্ঠ আক্রমণের বিমান। সর্বোচ্চ স্পীডে ম্যাক সংখ্যা ১·৭/১·১। আরোহনের সীমা ৫২ হাজার ৫শ ফুট। পেটের তলায় জ্বালানী ট্যাঙ্ক, ৪টি ৫০০ কিলো বোমা ২টি অ্যাটল মিসাইলের বোঝা সমেত লড়াইর ক্ষেত্র ব্যাসার্ধ ২৪০ মাইল।

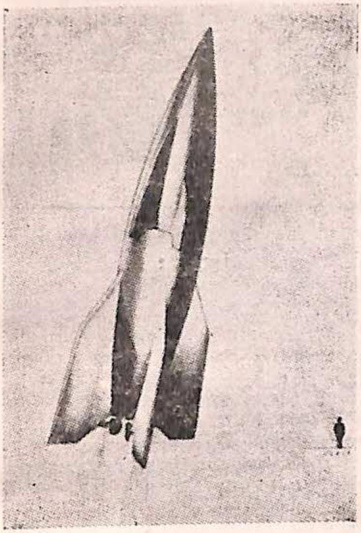
চিত্র নং

২৯। পাকিস্তানের আয়ত্তে জঙ্গী বিমান F 16

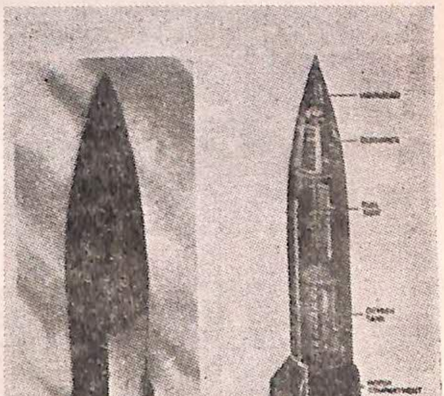
এতে আছে ৬টি ক্ষেপণাস্ত্র। ৬টি ভিন্ন গতিবেগে একই সঙ্গে একই লক্ষ্য বস্তুতে মিসাইল বর্ষণ করে।

# পরিশিষ্ট ৬

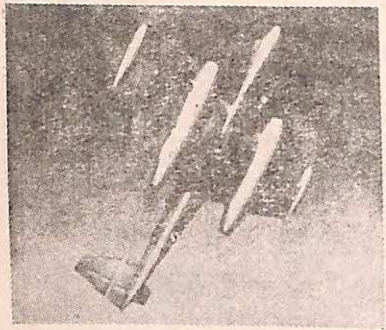
## আলোকচিত্র



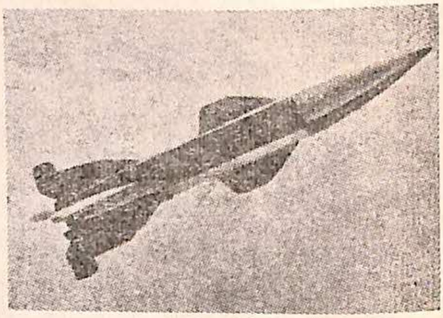
চিত্র নং ১



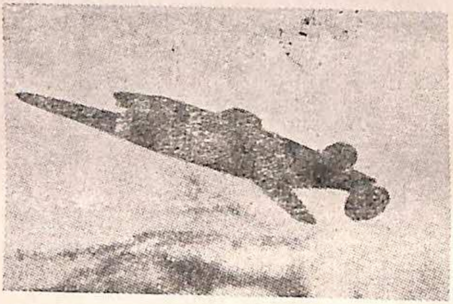
চিত্র নং ২



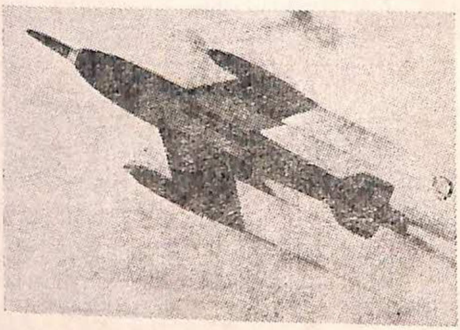
চিত্র নং ৩



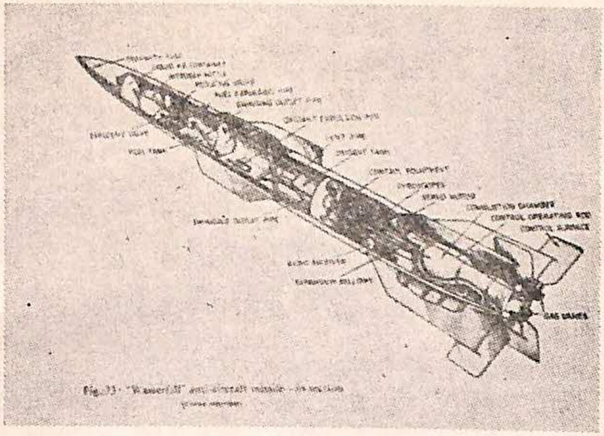
চিত্র নং ৪



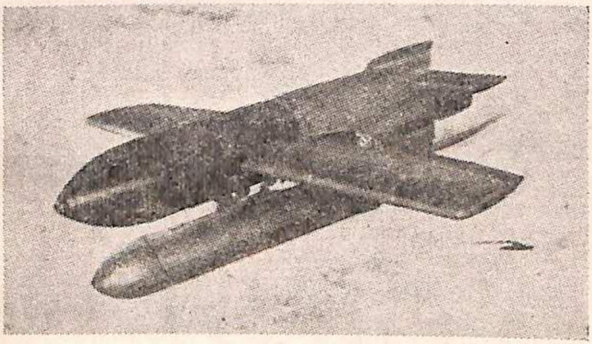
চিত্র নং ৫



চিত্র নং ৬



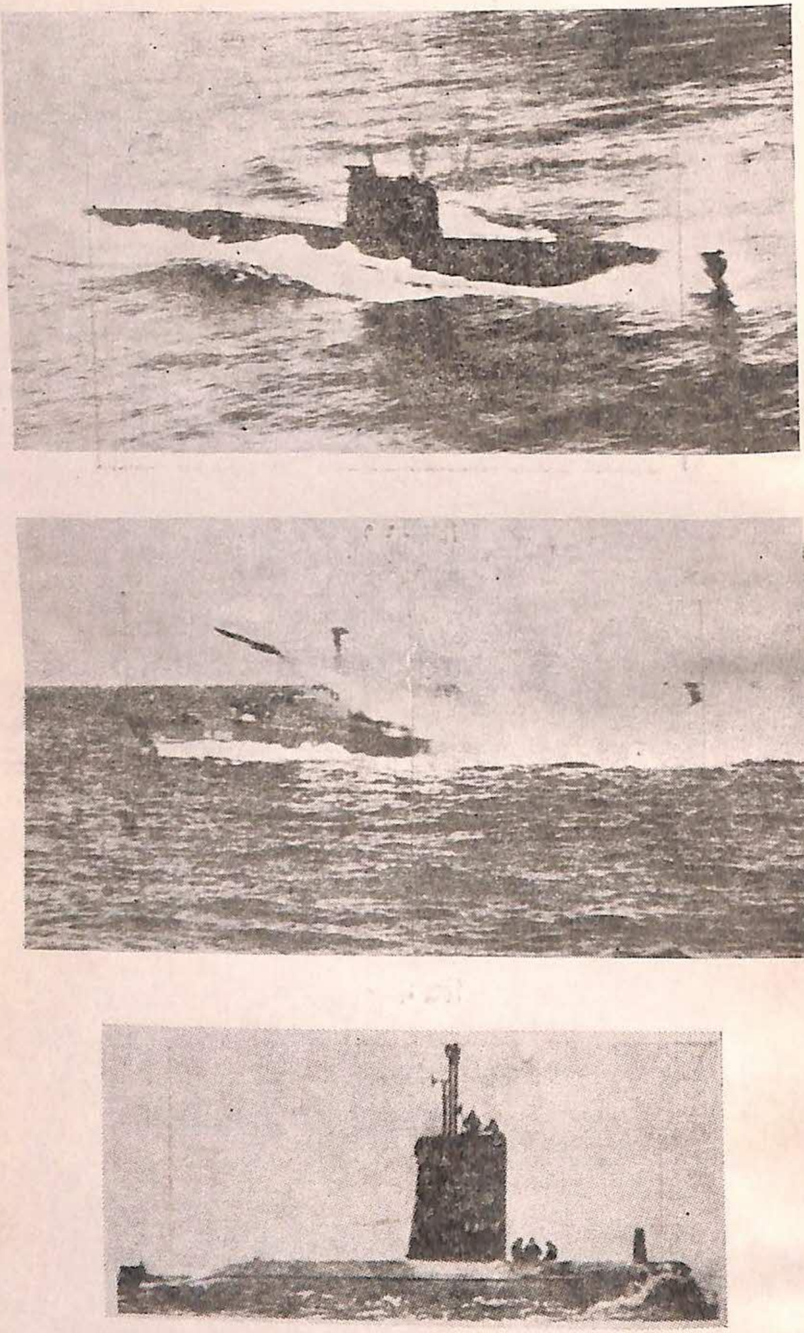

চিত্র নং ৭



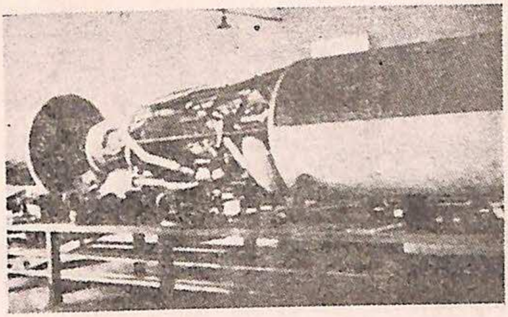
চিত্র নং ৮



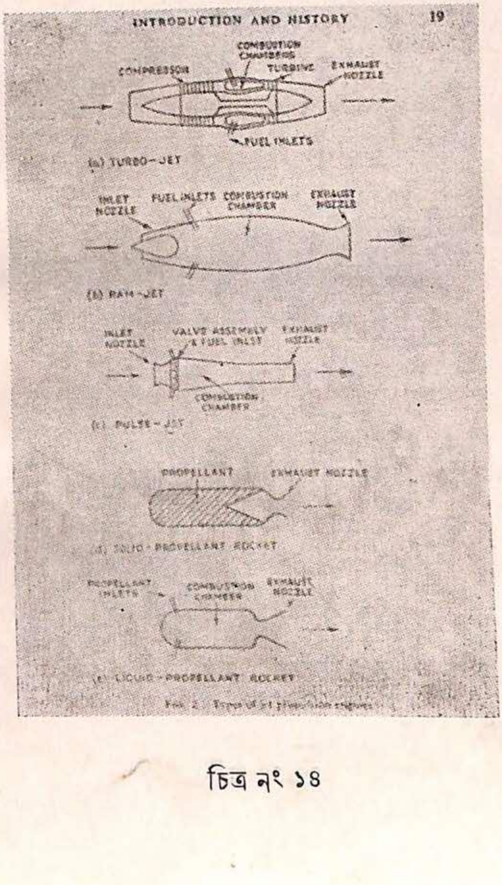
চিত্র নং ৯



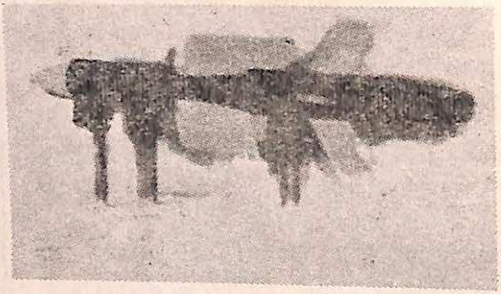
চিত্র নং ১০, ১১, ১২



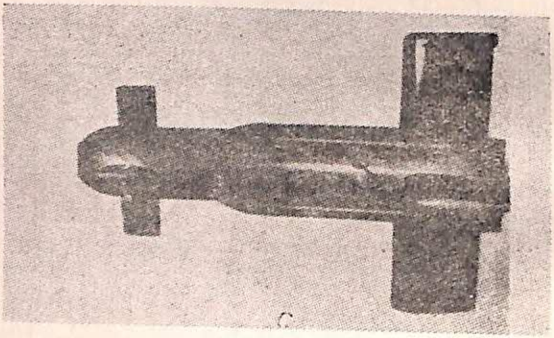
চিত্র নং ১৩



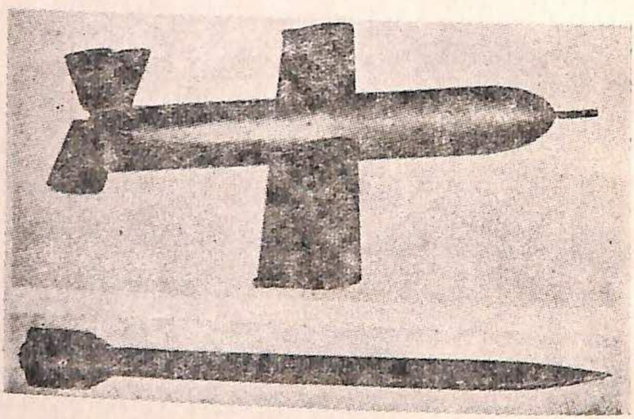

চিত্র নং ১৪



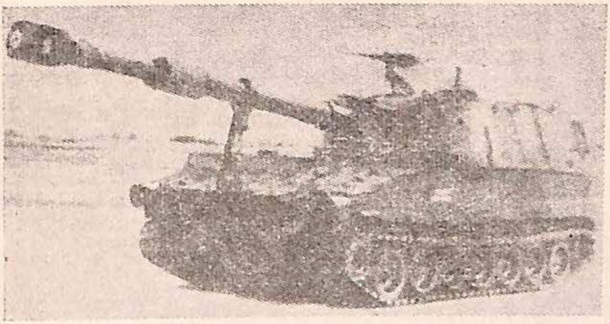
চিত্র নং ১৫

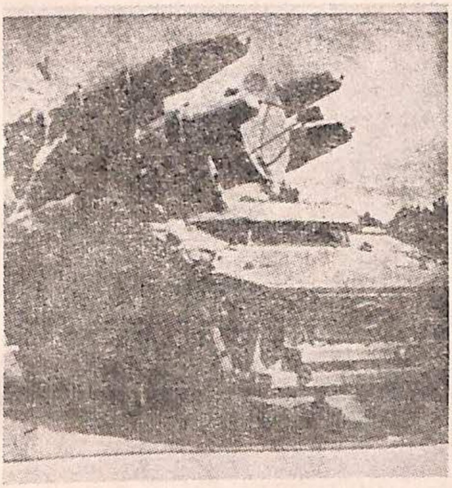


চিত্র নং ১৬



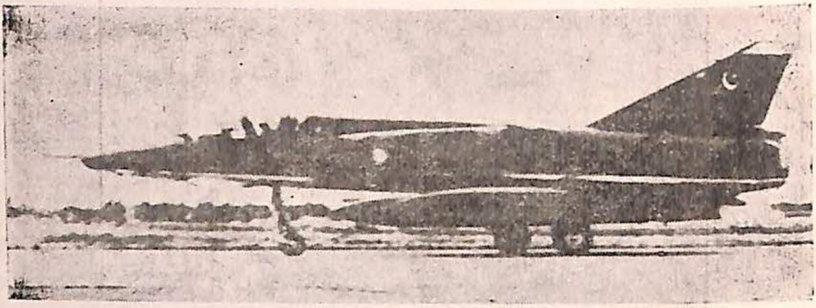
চিত্র নং ১৭



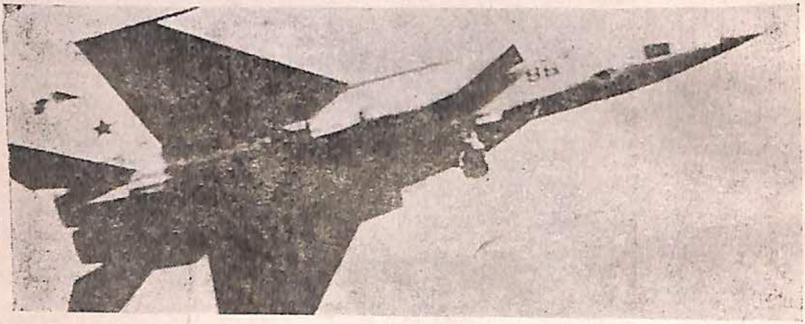




চিত্র নং ১৮, ১৯, ২০



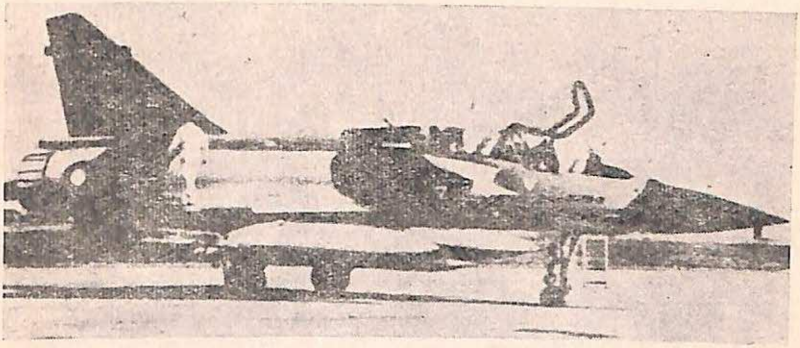
চিত্র নং ২১



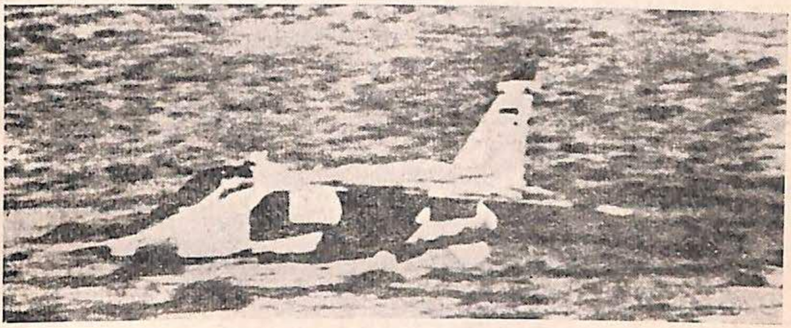
চিত্র নং ২২



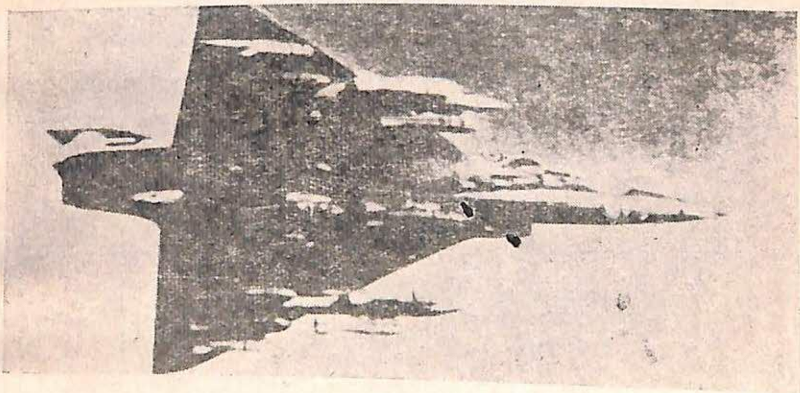
চিত্র নং ২৩



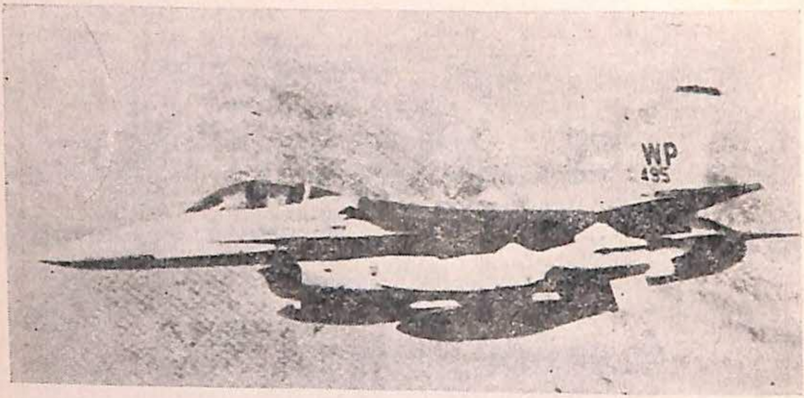
চিত্র নং ২৪

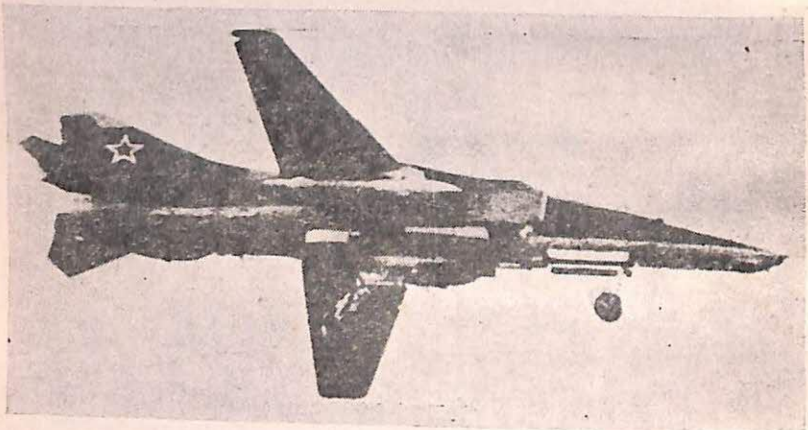


চিত্র নং ২৫



চিত্র নং ২৬


WP
495




MULTIROLE FIGHTER
AIRCRAFT can carry 6 air missiles which can be fired
at varying speeds to ensure extremely

চিত্র নং ২৭, ২৮, ২৯

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত
ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তিকা

১। রোগ ও তার প্রতিশেধ/সুখময় ভট্টাচার্য/৫·০০
২। পেশাগত ব্যাধি/শ্রীকুমার রায়/৭·০০
৩। আমাদের দৃষ্টিতে গণিত/প্রদীপকুমার মজুমদার/৭·০০
৪। শক্তি : বিভিন্ন উৎস/অমিতাভ রায়/৭·০০
৫। মানুষের মন/অরুণকুমার রায়চৌধুরী/৪·০০
৬। বয়ঃসন্ধি/বাসুদেব দত্তচৌধুরী/৯·০০
৭। ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি/সঙ্কর্ষণ রায়/৮·০০
৮। হাঁপানি রোগ/মনীশচন্দ্র প্রধান/৪·০০
৯। পশুপাখীর আচার ব্যবহার/জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়/৮·০০
১০। ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার/ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ/৬ ০০
১১। গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি/দুর্গা বসু/১০·০০
১২। একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ/কানাইলাল মুখোপাধ্যায়/১০·০০
১৩। পরিবর্তী প্রবাহ/ডঃ সমীরকুমার ঘোষ/৭·০০
১৪। বাস্তব সংখ্যা ও সংহতিতত্ত্ব/প্রদীপকুমার মজুমদার/১০·০০
১৫। অতিশৈত্যের কথা/দিলীপকুমার চক্রবর্তী/৭·০০
১৬। সয়াবীন/দ্বিজেন গুহবক্সী/৯·০০
১৭। পাতালের ঐশ্বর্য/সঙ্কর্ষণ রায়/১০·০০
১৮। ঘরে করো শিল্প গড়ো/তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়/ ১১·০০
১৯। এফিড বা জাবপোকা/মনোজরঞ্জন ঘোষ
২০। জৈবসার ও কৃষিবিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান/শ্যামল বণিক।

বারো টাকা